অচেনা লিঙ্কন

ডেল কার্ণেগী

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ● ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :

কে. নাথ/এস. নাথ

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :

আগষ্ট ১৯৫৮

প্রচ্ছদ :

কুমার অজিত

মুদ্রক :

স্বর্ণলতা ঘোষ

ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

● মানুষ লিঙ্কন ●

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আব্রাহাম লিঙ্কন এক স্মরণযোগ্য নাম। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে লিঙ্কন যে অবদান রেখে গেছেন মানুষের ইতিহাসে তার তুলনা সত্যিই নেই। মানুষ হিসেবেও তাই লিঙ্কন হয়ে ওঠেন অনন্য। সাদা মানুষদের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা আর নিগ্রো দাসদের উপর লাগামহীন অত্যাচার একদিন লিঙ্কনকে ব্যথিত করেছিল বলেই তিনি দাসপ্রথাকে নির্মম হাতে আমেরিকার বুক থেকে চিরদিনের জন্যই নির্মূল করতে পেরেছিলেন। এ জন্য তাকে মূল্যও কম দিতে হয়নি, গৃহযুদ্ধ লেগেছিল যুক্তরাষ্ট্রে আর শেষ পর্যন্ত মানবপ্রেমের জন্যই তাকেও প্রাণ দিতে হয় আততায়ীর হাতে।

মানুষ হিসেবে লিঙ্কনের জীবনী তাই প্রতিটি সৎ মানুষেরই পাঠ করা কর্তব্য হওয়া উচিত। সামান্য অবস্থা থেকে, চরম দারিদ্র্য আর কঠোর পরিশ্রমের দিন পেরিয়ে লিঙ্কন একদিন বসেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ প্রেসিডেন্টের আসনে। কেনটাকির অরণ্য ছায়া থেকে তাঁর বাসস্থান হয়েছিল একদিন হোয়াইট হাউস। লিঙ্কন তাই আজও প্রতিটি আমেরিকাবাসীর কাছে শ্রদ্ধার আসনে আসীন।

মানুষ লিঙ্কনের জীবনী একজন সৃষ্টিধর্মী, সৎ মানুষেরই জীবনী। যে জীবনে চোখে পড়ে মেঘ আর রোদ্দুরের খেলা। ডেল কার্নেগী আব্রাহাম লিঙ্কনের এই জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন মহান মানুষটির জীবন আর চরিত্রের অসংখ্য অজানা অচেনা দিক। লিঙ্কনের এই জীবনীগ্রন্থ তাই অনন্য সাধারণ। ডেল কার্নেগী তার অন্যান্য রচনার মতই এই জীবনী রচনা করতে গিয়ে বিরাট মানুষটির চরিত্রের নানা দিক খুঁজে বেড়িয়ে ছিলেন। অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন এক বিশাল

ব্যক্তিত্ব আর পুরুষকে। এই জীবনী গ্রন্থ তাই সাধারণ কোন জীবনী নয়, এ এক গবেষকের প্রাণপাত পরিশ্রমের অমূল্য ফলশ্রুতি। ডেল কার্নেগী নিজেও তাই অনন্য হয়ে উঠেছেন এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করে। লিঙ্কনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এমন বিরাট মানুষের অজানা দিক নিয়ে জীবনী রচনায় অন্য পাঁচটা জীবনীর চেয়ে যা সম্পূর্ণ আলাদা।

ডেল কার্নেগীর এই গ্রন্থটি পাঠকদের ভাল লাগবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বলেই তার ভাষান্তরিত রূপ তুলে ধরতে সাহসী হয়েছি। পাঠকদের ভাল লাগলেই আমার আনন্দ।

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

।। কেন এই বই রচনা করলাম ।।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। প্রকৃতি তখন বসন্তের আগমনে নতুন সাজে সজ্জিত, আকাশে বাতাসে অপরূপ এক উজ্জ্বলতা জেগে উঠেছে। লণ্ডন শহরে বিশেষ কাজে উপস্থিত ছিলাম আমি। কোন এক হোটেলে প্রাতরাশ সারার ফাঁকে সেদিনের দৈনিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতেও শুরু করেছিলাম। বিশেষ কোন আগ্রহ নিয়ে কাগজখানা পডছিলাম বলব না, নিছক কৌতুহলবশতই পাতা ওল্টাচ্ছিলাম।

পাতা ওল্টাতে গিয়ে আচমকা আমার নজর আটকে গেল একটা রচনার উপর। রচনাটা আমাকে দারুণ আকর্ষণ করল বলাই বাহুল্য। এর বিষয়বস্তু ছিল এই : "স্মরণীয় মানুষের স্মৃতি"। ধারাবাহিক ভাবেই লেখাটা প্রকাশিত হয়ে চলেছিল। আমার মন আর শরীর আনন্দ এবং বিচিত্র এক অনুভূতির জোয়ারে যেন ভেসে চলতে চাইল। এর কারণও ছিল, আর সেটা হল ওই লেখাটা উৎসর্গীকৃত ছিল আমাব একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র আমেরিকার মহান সেই প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

লেখাটি কিন্তু লিঙ্কনের বিরাট রাজনৈতিক সত্তা আর জীবনকে ঘিরে নয়, এটা ছিল মানুষ লিঙ্কনের স্মৃতি বিজডিত রচনা। তাঁর জীবনেও ব্যথা বেদনা, জয় আর পরাজয় এবং আরও মানবিক সাধারণ অনুভূতি ছিল, কিন্তু যা ছিল না তা হল মলিনতার স্পর্শ। এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ। সাধারণ একজন মানুষের জীবনে যে ভালবাসার রঙীন ছবি ফোটে, লিঙ্কনের জীবনেও তা একদিন ফুটেছিল তাই তিনি ভালবেসেছিলেন অ্যান রুটলেজকে গভীর প্রেম দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন। লিঙ্কন শেষপর্যন্ত বিয়ে করেছিলেন মেরী টডকে। এই বিয়ে কিন্তু লিঙ্কনকে সুখী করতে পারেনি বরং তার জীবনকে করে তুলেছিল যন্ত্রণাকাতর। বিষের পাত্রই যেন নিজের হাতে একদিন তুলে নিয়েছিলেন লিঙ্কন মেরী টডকে জীবন-সঙ্গিনী করে।

লিঙ্কনকে আমি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম। সাধারণ মানুষ যেমনটি ভাবে আমিও তেমনই ভাবতাম যেন আব্রাহাম লিঙ্কনের

জীবনের সমস্ত কিছুই আমি জেনেছি আর নতুন কথা জানার মত বোধ হয় কিছুই নেই। আসল কথা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকমই—কেননা আসল বিষয় হল আমি কিছুই জানতাম না ওই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে। এবারই আমার সঠিক জ্ঞানোদয় হল। লিঙ্কন, মহান লিঙ্কনের সঙ্গে আমার যে কতখানি তফাৎ তা আমি নিমেষে বুঝতেও পারলাম। তবে মিলও যে ছিল না তা নয়—সেটা হল আমাদের তুজনেরই জন্ম আমেরিকার মাটিতে। লিঙ্কন ছিলেন প্রেসিডেণ্ট আর আমি একজন অতি সাধারণ নাগরিক মাত্র। তুজনের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক।

এই সব কথা যখন চকিতে আমার মনের মধ্যে খেলে গেল তখনই ঠিক করে ফেললাম আব্রাহাম লিঙ্কন সম্পর্কে আমায় আরও জানতে হবে, লিঙ্কনের জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি জানা চাই আমার। এই কথা ভেবেই বৃটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারের স্মরণাপন্ন হলাম, উদ্দেশ্য একটাই ছিল—লিঙ্কন সম্পর্কে সমস্ত জেনে নেওয়া। আমি চাইছিলাম নতুন মানুষ হয়ে উঠতে, নিজেকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে। আর সেটা সেই মহান ব্যক্তিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে। লিঙ্কন সম্পর্কে যখন প্রচুর রচনা পড়ে ফেললাম তখন এক নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হলাম, মোহিত হয়ে উঠলাম। বিস্ময় আমার সত্যিই বাঁধ মানতে চায়নি। কি বিরাট, বিশাল মানুষটি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উঠলাম, কাঁচপোকা যেমন আলোর টানে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিও ঠিক তেমনি ভাবে আকর্ষণ অনুভব করতে লেগেছিলাম। আমার কর্তব্যও ঠিক হতে দেরি লাগল না। ঠিক করে ফেললাম আমার প্রিয়তম মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কনের এক নতুন জীবনী রচনা করব। আর এরই মধ্য দিয়ে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। এই রচনায় কল্পনার অযাচিত মিশেল না ঘটিয়ে প্রামাণিক এক জীবন কাহিনীই মানুষের সামনে মেলে ধরব।

মনে মনে স্থির করলাম বটে লিঙ্কনের জীবনী রচনা করব, তবুও বলতে বাধা নেই আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতনতা ছিল আমার। এর কারণ হল আমার জানা ছিল আমি কোন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত কখনও নই বা বিরাট কোন পুরুষও নই। জ্ঞান বিতরণ করার ক্ষমতাও আমার হয়নি, সে ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া এসব কাজ করতে যাওয়ার মত বিরাট প্রতিভা নিয়েও আমি জন্মাই নি। কত বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি থাকেন, তাঁরা বিভিন্ন ভাবে তাদের

ক্ষমতাও জাহির করেন, আমার তেমন শক্তি নেই। ইতিহাসবেত্তাও আমি হতে পারিনি বা বলতে গেলে কোন রকম পণ্ডিতও হই নি। আমার ইচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌছন. তাই তাদের মত করেই মহান মানুষটির জীবনীগ্রন্থ রচনা করাই আমার ব্রত। এর কারণ হল আমি সাধারণ সব মানুষ যাতে মহান লিঙ্কনকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারে তারই ব্যবস্থা করা। সঠিকভাবে লিঙ্কনকে সকলে যাতে চিনতে পারে সেই কাজটি করাই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল।

বাজারে লিঙ্কনের জীবনীর কিন্তু মোটেও অভাব ছিল না। প্রচুর বই আগেও রচনা করা হয়েছিল আর তার অনেকগুলোই রচনা করেছিলেন বিদগ্ধ সব পণ্ডিতরা। সে সব বইয়ের বেশির ভাগই তত্ত্ব কথাতেও ভরা। এমন সমস্ত বই প্রকাশকরাও প্রকাশে দ্বিধা করেন না। তাই এমন সব বই সব সময়েই প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বাস রাখা চলে ভবিষ্যতেও তা করবে।

তাহলে আমি যা লিখব সেটা কেমন হবে? হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন বটে।

অহঙ্কার করতে চাই না, আসলে চিরাচরিত কোন জীবনী লেখার বদলে আমি রচনা করব সম্পূর্ণ আলাদা রুচির এক জীবনী। এর স্বাদই হবে তাই আলাদা।

মনে যে বাসনা জেগেছিল তাকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার চেষ্টাও শুরু হল এরপর। মহান মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী রচনার কাজ মুখে বলা যতটা সহজ কাজে করা তার চেয়ে ঢের শক্ত। এজন্য চাই প্রচুর পরিশ্রম। চাই রসদ সংগ্রহ যাতে রচনা হয় সম্পূর্ণ নির্ভুল। এই কারণেই নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি শুরু করে দিলাম। প্রায় সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়ালাম ওই উদ্দেশ্য নিয়ে। ইউরোপ ঘোরার পরেও থামা গেলনা, গেলাম স্বদেশ আমেরিকায়। নিউ ইয়র্ক শহরে লিঙ্কনের আরও কিছু জীবনী পাঠ করলাম। তারপর শুভ মুহূর্তে একখানা জীবনী রচনা শুরু করলাম, বেশ কিছুটা অগ্রসরও হলাম সে কাজে।

এইভাবে লেখাটা বেশ খানিকটা এগোনোর পর নিজেই নিজের রচনার সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। দেখতে পেলাম একেবারে অপাঠ্য হয়েছে পাণ্ডুলিপি, যা চেয়েছিলাম তার কণামাত্রও হয়নি। মন ঠিক করে সমস্ত পাণ্ডুলিপি বাতিল করে দিলাম, এই অপাঠ্য রচনা চলতে পারে না। আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে।

এরপর কি করলাম বলতে বাধা নেই। সেই মহান মানুষটি যেখানে জীবনের কঠিনতম দিনগুলো কাটিয়ে ছিলেন সেই ইলিনয়ে হাজির হলাম। এই সেই ইলিনয়, যেখানে আব্রাহাম লিঙ্কন একদিন শ্রমিক হিসেবে শুরু করেছিলেন তার জীবনযাত্রা। সেই কঠিন শ্রমে ভরা দিনের অবসর মুহূর্তে লিঙ্কন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আঁকতে চাইতেন। দেখতেন কল্পনার আলোয় তিনি একদিন সম্মানের চূড়োয় উঠে বিশাল এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন।

আমি যেন ইলিনয়ে এসে মহান সেই ব্যক্তিত্বের স্পর্শ টের পেলাম। ইলিনয়ের যারা বয়স্ক, প্রাচীন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তাদের কাছে শুনতে লাগলাম অতীতের সেই দিনের কাহিনী। অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম সেখানে। ইলিনয়ের মানুষ আমাকে অযাচিত সাহায্য করে আমার ঝুলি ভরিয়ে তুলল। কত অজানা, অজ্ঞাত অবহেলিত তথ্য পেলাম তার হিসেব নেই। নানা পত্র পত্রিকা আর সংবাদে ডুবে থেকেও আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করলাম। একাজ করতে গিয়ে কোন জায়গায় যেতে বাধা রাখিনি। কোথায় না গেছি —ক্লাব, ডাকঘর, আদালত, পাঠাগার সর্বত্র। উদ্দেশ্য শুধু একটাই ছিল, লিঙ্কন সম্পর্কে যতখানি জানা যায় সবই জানতে হবে। প্রাচীন নথি, কাগজপত্র সবই দেখলাম। এত পরিশ্রম আমার সার্থকতায় মণ্ডিত হল। পরিষ্কার একটা ছবি এবার যেন মূর্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে। সেই মহান ব্যক্তিত্বকে নতুন করেই চিনতে পারলাম। এখানে না এলে এ সুযোগ পেতাম না।

আমার পরিশ্রম করতে আপত্তি ছিল না কেননা আমার জানা ছিল পরিশ্রমের ফল আমি এক সময় পাবই। ইলিনয়ে ঘোরার সময় এক সময় কাটাতে হল পিটসবার্গে। সেখানে গ্রামে গ্রামেও ঘুরলাম, যেমন নিউ সালেম নামের গ্রামটায়। এর একটা ইতিহাস আছে। এই সালেম গ্রামেই একসময় লিঙ্কন তার জীবনের প্রচুর আনন্দময় সেরা দিনগুলো অতিবাহিত করেছিলেন। লিঙ্কনের নিউ সালেমে কাটানো সেই দিনগুলোর আলাদা তাৎপর্য ছিল। নানা কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন লিঙ্কন সেখানে। কোন কাজেই তাঁর দ্বিধা ছিল না। কত বিচিত্র কাজই না লিঙ্কন সেখানে করেছিলেন ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। তিনি কারখানার শ্রমিক হন, মুদীর দোকান চালান। আবার সুযোগ সামনে আসতে তাকে আঁকড়ে

ধরেছেন, পড়েছেন আইন। আবার দরকারে কামারশালায় কাজ করতেও আপত্তি করেন নি। আরও আশ্চর্য সব কাহিনী এখানেই শুনেছিলাম লিঙ্কন সম্পর্কে। কাজের ফাঁকে তিনি মোরগের লড়াই আর ঘোড়-দৌড়ের বাজীতে বিচারের কাজও করেছেন। কি বৈচিত্র্যময় জীবন।

ঠিক এখানেই আবার লিঙ্কনকে দেখা গিয়েছিল ভালবাসার রঙে রঙীন হয়ে উঠতে। তিনি তখন প্রেমিক। প্রেম করে লিঙ্কন নিঃস্ব হয়েছেন এইখানে। হ্যাঁ, এ জায়গাটি সেই নিউ সালেম গ্রাম। এ গ্রাম লিঙ্কনকে অবাধ আকর্ষণ করেছিল, তার উপস্থিতি যেন প্রাণময় করে তোলে জায়গাটিকে। দীর্ঘকাল ধরে প্রাণচঞ্চল হয়ে থেকে ছিল নিউ সালেম। কিন্তু লিঙ্কন বিদায় নেবার পর সেভাব বেশিকাল থাকেনি, নিউ সালেম হয়ে যায় পরিত্যক্ত।

নিউ সালেমের এক আলাদা রূপই যেন একদিন ফুটে ওঠে, আর তা লিঙ্কন এবং তার প্রেমিকা অ্যান রুটলেজের প্রেম গুঞ্জনের জন্য। এখানেই একদিন ভালবাসার জাল বুনেছিলেন দু'জনে। এ স্বর্গীয় ভালবাসার যেন কোন তুলনা মেলে না। সত্যিকার প্রেম বুঝি এমনই হয়ে থাকে। সারা জীবনে লিঙ্কন আঘাত, বেদনা কম পাননি, তাই বলতে পারা যায় সত্যিকার আনন্দ আর শান্তি তিনি জীবনে যদি পেয়ে থাকেন সেটা পেয়েছিলেন ওই নিউ 'সালেমে থাকা দিনগুলোয়।

কিন্তু লিঙ্কনের এ প্রেম সফলতা পায়নি। তার ভালবাসা শেষ পর্যন্ত রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। এর এক ব্যথাতুর পরিণতি ঘটে যায় লিঙ্কনের প্রেমিকা অ্যান রুটলেজের জীবন অকালে ঝরে যাওয়ায়। চরম আঘাত পেয়েছিলেন এতে লিঙ্কন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি এমন আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলেই আঘাতটা বড় বেশি বেজেছিল তার। চোখের জলে বিদায় দিয়েছিলেন প্রেমাস্পদকে একদিন লিঙ্কন। দয়িতার সমাধিক্ষেত্র তার কাছে তীর্থক্ষেত্রই হয়ে উঠেছিল সেদিন।

এরপর আমার গন্তব্যস্থান হল লিঙ্কনের অন্য কর্মক্ষেত্র সেই বিখ্যাত স্প্রিংফিল্ড। সেখানেই আমি হাজির হয়ে নতুন ভাবে লিঙ্কনকে জানার চেষ্টা করলাম। এখানে লিঙ্কন অন্য এক রূপেই প্রতিভাত হন। আমার জানার একটা বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছিল—লিঙ্কন কিভাবে তার প্রেমিকার স্মৃতি অবলম্বন করে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। কারণ এখানেই লিঙ্কন রচনা করেন তার সেই বিখ্যাত

বক্তৃতাগুলি। এখানেই আবার তাঁকে কাঠ গড়াতেও দাঁড়াতে হয় মেরী টডের বিষজর্জর কলহের জন্য।

উপক্রমণিকা হিসেবে এটি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। এবার তাই মহান সেই মানুষের জীবনীকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করাই আমার আসল কাজ। সেই কাজটি কেমন হল তার বিচারক আপনারাই। শুধু একটি কথা না বলে পারছি না, আর তা হল এক মহান জীবন কিভাবে গড়ে উঠতে পারে লিঙ্কনের এই জীবন কাহিনীই আপনাদের কাছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করবে।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ভার্জিনিয়ার অতীত কাহিনী

পুরনো দিনের কথা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেণ্টাকী এলাকার একটি জায়গার নাম ছিল ফোর্ট হ্যারড। সেই ফোর্ট হ্যারডে বাস করতেন অ্যান ম্যাকগিনটি নামের জনৈকা স্ত্রীলোক। অ্যান তার স্বামীর সঙ্গেই সেখানে বাস করতেন। তাদের বেশ কিছুটা পরিচিতিও গড়ে উঠেছিল। এর কারণ বিশেষ করে তারা নতুন কিছু এই এলাকায় এনেছিলেন বলে। এই এলাকায় যারা বাস করত তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল রেড ইণ্ডিয়ান বংশোদ্ভুত মানুষ। অনেক কিছুই তাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা অজ্ঞাত। যেমন শুয়োর প্রাণীটি। এই শুয়োর প্রাণিটিকে প্রথম তাদের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন অ্যান আর তার স্বামীই। এছাড়া হাঁস আমদানীর কাজটিও তারাই করেন। এমন কি চরকা দিয়ে সুতো কাটার পদ্ধতিও তারা আদিম অধিবাসীদের শেখান। যন্ত্রটি তাদেরই আমদানী কৃত ছিল। এরই সঙ্গে তারা আবার নানা ধরণের খাদ্যবস্তু যেমন হলদে মাখন বানানোর কৌশলটাও শেখান অধিবাসীদের। এটা তাদের একেবারেই জানা ছিল না। অজ্ঞানতা আর অশিক্ষাই এর প্রধান কারণ। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকত এই জায়গার মানুষ। তাদের কাছে সুতির পোশাক একেবারেই নতুন জিনিস ছিল কারণ তারা পোশাক হিসেবে ব্যবহার করত শুধু ভেড়া জাতীয় প্রাণীর চামড়ার পোশাক। ভেড়ার লোমের সঙ্গে চরকায়

কাটা সুতো মিশিয়ে অ্যান দম্পতি চমৎকার নতুন ধরণের কাপড় বানিয়ে সকলকে তাজ্জব করে দিয়েছিলেন। কাপড়ের নাম চারদিকে প্রকাশ হল "ম্যাকগিনটি কাপড়" নামে।

ব্যাপারটা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বহু এলাকার মানুষ দূর দূরান্ত থেকে অ্যানের কাছে আসতেও শুরু করে নতুন ধরণের ওই চমৎকার কাপড় বোনার কাজ রপ্ত করতে। অ্যান ম্যাকগিনটির অবস্থা ফিরেও গেল এতে। তবে এতে একটি নতুন জিনিসেরও জন্ম হল। সেটি হল অ্যান ম্যাকগিনটির বাসগৃহ নানা রসাল আলোচনার জায়গা হয়ে উঠেছিল। এই আলোচনায় প্রধান স্থান ছিল অপরের কেচ্ছাকাহিনী। সেই কেচ্ছাকাহিনীর মধ্যে প্রধানতঃ থাকত অবিবাহিতা মেয়েদের অবৈধ জীবনকাহিনী। সে কালেও এই ধরণের জীবনযাপন ঘোরতর অন্যায় বা পাপ কাজ বলেই ভাবা হত। অ্যান কৌশলে ওই ধরণের ব্যক্তিগত কাহিনী সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নেহাত বিকৃত আনন্দ উপভোগ করা মাত্র। এই ধরণের অপরাধের কাহিনী সংগ্রহ করে অ্যান সেই কাহিনী আদালতের গোচরে আনতেন। বিকৃত মানসিকতার তাগিদে অ্যান অন্যায় কাজেও পিছপা হতেন না। একে একে এইভাবেই তিনি প্রচুর অভিযোগ জানান আদালতে। এই সব অভিযোগের ফলে বেশ কটি মামলাও হয়, আর সেগুলো হয় কয়েকজন মেয়ের বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা ব্যভিচারে মত্ত হয়েছিল। এই সব মামলার কাল ১৭৮৯ সালের শেষাশেষি।

এই রকম একটি অভিযোগ আনা হয় লুসি হ্যাঙ্কস নামে একটি তরুণীর বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগ করেছিলেন সেই অ্যান ম্যাকগিনটি। লুসি মেয়েটি সম্ভবতঃ ভাল পরিবারের মেয়ে ছিল না। এই ধরণের ব্যভিচারে লিপ্ত হতে তাকে আগেও নাকি দেখা যায়। এর সবই ঘটে ভার্জিনিয়া এলাকায়। লুসি ছিল কোন এক হ্যাঙ্কস পদবীধারী পরিবারের মেয়ে। হ্যাঙ্কস পরিবার বেশ দরিদ্র পরিবারই ছিল। তাছাড়া শিক্ষা দীক্ষাতেও তারা অনেকটাই পিছিয়ে পড়া মানুষ তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। নেহাতই সাদামাটা এক পরিবার। সামান্য একখানা বাড়িতেই ছিল তাদের আস্তানা। ওই এলাকায় পয়সাওয়ালা কিছু পরিবারও ছিল, তাদের নানা ব্যবসা ও খামার ছিল। এরাই ছিলেন সেখানকার গণ্যমান্য সব পরিবার। তাদের অর্থের প্রাচুর্য থাকায় স্থানীয় গির্জা আর ধর্মীয় উপাসনালয়-

গুলিকে তারা নিয়মিত সাহায্য করতেন। ওই সব উপাসনাগৃহে গ্রামের সকলেই নিয়মিত হাজির হতো, এমন কি ওই হ্যাঙ্কস পরিবারও ব্যতিক্রম ছিল না।

১৭৮১ সালের নভেম্বব মাসের কোন এক রবিবারে বিচিত্র এক ঘটনা ঘটলো। হ্যাঙ্কস পরিবারের সেই কিশোরী লুসি হ্যাঙ্কস যথারীতি গির্জায় হাজির ছিল। সে অন্যান্য সকলেব মতই প্রভুর প্রার্থনায় রত ছিল। ঠিক ওই দিনেই গির্জায় এলেন জর্জ ওয়াশিংটন প্রার্থনায় অংশ নিতে। তার সঙ্গে এসেছিলেন একজন নামী অতিথিও। তিনি একজন বিখ্যাত সেনাপতি। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে এই সেনা-পতি অসাধারণ বীরত্ব আর রণকৌশল দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। এই সেনাপতি একজন ফরাসী—নাম লা ফয়টি। তিনি ওয়াশিংটনকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ লর্ড কর্ণওয়ালিশের সেনাবাহিনী লা ফয়টির বাহিনীর আক্রমণে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে যায়। ফরাসী সেনাপতি তাই মানুষের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন।

লা ফয়টিকে তাই দেখার জন্য দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তার সম্মানে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয়েছিল। চরিত্র কিন্তু ভাল ছিল না ফরাসী সেনাধ্যক্ষ লা ফয়টির। নাবীলিপ্সা তার চবিত্রের এক বিশেষ দিক ছিল। গির্জায় উপস্থিত সুন্দবীদের নিরীক্ষণ করছিলেন ফরাসী সেনাধ্যক্ষ। লুসীর অপরূপ সৌন্দর্য তাব নজর এড়ায় নি। অন্যান্য কিছু তরুণীর সঙ্গে লুসিকেও চুম্বন করলেন লা ফয়টি।

ফরাসী সেনাধ্যক্ষর ওই চুম্বন কিন্তু ইতিহাস পরিবর্তনের দারুণ এক দিকচিহ্ন উঠেছিল। কারণ ওই চুম্বনের দৃশ্য অনেকেরই চোখে পড়েছিল, বিশেষ করে একজন যুবকেরও। আমেরিকার সংবিধান আর আগামীর ইতিহাস রচনার ব্যাপারে ওই চুম্বন যেন এক নতুন দিগন্তেরই দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

কিন্তু সেটা কেমন করে ঘটল? ব্যাপারটি এই রকম। গির্জায় অন্য সকলের মত উপস্থিত ছিলেন সেদিন একজন পয়সাওয়ালা খামারের মালিক। খুবই ধনী মানুষটি। হ্যাঙ্কস পরিবারকেও চিনতেন তিনি। তবে দরিদ্র কোন পরিবার হিসেবে তা বলাই বাহুল্য। বয়সে যুবক খামার মালিক ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত আর নিজেকে বেশ রুচিবান সংস্কৃতি

সম্পন্ন মানুষ বোঝাতে চাইতেন। অবিবাহিত ছিলেন যুবকটি।

আশ্চর্য যে ঘটনা তিনি দেখলেন তা হল ফরাসী সেনাধ্যক্ষ ওই দরিদ্র, অশিক্ষিত লুসি হ্যাঙ্কসকে চুম্বন করেছেন। ব্যাপারটা তার মনে ঝড় তুলল। যুবক খামার মালিকের মনে হল লুসি হ্যাঙ্কস অবশ্যই কোন সাধারণ মেয়ে তবে নয়। এরকম চিন্তার কারণ ওই ফরাসী সেনাধ্যক্ষ লা ফয়টি। লা ফয়টি যে নারী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যুবকটি তা ভালই জানতেন। যুবকটি তাই ভাবলেন একটা কিছু করতে হবে।

ভাবনাটা যুবকটিকে প্রায় আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। লুসিকে ঘিরে নানা কল্পনার জাল বুনতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। ইতিহাসের অনেক দরিদ্রা রমণীর কথাই তার মনের পরদায় ছায়া ফেললো। তাদের অনেকেই পৃথিবী বিখ্যাত। এরা হলেন লেডি হ্যামিলটন আর মাদাম দুবেরীর মত মহিলা। মাদাম দুবেরী ছিলেন প্রায় অশিক্ষিতা অথচ তিনি একদিন পঞ্চদশ লুইয়ের আড়ালে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। যুবকের মন কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রঙীন হয়ে উঠতে চাইছিল।

আসলে লুসির মত দরিদ্র আর শিক্ষাহীন একটি মেয়েকে লাভ করার উদগ্র বাসনাই তাকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়েকদিন ভাবনায় তলিয়ে থেকে যুবকটি এক মঙ্গলবার ছুটে হাজির হলেন দরিদ্রা সেই লুসি হ্যাঙ্কসের পর্ণকুটিরেরই সামনে। হ্যাঙ্কস পরিবারের সামনে খামার মালিক লুসিকে নিজের বাড়িতে কাজে লাগানোর প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাব বিফল হল না, হ্যাঙ্কস পরিবার সহজেই রাজি হলেন। লুসিও তাই যুবকের খামারের কাজে লেগে গেল। কাজটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার খামারের বদলে বাড়িতেই হয়। লুসি বাড়িঘর দেখাশোনার কাজই লাভ করল আর তাকে ওই বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। লুসি তাই ওই বাড়িতেই থেকে গেল।

এই ভাবেই শুরু হল লুসির এক নতুন জীবন। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকলেও লুসির বুদ্ধির অভাব ছিল না। খামারের মালিকের এক চমৎকার পাঠাগারের বই পরিষ্কার করার মুহূর্তে একখানা বই ওর নজর কেড়ে নিল। চমৎকার ছবি ছিল বইখানায়। বইখানা অদ্ভুত আকর্ষণ করল লুসিকে, সে লেখাপড়া করার অদম্য

আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হল। ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে ওই যুবকেরও নজরে এসে যায়।

সে যুগ ছিল আশ্চর্য রকমের একটা যুগ। বাড়ির পরিচারক পরিচারিকাদের শিক্ষালাভের অধিকার সেদিনের সমাজ দেয়নি তাই শিক্ষালাভ করার চেষ্টায় জুটতো কঠিন শাস্তি আর সেটা নিন্দারও কাজ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে, লুসির ওই চেষ্টায় তাকে শাস্তি দেওয়া হল না, বরং খুশিই হলেন খামার মালিক। লুসির আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি তাকে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করলেন নিজেই। লুসিও এই ঘটনায় যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। লুসি সত্যিই যে লেখাপড়া করাব সুযোগ পেতে পারে ও ভাবতেই পারেনি। সেই আশ্চর্য ব্যাপারটাই এবার সম্ভব হতে চলল।

এ ধরণের কোন ঘটনা অবশ্য সেই সময়ে ভার্জিনিয়ায় প্রায় কল্পনাও করতে পারত না কেউ। অর্থাৎ পরিচারিকার লেখাপড়া শেখার মত কাজ। ভার্জিনিয়ায় কোন বিদ্যালয়ও তখন ছিল না। ভার্জিনিয়া রাজ্য জুড়ে এমন কোন অধিবাসী ছিল না যাদের কোন সাক্ষরতা জ্ঞান ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই তাই ছিল অশিক্ষিত। সে সময় কাজ কর্ম চালানোর ব্যবস্থা হত টিপসইয়ের মাধ্যমে। লুসির শিক্ষালাভ করার ব্যাপারটা অবশ্য অনেকের কাছেই একটা নিদারুণ অপরাধ বলে পরিগণিত হয়ে উঠলেও তার মধ্যে আগামী কোন বিপ্লবের চিহ্ন কেউ দেখেনি।

লুসি এরপর সত্যিই সাক্ষর হওয়ার চেষ্টায় প্রাণমন সঁপে দিল। সারাদিনে বা অবসর সময়ে খামার মালিকের সযত্ন প্রয়াসে কাজটি এগিয়ে চলল। লুসি অল্প কিছুকালের মধ্যেই প্রমাণ রাখল সে সত্যিকার পরিশ্রমী আর তার যথেষ্ট মেধাও ছিল। ভাল ছাত্রীর পরিচয়ই সে রাখল। ইতিহাস সব কথাই মনে রাখে বা তার নিদর্শনও আঁকা থাকে। এই ভাবে এখনও ভার্জিনিয়ায় মহাফেজখানায় লুসির সুন্দর বড় বড় হস্তাক্ষরের নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত আছে, সহজেই সেটা যে কেউ দেখতেও পারে। এই হস্তাক্ষরেব মধ্যে ফুটে উঠেছে লুসির চমৎকার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। এই হল একজন পরিশ্রমী কিশোরীর জীবন গাথার পর্ব।

লুসিকে শিক্ষাদান করায় প্রকৃতই কোন কার্পণ্য করেন নি খামার মালিক যুবকটি। সন্ধ্যার অবকাশে লুসিকে পাশে নিয়ে তার বিদ্যাচর্চায় সাহায্য করতেন খামারের মালিক। এক পুরুষ আর এক

রমণীর কাছাকাছি আসার এ এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে তখন ফুটে উঠত অভাবিত এক দৃশ্য। এর অবশ্যম্ভাবী ফল জন্ম নিতে দেরি হয় নি। তাই প্রেম নামক আশ্চর্য ব্যাপার জন্ম নিল দুটি মানব মানবীর হৃদয়ের কোনে। লুসি ভালবাসতে শুরু করেছিল তার অন্নদাতা আর শিক্ষককে। যুবতী লুসির নিখাদ ওই প্রেমে কোন খাদ ছিল না। সে হৃদয় ভরা প্রেমে সঞ্জীবিত করল তার শিক্ষককে। বমণীর সেই স্বর্গীয় প্রেমের বন্যায় নিজেই প্লাবিত হল লুসি। দয়িতকে সে মনপ্রাণ অনায়াসে সমর্পণ করল। যুবকটিও এই প্রেমকে অগ্রাহ্য করেনি। সে গ্রহণ করতে দ্বিধা করল না লুসিকে। তবুও কোথায় যেন একটা রহস্যময়তা জড়ানো ছিল লুসি সেটা প্রেমের আড়ালে অনুভব কবতে পারে নি। আগামীর ছবি ওর চোখে পড়ে নি।

ভালবাসার আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকলেও একদিন চরম এক সত্য আবিষ্কার করল যুবতী লুসি। নানা দিক দিয়ে সে টের পেল সে জননী হতে চলেছে। লুসিব পক্ষে সেই মুহূর্তে একটা মাত্র কাজই করার ছিল—ভালবাসার সেই পাত্রের কাছে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে রমণী যা চায় সেই বিয়ের প্রস্তাব রাখা। শেষ পর্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দোদুল্যমান হয়েই খামার মালিকেব কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করল। এ ছাড়া ওর করার কিছুই ছিল না।

কিন্তু বাস্তব যে বড় কঠিন লুসি তা বুঝতে ব্যর্থ হয়। খামার মালিক মুহূর্ত মাত্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি টের পেলেন অশিক্ষিতা, দরিদ্রা, বংশ মর্যাদাহীনা কোন যুবতীকে, সে পরমাসুন্দরী হলেও বিয়ে করা চলে না। যে কুৎসা এতে ছড়াবে তা হবে অসহনীয়। অতএব লুসিকে বিদায় করতে হবে। তাছাড়া আরও একটা কারণ যে ছিল না তা নয়—সুন্দরী নারীতে খামার মালিকের নিত্য নতুন আকাঙ্ক্ষা। লুসি সুন্দরী যুবতী হলেও যুবকটির তাকে আর ভাল লাগে নি। সে মনে মনে চাইছিল যে কোন ভাবেই হোক লুসির হাত থেকে রেহাই। শিক্ষিত খামার মালিক তাই যা করণীয় তাই করলেন এবার। লুসিকে টাকার লোভ দেখিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। হতভাগিনী লুসি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই খামার ত্যাগ করে আবার ফিরে এল নিজেদেরই কুটিরে। কিন্তু সত্য চাপা রইল না। ও যে মা হতে চলেছে কুমারী অবস্থায় সে কথা জানাজানি হয়ে গেল

চতুর্দিকে। ঘটনাটা একদিকে যেমন সকলের কাছে রসালো আলোচনার বিষয় হলো তেমনই আবার অনেকেই হ্যাঙ্কস পরিবারের উপর নানা অত্যাচারও শুরু করে দিল। অথচ দায়ী যুবকটির কথা কেউ উচ্চারণও করল না।

শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে লুসির একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিল। সমাজে স্থান হল না লুসির এরপর। শুধু লুসিরই নয় অত্যাচার চালানো হল সমস্ত হ্যাঙ্কস পরিবারের উপর। গির্জায় উপাসনা করারও অধিকার কেড়ে নেওয়া হল তাদেব। গির্জায় উপস্থিত হওয়ার অপরাধে শেষ পর্যন্ত হ্যাঙ্কস পরিবারের ভাগ্যে জুটল চরম শাস্তি আর অবমাননা, তাদের গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করল। হ্যাঙ্কস পরিবার তাদের মতে গ্রামের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে পাপ করে। করার কিছুই আর হ্যাঙ্কস পরিবারের রইল না। কেউ তাদের সমর্থন করতে এগিয়ে এলো না। অত্যাচারিত হ্যাঙ্কস পরিবার তাদের সামান্য পুঁজি আর জিনিসপত্র তুলে নিয়ে ভার্জিনিয়া ত্যাগ করে ফোর্ট হ্যারড নামের গ্রামে এসে আশ্রয় নিল। তাদের একটাই মাত্র সান্ত্বনা রইল, নতুন এই জায়গায় লুসির বেদনার কথা কারও জানার সম্ভাবনা ছিল না। লুসির কুমারী অবস্থার মাতৃত্বের কাহিনী কেউই জানল না। হ্যাঙ্কস পাবিবার বাধ্য হয়েই প্রচার করল লুসির স্বামী মৃত।

এই ভাবেই ফোর্ট হ্যারডে নতুন ভাবে জীবন কাটাতে শুরু করল লুসি হ্যাঙ্কস। লুসির রূপ তখনও অম্লান, লোকে তাব উপর থেকে সহসা দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। তখনও লুসির আকর্ষণ ছিল পুরুষের কাছে দুর্নিবার। লুসি ওর ভবিতব্য তাই এড়িয়ে চলতে পারল না। অনেক স্তাবক আবার লুসির চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করল। আগুন যেমন পোকাকে আকর্ষণ করে লুসিও সেইভাবে পুরুষকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল। লুসিব প্রেম আবার বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মতই দুকুল ছাপিয়ে এগিয়ে চলল। লুসির দুর্নিবার টান অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল ফোর্ট হ্যারডে। যারা লুসিকে নিজের করে কাছে টানতে চাইত তারা বেশ ধনী আর প্রতিপত্তিশালী মানুষ। ভার্জিনিয়ার দৃশ্যই তাই অভিনীত হতে লাগল ফোর্ট হ্যারডেও। লুসির দুর্বার প্রেম পদস্খলনের কাহিনী পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। লুসি এখানেও পরিচয় পেল ব্যভিচারিনী

হিসেবে। আর একজন মনে মনে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলেন লুসির ওই ব্যভিচারের কাহিনী শুনে। তিনি সেই পরচ্ছিদ্রান্বেষী অ্যান ম্যাকগিনটি নামের মহিলাটি। তিনি শুধু সুযোগ খুঁজছিলেন কিভাবে জব্দ কবা যায় লুসিকে। অ্যান ম্যাকগিনটি তাই একদিন যথারীতি আদালতে অভিযোগ দায়ের করলেন লুসিকে ব্যভিচারিনী বলে।

কিন্তু অ্যান ম্যাকগিনটিব ওই অভিযোগ কানে তুলতে চাইলেন স্থানীয আরক্ষা অধিকর্তা শেবিফ। লুসিকে তিনি চিনতেন আব বিশ্বাস করতেন লুসি ভাল মেয়ে। তাই আদালত লুসিকে শমন পাঠালেও শেরিফ তা অগ্রাহ্য কবে লুসিকে রেহাই দিলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল নভেম্বব মাসের কোন একদিন। কিন্তু অ্যান ম্যাকগিনটি আবার নিয়মিত অভিযোগ করা আরম্ভ করায মার্চ মাসে আবাব আদালতেব শমন উপস্থিত হল লুসিব নামে ব্যভিচারের অভিযোগে ' লুসি ততদিনে যথেষ্ট মনোবল লাভ কবেছিল কিন্তু তাতে সে রেহাই পেল না। শেষ পর্যন্ত ওই অভিযোগের ফলে লুসি আদালতে হাজিব হতে বাধ্য হল। ভাগ্যের এ এক চরম প্রহেলিকা।

আদালতে অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি লুসির বিরুদ্ধে, তাই সে মুক্তি লাভ করল। সঙ্গে সঙ্গে লুসির জীবনে এক নতুন দিগন্তও উন্মুক্ত হল। নতুন একজন প্রেমিকের আবির্ভাব ঘটল ওর জীবনে। নতুন ওই প্রেমিকটি লুসির সামনে নিজেকে সমর্পণ কবতে চাইলো। যুবক সেই প্রেমাস্পদ লুসিকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে অঙ্গীকারও করল। লুসির জীবনে এ ছিল এক নতুন দিগন্ত তাতে সন্দেহ ছিল না। লুসির বিরুদ্ধে ওঠা চবম নিন্দাকে সে আমলেই আনল না। যুবকটির নাম ছিল হেনবি স্প্যারো।

লুসিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য হেনরি স্প্যারো কোন কাজেই পিছপা হয়নি। লুসির প্রতিক্রিয়া হল অবশ্য অন্যরকম ওই প্রেম নিবেদনে। নিজের জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতে লুসি যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই লাভ কবেছিল বলে সে যথেষ্ট সতর্ক ছিল বলা যায়। সে হেনরির প্রেমের প্রস্তাবে সোজাসুজি জানাল বিয়ে সে এখনই করতে রাজি নয়। হেনরি যদি একবছর ওর জন্য অপেক্ষা করতে রাজি থাকে তাহলে একবছর শেষ হওয়ার পরেই তাকে বিয়ে করতে পারে লুসি। এই একবছর লুসি নিজেকে পবিত্র বলেই প্রমাণ করতে চায়। সে যে

কোন খারাপ মেয়ে নয় একথাই প্রমাণ করবে সে। হেনরির ভালবাসা সত্যিই প্রকৃত ভালবাসা কিনা এই এক বছরে সেটাই প্রমাণ হবে। হেনরি লুসির ওই প্রস্তাব মনে প্রাণেই গ্রহণ করল। সে এক বছর অপেক্ষায় রাজি হল।

লুসি ওর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল এমনই দৃঢ়চেতা মেয়ে সে। সে যে পবিত্রা, অপাপবিদ্ধা সে কথাই নিজের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করল। নিজেকে মর্যাদায়, সসম্মানে বসিয়ে লুসি শেষ পর্যন্ত সমাজে স্থান করে নিতেও সক্ষম হল। শেষ পর্যন্ত ১৭৯০ সালের ২৬শে এপ্রিলের এক শুন্দর লগ্নে তাকে স্ত্রীব মর্যাদা দান করল হেনরি স্প্যারো নামের সেই উদারমনস্ক যুবক। নতুন জীবনে প্রবেশ করল লুসি হ্যাঙ্কস। তখুন থেকে সে হল লুসি স্প্যারো। আদালতের আদেশও মিলেছিল বিঁয়েতে।

কিন্তু পবের ছিদ্র খুঁজে বেড়ানোই যার কাজ সেই অ্যান ম্যাকগিনটি কিন্তু লুসির ভাগ্য পরিবর্তনে আদৌ খুশি হতে পারলেন না। তার সমস্ত অভিযোগ যে তাহলে বৃথাই যাবে। অ্যান ম্যাকগিনটি নতুন করে নব উদ্যমে লুসির চবিত্র হননের কাজে নামলেন। তিনি চারদিকে প্রচাব করতে লাগলেন যে লুসির চবিত্র আদৌ ভাল নয়। যে ব্যভিচারিনী, অতএব হেনরি স্প্যাবো একসময় ওকে ত্যাগ করবেই। এ বিয়ে সুখকর হতে পারে না। হেনবি স্প্যারো কিন্তু সত্যিই ভালবাসত লুসিকে সে তাই স্ত্রীর অপবাদ সহ্য করতে না পেরে ঠিক করল দূরে কোথাও স্ত্রীকে নিযে চলে যাবে।

লুসি এতদিনে যথেষ্ট দৃঢ়ত্ব অর্জন করতে পেবেছিল। সে তাই হেনরির প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। অ্যান ম্যাকগিনটির অন্যায়ের জবাব কাজের মাধ্যমেই দিতে হবে বলে সে মনস্থ করল। সে কিছুতেই ফোর্ট হ্যারড ছেড়ে পালাবে না। কুৎসায় সে ভেঙে পড়তে রাজি হল না। হেনরিকে সে রাজি করালো সন্তানসহ তারা ফোর্ট হ্যারডেই বাস করে যাবে, কাপুরুষের মত পালাবে না।

চারিত্রিক দৃঢ়তারই তাই জয় হল। হেনরি স্প্যারো আর লুসি মাথা উঁচু করেই ফোর্ট হ্যারডে বাস করতে লাগল। তাদের আটটি সন্তানও জন্ম নেয় ক্রমে ক্রমে। এই সব সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে উচ্চপদও লাভ করে। দুটি ছেলে হন গির্জার পাদ্রী আর একজন নাতি, লুসির সেই অবৈধ কন্যাসন্তানের প্রথম সন্তান

হয়েছিলেন আরও বিখ্যাত একজন আমেরিকান। তিনি আর কেউ নন আমেরিকা যুক্তরাস্টে্র জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি, এ বই যাঁর সম্পর্কে লেখা সেই আব্রাহাম লিঙ্কন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হল তা বিশেষ ভাবেই বিরাট পুরুষ সেই আব্রাহাম লিঙ্কনের অতীত পূর্বপুরুষ সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের অবহিত কবার উদ্দেশ্য নিয়েই।

আব্রাহাম লিঙ্কনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তাব পিতামহ সেই উদার হৃদয় হেনবি স্প্যারোর চবিত্রের মহানুভবতা আব দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটেছিল। হেনরি স্প্যারোর মধ্যে যে সব গুণের সমাবেশ ঘটে ছিল আশ্চর্যজনক ভাবে তার অধিকাংশই দেখা গিয়েছিল তার উত্তর পুরুষ সেই লিঙ্কনেব মধ্যে।

আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকা যুক্তরাস্টে্র একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে অনেকেই নানা বিষয় রচনা করেছেন। ঠিক এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন উইলিয়াম এইচ হার্নডন নামক একজন। আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছিলেন দীর্ঘ বিশ বছরেরও উপব। ফলে লিঙ্কনকে তিনি কাছ থেকে দেখেছিলেন। লিঙ্কনকে তিনি যেভাবে চিনেছিলেন অনেকেই তা পারেন নি। এই কাবণে হার্নডন লিঙ্কনের এক প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন তিনটি খণ্ডে। এই জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে। প্রকাশিত হতেই প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে জীবনী গ্রন্থটি। কাছ থেকে দেখা মহান লিঙ্কনের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই জীবনীতে যেভাবে ফুটে উঠেছে আর কোন বইতে তা হয় নি। এ এক অনবদ্য রচনা। জীবনী হিসেবে এটি অতুলনীয় সন্দেহ নেই।

হার্নডন তার লিখিত লিঙ্কন জীবনীতে লিখেছিলেন :

'আশ্চর্য দৃঢ়তাব্যঞ্জক পুরুষ ছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। লিঙ্কন সহসা নিজেব বংশপঞ্জী বা পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাইতেন না। একবার তার সহযাত্রী হয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভ্রমণ করার সময় কিছু কথা শুনিয়েছিলেন আমাকে লিঙ্কন। কথায় কথায় লিঙ্কন উল্লেখ কবেছিলেন তাঁর মায়ের কথা। মাকে ভালবাসতেন আর অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন লিঙ্কন। তিনি সেদিনই বলেছিলেন তাঁর মায়ের প্রচুর গুণ ছিল আর সেই গুণের অনেকটাই তার মধ্যে সঞ্জীবিত হয়। লিঙ্কন আরও বলেছিলেন তাঁর মাতামহী ছিলেন

অত্যন্ত দৃঢ়চেতা তেজস্বিনী মহিলা। তাঁর নাম লুসি হ্যাঙ্কস। লুসি হ্যাঙ্কসের অবৈধ এক কন্যাসন্তান জন্মেছিল। সেই কন্যার নাম ন্যান্সী হ্যাঙ্কস। তিনি ছিলেন ভার্জিনিয়ার এক খামার মালিকের ঔবসজাত কন্যা। আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন ওই ন্যান্সী হ্যাঙ্কসের পুত্র। লিঙ্কন আমাকে সেই ভ্রমণের অবসবে আবও নানা কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন হ্যাঙ্কস পরিবারের চেয়ে তাঁর মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে সেই শিক্ষিত খামাব মালিকেব অর্থাৎ তাঁব সেই পিতামহেব পারিবারিক গুণাবলীর। তাঁব পিতামহ সেই মানুষটি ছিলেন বিশ্লেষণী শক্তি, দৃঢ়তা আর নানা চাবিত্রিক গুণাবলীব মানুষ। তাঁর রক্তের মধ্যে তাই ওই পরিবারেরই বক্তস্রোত বয়ে চলেছিল। তাঁবসঙ্গে হ্যাঙ্কস পরিবারের তফাৎ ওইখানেই। লিঙ্কনের জীবন লক্ষ্য কবেই তাঁর কথাব যথার্থতা স্বীকাব কবতে অসুবিধা হয় না। এখানেই লিঙ্কনের বিভিন্নতা ধবা পড়ে।

নিজের জন্মের কথা বলতে গিয়ে লিঙ্কন সেদিন আপন মনে আমাকে আরও বলেছিলেন যে মানবের জীবনে কখনও বৈধ সন্তানেরা কখনই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হয় না, তাবা সে রকম মেধা সম্পন্ন বা ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জন্মায না। অবৈধ সন্তানদের মধ্যে মানুষের নানা চারিত্রিক গুণ আশ্চর্যজনক পথেই প্রকাশ লাভ করে। তাঁর নিজের জীবনেই সে কথা পরিষ্কার প্রমাণিত। নানা বিষযে তাঁর নিজের সাফল্য, বুদ্ধির বিকাশ, দৃঢ়ত্ব, সব কিছুব মূলেই নিঃসন্দেহে কাজ করেছিল তাঁর সেই তথাকথিত পিতামহ ভার্জিনিয়ার সেই খামার মালিক যিনি লুসি হ্যাঙ্কসের অবৈধ সন্তানেব জন্মের জন্য দায়বদ্ধ। মায়ের প্রতি লিঙ্কনের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কতখানি ছিল সেদিনেই তাব প্রমাণ পাই। মায়েব স্মৃতি অহরহ জাগ্রত ছিল লিঙ্কনের মনে। মায়ের প্রতি তাঁর সমবেদনা কতখানি সেদিনেই তার প্রমাণও পেয়েছিলাম। ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন লিঙ্কন যেন তিনি তাঁর দুঃখিনী মাকে শান্তিতে রাখেন। লিঙ্কনের সেই সময়ের আবেগ আমি ভুলতে পারিনি।

'আমার কাছে নিজের মনের কথা সমস্ত উজাড করবে দেওয়াব পরেই শান্ত সমাহিত হয়ে যান লিঙ্কন, হয়তো তাঁব মায়ের কথা স্মৃতি পথে জেগে উঠে তাঁকে বিবশ বিহ্বল করে তুলেছিল বলেই। লিঙ্কন আর কোন কথা সেদিন বলেন নি।

লিঙ্কনের সে দিনের রূপ আমি ভুলতে পারিনি বলেই আজও আমি চোখের সামনে তা দেখতে পাই। নতুন এক অভিজ্ঞতা সেদিনের স্বল্পকালিন ওই ভ্রমণ লগ্নে আমি লাভ করেছিলাম স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

টমাস লিঙ্কন ও ন্যান্সী হ্যাঙ্কস

লিঙ্কনের জন্ম

লুসি হ্যাঙ্কস প্রথম জীবনে প্রলোভনের শিকার হয়েছিল হয়তো বয়সেরই ধর্মে। তার জন্য সেই অ্যান ম্যাকগিনটিব মত মহিলার কাছ থেকেও সে অত্যাচারিত কম হয়নি। লুসির ভাগ্য গোড়ায় মোটেই সুপ্রসন্ন ছিল না, ভার্জিনিয়াব সেই খামাব মালিকের জন্য তার ভোগান্তিও হয়েছিল ঢেব। খামাব মালিকের ঔরসে লুসির গর্ভে জন্ম নেয় এক অবৈধ কন্যা সন্তান। সেই কন্যা সন্তানেব নাম ছিল ন্যান্সী হ্যাঙ্কস। লুসির পদবীই ছিল ন্যান্সীর। ন্যান্সী ছোটবেলায় প্রতিপালিত হন তার কয়েকজন আত্মীয়র আশ্রয়ে থেকে। এরা ছিলেন তার মামা আব মামীমা, টম ও বেটসি স্প্যারো। খুবই স্নেহশীল তাঁরা।

ন্যান্সী শিক্ষার কোন সুযোগ লাভ করেন নি একেবারেই, কোন স্কুল শিক্ষা তো নয়ই। এমনকি ন্যান্সী নিজের নামটিও সই করতে জানতেন না তাই টিপসই দিতেন। আমেরিকার ওই প্রদেশে মহাফেজ-খানায় আজও ন্যান্সী হ্যাঙ্কসের টিপসই সহ কোন দলিল দেখা যায়। এই দলিল নিঃসন্দেহে এক মহামূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল তাতে সন্দেহ নেই।

ন্যান্সী জীবন কাটিয়েছিলেন গোড়া থেকেই আমেরিকার প্রত্যন্ত প্রদেশের সেই গভীব বনাঞ্চলের পরিবেশে। চারপাশে বিস্তৃত ছিল গভীব অবণ্যানী। মেলামেশা করার মত তেমন মানুষজনও সে অঞ্চলে ছিল না। বন্ধু বা বান্ধবী যা বোঝায় তেমন কেউ ছিল না বেচারি ন্যান্সীর। প্রায় একাকাত্বে ঘেরা অবস্থাতেই তার জীবন কেটে চলত। এইভাবেই ন্যান্সীর কৈশোর পার হয়ে এসে যায় যৌবন। যৌবনের

ধর্মেই ন্যান্সী একদিন স্বামীত্বে বরণ করেছিলেন কেনটাকি অঞ্চলের একজন মানুষকে। তার নাম টমাস লিঙ্কন। পেশায় টমাস লিঙ্কন প্রায় মজুর। লেখা পড়া তাঁরও ভাগ্যে জোটেনি। স্ত্রীর মত টমাস লিঙ্কনও প্রায় অক্ষর পরিচয়হীন। কোন রকম উচ্চাশাও লোকটির ছিল না, ছিল না কঠিন পরিশ্রম করার মত মানসিকতা। কোন রকমে পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে তাঁকে গলদঘর্ম হতে হত। বাইশ বছরের ন্যান্সী হ্যাঙ্কস টমাস লিঙ্কনকে বিয়ে করেছিলেন হৃদয়ের টানেই। প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল বিবাহিত জীবনে ন্যান্সী হ্যাঙ্কস লিঙ্কনকে। টমাস লিঙ্কন বরাবরই মানুষের বিদ্রূপবানে জর্জরিত হয়েছিলেন তার অপদার্থতার জন্য। তার একটা মাত্র কাজেই বোধ হয় দক্ষতা ছিল—আব সেটা হল বনে বনে হরিণ শিকার কবে বেড়ানো। টমাস লিঙ্কনকে তাই অনেকে ডাকত লিঙ্ক হর্ন নামেও।

টমাস লিঙ্কনের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তিনি কোন কাজেই একাগ্র হতে পারতেন না। কোন কাজ তার এক নাগাড়ে ভাল লাগত না। এই জন্য কত রকম জীবিকা যে তাঁকে গ্রহণ করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। বিচিত্র সমস্ত কাজে তাঁকে হাত লাগাতে হয় এজন্য। এর মধ্যে ছিল জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গাছ কাটা, বুনো ভালুক ধরার ব্যবস্থা করা, এজন্য ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করা, রাস্তা বানানোয় অংশ নেওয়া, বাড়ি তৈরির কাজে মজুর হওয়া, নদী পারাপার করা নৌকার মাঝি হয়ে ইত্যাদি অসংখ্য কাজ। কোন কোন অবসরে আবার রক্ষীর কাজও করেন টমাস লিঙ্কন। এক সময় দক্ষিণ অঞ্চলে সেকালীন উদ্ধত কিছু ক্রীতদাসদের চাবুক মেরে শায়েস্তা করাব কাজেও হাত লাগিয়েছিলেন টমাস লিঙ্কন ক্রীতদাস মালিকের হয়ে। এই জঘন্য কাজে তার মাইনে ছিল মাত্র ছ'টি সেণ্ট। টমাস লিঙ্কন যেমন একজন ছন্নছাড়া মানুষ, অন্যদিকে ন্যান্সী হ্যাঙ্কস তেমনই অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের আর ধর্মভীরু একজন স্ত্রীলোক ছিলেন।

ভবঘুরে আব খরচপ্রিয় মানুষও ছিলেন টমাস লিঙ্কন। কোনরকম সঞ্চয় করার কাজে তার কোন ক্ষমতাই ছিল না। শোনা যায় কোন খামারে এক নাগাড়ে দীর্ঘ দশ বছর কাজ করলেও সামান্যতম পুঁজি তিনি করতে পারেন নি। অর্থাভাব তাই চিরসঙ্গী হয়েই থাকত মানুষটির। ছিন্ন পোশাকেই তাকে চলাফেরা করতে দেখা যেত। শতছিন্ন সেই পোশাক কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে সেলাই করে

দিতেন তারই স্ত্রী ন্যান্সী লিঙ্কন। এত দারিদ্র্য কিন্তু কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি টমাস লিঙ্কনের মনে। সত্যিই বিচিত্র স্বভাবের একজন মানুষ টমাস। খালি পায়ে তরোয়াল ঝুলিয়ে পথে পথে তাকে কখনও হাঁটতেও দেখা যেত। পথচারিদের বিদ্রূপ তাকে আদৌ বিচলিত করতে পারত না।

দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন লড়াই করে ক্লান্ত হননি টমাস লিঙ্কন। বিয়ে করার পর সে দারিদ্র্য স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠল আরও বেশি প্রকট। নানা কাজ করার পর এক সময় তিনি কাঠের কারিগর হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। ভাগ্য ভাল থাকায় একটা কাজও জুটে যায় কোন কারখানায়। এই কাজে যোগ দেওয়ার জন্য টমাসকে জঙ্গল ছেড়ে কাছাকাছি এক শহরে আস্তানা নিতে হয়। কিন্তু বেচারি টমাস, তার কাজ সম্পর্কে কোন রকম ধ্যান ধারণাই ছিল না। কোন বিচার বিবেচনা না করেই কাজ করতে শুরু করার ফলে প্রচুর কাঠ নষ্ট করে ফেললেন টমাস। ফলে যা হওয়ার তাই হল তাকে একরকম দূর করেই দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত কাজটি হারাতে হল তাঁকে।

ছুতোরের চাকরি হারিয়ে টমাস লিঙ্কন এটাই বুঝতে পারলেন জঙ্গল আর শহরের জীবনে অনেক তফাৎ, তাই শেষ পর্যন্ত শহরের মায়া কাটিয়ে জঙ্গলের মানুষ টমাস আবার পুরনো জঙ্গলেই ফিরে যেতে বাধ্য হলেন সপরিবারে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে টমাস লিঙ্কনকে শেষ অবধি দারিদ্র্যের চরম সীমাতেই নেমে আসতে হল। জঙ্গলে তেমন আশ্রয়ও জুটলো না লিঙ্কন পরিবারের। গভীর অরণ্য এলাকার প্রত্যন্ত প্রদেশে আশ্রয় নিতে হল একটা ভাঙা কাঠের ঘরে সম্পূর্ণ জনবসতিবিহীন এলাকায়। কাঠের ওই বাড়ি বা কেবিনটি কেউ বানিয়েছিল পুরনো কিছু কাঠের গুঁড়ি দিয়ে। বাসগৃহ হিসেবে সেটা কেউ ব্যবহার করলেও কোন ভাবে জীবন কাটানোই মাত্র সম্ভব ছিল। দরিদ্র সহায় সম্বলহীন লিঙ্কন পরিবারের এছাড়া কিছুই ছিল না।

কাঠের ওই কেবিনের চারপাশে ছিল শুধু বন্ধ্যা, অনুর্বর পতিত পাথুরে জমির এলাকা। এলাকা জুড়ে আর ছিল বন্য কিছু গাছ। কোন একদিনে আদিম লাল মানুষরা এলাকাটা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। প্রেইরী এলাকায় চাষবাস করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কেন্টাকির প্রত্যন্ত এলাকায় সুদূর ওই অঞ্চলে ভবিষ্যতের আশা কেউ

হয়তো মনে রেখেছিল।

ক্রমে ক্রমে কিছুদিন এই ভাবেই কাটালেন টমাস লিঙ্কন আর তার স্ত্রী ন্যান্সী। কোনভাবে জীবন ধারণই বলা চলে। এরপর ১৮০৫ সালের কোন এক সময় সামান্য অর্থের বিনিময়ে টমাস লিঙ্কন ক্রয় করলেন বেশ কিছু জমি। সে সময় ওই এলাকায় জমির দাম অতি সামান্য থাকায় টমাসের ব্যয় হল মাত্র সত্তর সেন্টের কাছাকাছি। চারদিকে ঘন অরণ্য এলাকা থাকায় স্বভাবতই সেটা বন্য প্রাণীরও বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। বছরের নানা সময়ে সেখানে দলে দলে শিকারিরা হাজির হত। এই উদ্দেশ্যে কাঠের গুঁড়িতে বানানো ছিল এক কেবিনও। সেই কাঠের বিরাট কেবিনই হয়ে উঠেছিল টমাস দম্পতির আশ্রয়স্থল। *

প্রকৃতি কিন্তু এলাকাটি যেন মনের মত করেই সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সবুজ অরণ্য প্রান্ত পেরিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠতে চাইত প্রেইরী এলাকার সবুজ তৃণভূমি, যেন দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল সমুদ্র। কাঠের ওই কেবিনের চারপাশে আমোদিত করে তুলতো বুনো ফলফুলের গন্ধ। চারপাশে অসংখ্য আপেল গাছের সারি। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সাজিয়ে রেখেছেন সমস্ত কিছু। বন্য এলাকা হলেও এর কিন্তু সৌন্দর্য নেহাত কম ছিলনা। একটু দূরে দেখা যেত কুলকুল ধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে ছোট এক নদী। নদীর দুই তীরে মনোরম সৌন্দর্য অকৃপণ ভাবে দৃশ্যমান। আকাশে বাতাসে ছিল অপূর্ব মনমাতানো সৌরভ। কত নাম বা জানা পাখির কলকাকলিতে সারা দিন যেন মুখরিত হয়ে থাকতো। মনুষ্যবাস বর্জিত হয়েও তাই এলাকাটিকে অবাসযোগ্য বলে মনে হতে চাইত না।

শীতের আগমনে অবশ্য জায়গাটা হয়ে উঠত নিস্তব্ধ, শান্ত। ওই সময় প্রচণ্ড শীতে কোন মানুষেরই পদচিহ্ন সেখানে পড়ত না। নৈঃশব্দ আর একাকীত্ব ঘেরা ওই জায়গায় দীর্ঘ শীতকাল কাটাতেন টমাস আর ন্যান্সী। তারা প্রকৃতির সন্তান হয়েই থাকতেন।

এমন করেই ভালবাসার মধ্য দিয়ে দুটি নির্জন অরণ্যবাসী মানুষের দিন কেটে চলেছিল চরম দুঃখ আর দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়ে। এই ভাবে ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ঘটে গেল এক নতুন কিছু তাদের জীবনে। টমাস ও ন্যান্সী লিঙ্কনের কোলে জন্ম নিল এক শিশু সন্তান। সেই চরম শীতার্ত রবিবারের কাক-ভোরে জন্ম নিয়েছিলেন মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের একজন মহান রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন এইভাবেই। কাঠের গুঁড়িতে বানানো সামান্য ওই শিকারীদের কুটিরে স্বাচ্ছন্দ্য বলতে কিছুই ছিল না, ছিল না নবজাতক শিশুর উপযুক্ত কোন শয্যা। খড়ের বিচালীর শয্যাই হল ভূমিষ্ঠ শিশুর একমাত্র শয্যা। প্রকৃতি সে সময় উন্মত্ত, প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ চলেছিল কেবিনের বাইরে। হিমশীতল কনকনে বাতাস ঢুকছিল কেবিনেরও মধ্যে। ওই নিতান্ত শীতের দিনে ন্যান্সীর পোশাক ছিল ভালুকের চামড়ায় বানানো জোব্বা। ওই নবজাতককে কেন্দ্র করে আমেরিকার ইতিহাসে একদিন ওলট পালোট কিছু ঘটে যাবে একথা বোধ হয় কেউই সেদিন ভাবতে পারেনি। তিনিই একদিন হয়ে উঠেছিলেন মানুষের মুক্তির দূত, আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন প্রেসিডেন্ট।

আব্রাহাম লিঙ্কনই টমাস ও ন্যান্সীর প্রথম সন্তান অবশ্য নন। তাদের প্রথম সন্তান একটি কন্যা, সারা লিঙ্কন। আব্রাহামের জন্মের পর সংসারে প্রাণীর সংখ্যা তাই দাঁড়াল চারজন। প্রচণ্ড অভাব আর অনটনের মধ্য দিয়েই সংসার চলেছিল লিঙ্কন পরিবারের।

নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন লিঙ্কন পরিবার। এর মূল্যও তাই একদিন দিতে হল বেচারি ন্যান্সী হ্যাঙ্কস লিঙ্কনকে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অকাল মৃত্যু ঘটে যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রম তার সহ্য হয়নি। নিজের জন্মের জন্য তাঁকে কম নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়নি। চিরদুঃখিনীই ছিলেন ন্যান্সী। তিনি কোনদিনই ভাবতে পারেন নি হয়তো তারই সন্তান আবে লিঙ্কন একদিন পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ হবেন, সারা পৃথিবীর মানুষের শ্রদ্ধা আহরণ করতে সক্ষম হবেন। ন্যান্সী হ্যাঙ্কস লিঙ্কন কিন্তু ছিলেন অসাধারণ ঠাণ্ডা প্রকৃতির নারী। তিনি খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন।

১৮১৬ সাল এইভাবেই এসে পড়ল এক সময়। লিঙ্কনের বয়স তখন সাত বছর। ন্যান্সী হ্যাঙ্কস লিঙ্কন ঠিক ওই সময়ে লক্ষ্য করলেন টমাস যেন বড় বেশি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এর একটা কারণ হয়তো বা এই যে টমাস লিঙ্কন যে জমি ব্যবহার করছিলেন অন্য কিছু লোক হঠাৎই সেই জমিতে নিজেদের মালিকানা দাবী করে বসেছিল। টমাসের এটাও বুঝে নিতে দেরি হয়নি ক্রীতদাস ছাড়া একা কারও পক্ষে চাষের কাজ চালানো নেহাতই অসম্ভব কাজ। টমাস জানতেন ওহায়ো নদীর উত্তরাঞ্চলে রয়েছে এক জনবসতিহীন উর্বরা এলাকা।

মনে মনে টমাস লিঙ্কন সেই ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে হাজির হয়ে নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষা করার কথাটাই ভেবে বসলেন।

মনস্থির করে ফেললেন একসময় টমাস লিঙ্কন। তাই বেশি দেরিও হল না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে কেনটাকি এলাকার জমি হস্তান্তর হয়েও গেল টমাসের হাত থেকে। গভীর শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য এলাকার প্রায় একশ মাইল অতিক্রম করলেন এবার স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে টমাস লিঙ্কন ইণ্ডিয়ানার উদ্দেশ্যে চলতে গিয়ে। ন্যান্সী ভেঙে পড়েন নি এজন্য। তিনি স্বামীর সঙ্গে হাসি মুখে ওই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন। এছাড়া কিছুই অবশ্য করার ছিল না।

নতুন করে ডেরা বাঁধলেন টমাস লিঙ্কন পরিবার ইণ্ডিয়ানার অরণ্য অঞ্চলে। এর আগে টমাস অবশ্য প্রচণ্ড শীতের পর ইণ্ডিয়ানার সেই উর্বর অরণ্য প্রান্তর দেখেও এসেছিলেন।

নতুন এলাকায় পৌঁছে কোন রকমে একটা আশ্রয় জোগাড় করলেন টমাস। অরণ্যে ছিল ভালুক আর নানা বন্য জানোয়ার। জায়গাটা ছিল ওহায়ো নদীর বেশ কয়েক মাইল উত্তরে পিজন ক্রীকের কাছাকাছি। প্রায় ১৬০ একরের একটা খামারের মালিকানা লাভ করেছিলেন যাযাবর টমাস লিঙ্কন। কাছাকাছি কোন মানুষ জন বলতে কেউ ছিল না শুধু এক ভালুক শিকারি ছাড়া। জঙ্গলও বেশ ঘন ওই এলাকাব। যে কুটীর হয়ে উঠেছিল টমাস পরিবারের বাসস্থান তার সবটাই কাঠের তৈরি, এর তিনটি দিক মাত্র ঘেরা একদিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত কোন দরজা বলে কিছু ছিল না। ওই উন্মুক্ত অংশে টাঙানো হয় ভালুকের চামড়ার এক পর্দা। টমাসের মত মানুষও চিন্তিত হয়ে পড়েন তখন।

এখানেই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচতে হল টমাস পরিবারকে। প্রধান অন্তরায় ছিল নিষ্ঠুর, প্রচণ্ড আর অকল্পনীয় শীতের প্রকোপ। ইণ্ডিয়ানার ওই প্রচণ্ড শীত যে কত ভয়ানক এবার তা টের পেতে শুরু করলেন ন্যান্সী আর তার দুই ছেলেমেয়ে আব্রাহাম লিঙ্কন আর সারা লিঙ্কন। প্রথম বছর প্রচণ্ড শীত কাটাতে হল টমাস পরিবারকে প্রায় ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে। এমন ভয়ঙ্কর শীত বহু বছর ওই এলাকায় দেখা যায়নি। ১৮১৬ সালের ওই প্রচণ্ড শীত প্রায় ইতিহাস হয়ে আছে। প্রায় বুনো জন্তুর মত ওই ঘরের মধ্যে জড়াজড়ি করে ভালুকের চামড়া শরীরে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে

রাত কাটিয়ে চলেছিলেন সকলে। যে পথে কোনদিন হয়তো মানুষ এখানে আসেনি সেই পথ যখন পার হয়েছিলেন টমাস পরিবার তখন তাদের মনের জোর যে অসম্ভব তাতে সন্দেহ ছিল না। যে অবস্থায় তারা জীবন কাটাচ্ছিলেন দরিদ্রতম কোন স্থানীয় ক্রীতদাসও তা হয়তো করেনি।

খাদ্য বলতে টমাস পরিবারের জুটত অরণ্য এলাকার হরিণ আর অন্য সব বুনো জন্তুর মাংস। চারদিকের বুনো গাছের ফল আর বাদামই ছিল টমাস পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য। প্রধান অসুবিধা ছিল পানীয় জল। আমেরিকার ভবিষ্যত রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁদের সেই আদিম ইণ্ডিয়ানার কুটির থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এক ঝরণা থেকে সংগ্রহ করে আনতেন পানীয় জল আর সব সময় সাহায্য করতেন বাবাকে জঙ্গল কেটে সাফ করতে।

একদিন উন্মুক্ত কাঠের ওই আস্তানায় প্রচণ্ড সেই শীতার্ত দিনগুলো কাটানোর পরেই টমাস লিঙ্কন নতুন একটা আস্তানা বানাবেন ভেবে নিলেন। নতুন কুটির তৈরির জন্য দরকার ছিল বেশ কিছু কাঠ। একাজ করার মত মানুষ তো সেই টমাস লিঙ্কন একা আর সাহায্যকারী বালক আব্রাহাম লিঙ্কন। বালক হলেও লিঙ্কনের চেহারা ছিল শক্তপোক্ত, কঠিন কাজেও তাই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দুজনের পরিশ্রমে নতুন কাঠের তৈরি আস্তানা একদিন গড়েও উঠল। কুটির তৈরির সমস্ত কাঠই জঙ্গল থেকে কেটে এনেছিলেন টমাস আর আব্রাহাম লিঙ্কন।

পিজন ক্রীকে শেষ পর্যন্ত শীতের রুক্ষ দিন কেটে গিয়ে বসন্তকাল যথানিয়মে এসে গেল। চারদিকে রঙ বেরঙের ফুলের সমারোহ দেখা দিল। টমাস পরিবারের একাকীত্ব এই সময় কিছুটা দূর হয়ে গেল কারণ ওদের কাছে এসে পড়েছিলেন টমাস ও বেটসি স্প্যারো আর তাদের সঙ্গে সেই ডেনিস হ্যাঙ্কসও। এরাই ছিলেন ন্যান্সী হ্যাঙ্কস আর ডেনিসের পালক।

নতুন কাঠের সেই কুটিরই হল সকলের আস্তানা। মেঝে ছিল নিছক মাটিতেই তৈরি। বছরের পর বছর এমন কুটিরই ছিল আমেরিকার মহানতম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের ছেলেবেলার বাসভূমি। যে ক্রীতদাসদের একদিন বন্ধন মুক্ত করেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন তাদেরও কেউ এমন কুটিরে থাকার কথা কল্পনাতেও আনতে

পারত না। দারিদ্র্য যে কতখানি অসহনীয় আর ভয়ানক হতে পারে লিঙ্কনের জীবনই তার উদাহরণ।

ভার্জিনিয়ার ওই অরণ্য অধ্যুষিত এলাকায় একদিন সাংঘাতিক ধরণের এক রোগের উৎপাত দেখা দিল। ভয়ঙ্কর সেই রোগে সীমান্ত এলাকার অসংখ্য মানুষ আর পশু মারা পড়তে শুরু করল। লোকে এই রোগের নাম দিয়েছিল 'মিল্ক সিকনেস।' মারাত্মক ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন স্প্যারো দম্পতি। তাদের কফিন তৈরি করে কবরে শায়িত করলেন টমাস লিঙ্কন।

এখানেই দুর্ভাগ্যেব শেষ হল না। আচমকা মারাত্মক ওই রোগে আক্রান্ত হলেন ন্যান্সীও। স্প্যারো দম্পতির সেবা করাব দরুনই হয়তো তার ওই রোগ হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮১৮ সালে। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। চরম ওই বিপদের দিনে ন্যান্সীর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কবতে পাবলেন না তার স্বামী টমাস লিঙ্কন। এর একমাত্র কারণ এলাকার পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোন ডাক্তারের চিহ্ন ছিল না। আর থাকলেও হয়তো কোনই কাজ হত না যেহেতু ওই মারাত্মক মিল্ক সিকনেস রোগের কোন উপযুক্ত প্রতিষেধক তখনও কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে চলেছিলেন বেচারি ন্যান্সী লিঙ্কন। সাত দিন রোগ যন্ত্রণা তাকে প্রায় মৃত্যুর দরজায় টেনে নিয়ে গেল। ন্যান্সী নিজের শেষ মুহূর্ত যে সমাগত সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন। এই জন্যই একদিন, ১৮১৮ সালের ৫ই অক্টোবর, ন্যান্সী তার ছেলেমেয়ে সারা আর আব্রাহামকে কাছে ডাকলেন। তাদের তিনি আস্তে আস্তে বললেন তিনি চলে যাচ্ছেন, আব্রাহাম যেন চিরকাল ওর বোনকে ভালবাসে, তাকে দেখে। ন্যান্সী আরও বললেন ও যেন ঈশ্বরে ভক্তি রাখে. চিরকাল যেন তাঁকে ডাকতে ভুল না করে। কথা বলার পর পরম শান্তিতে চোখ বুঁজলেন ন্যান্সী হ্যাঙ্কস লিঙ্কন। তার দুঃখময় জীবন এই ভাবেই শেষ হয়ে গেল। টমাস লিঙ্কনের কুটিরে নেমে এল চরম বিপদের ছায়া।

ব্যথায় ভরে গেল বালক আব্রাহামের হৃদয়। আব্রাহাম লিঙ্কন মাতৃহারা হয়ে পড়লেন। মায়ের অন্তিম লগ্ন যে আসন্ন লিঙ্কন সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন আগেই। তাই যে মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন লিঙ্কন, কোনদিন সে বেদনা বিস্মৃত হন নি।

বেচারি টমাস লিঙ্কনও দারুন ভেঙে পড়লেন। চুপচাপ তিনি শুধু তৈরি করতে শুরু করলেন সদ্য প্রয়াত স্ত্রীর জন্য এক কফিন। এ যেন টমাসের ভবিতব্য। সেই কফিনে আস্তে আস্তে এক সময় শুইয়ে দেওয়া হল লুসি হ্যাঙ্কসের চিরদুঃখিনী কন্যা ন্যান্সী হ্যাঙ্কস লিনঙ্ককে। যেন সে বিষাদময়ী কোন রমণী। ইণ্ডিয়ানার অরণ্যময় নির্জন প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রকৃতির কোলে ঠাঁই নিলেন ন্যান্সী হ্যাঙ্কস। চিরজীবন অপমান, দুঃখ, দারিদ্র্য আর অবহেলার জীবন কাটিয়ে চিবশান্তিই যেন লাভ করলেন ন্যান্সী লিঙ্কন।

শান্ত নিরালায় কোন রকম শেষ কৃত্যের অনুষ্ঠান ছাড়াই ন্যান্সীর জীবনে নেমে এসেছিল চিরসমাপ্তি। তার অন্তিম শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ধ্বনিত হল না চার্চের ঘণ্টাধ্বনি বা কোন পাদরির কণ্ঠনিঃসৃত বাণী। এই ভাবেই সমাধি লাভ করলেন এককালের আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের মা।

দুঃখ মানুষের চিবসঙ্গী হলেও একদিন যে বেদনা মানুষ ভুলেও যায় একটু একটু করে। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন তার মায়ের ওই অসহায় মৃত্যুর কথা সারা জীবনেও বিস্মৃত হতে পারেন নি। যখনই তিনি ভেঙে পড়তেন আর কোন অবসাদ তাকে ঘিরে ধরত লিঙ্কন মায়ের সমাধির পাশে এসে চুপচাপ বসে থাকতেন। এতেই তিনি পেতেন পরম শান্তি।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

টমাস লিঙ্কনের দ্বিতীয়া স্ত্রী ও লিঙ্কন পরিবার

ন্যান্সী লিঙ্কনকে সত্যিকার ভালবাসতেন টমাস লিঙ্কন, তাই তার অকালমৃত্যু তাকে চরম আঘাত দিয়েছিল। তাই স্ত্রী ন্যান্সী লিঙ্কনের অকালপ্রয়াণের পর টমাস লিঙ্কন প্রায় ভেঙে পড়ে কুটিরের বাইরে অরণ্য এলাকার মধ্যেই জীবনের অধিকাংশ সময় প্রায় ঘোরাঘুরি করে কাটাতে লাগলেন। কোন দিকে, এমন কি সন্তানদের প্রতিও তার কোন খেয়াল ছিল না। বিচিত্র মানসিক যন্ত্রণায় এইভাবেই প্রায় উন্মাদের আচরণ করছিলেন টমাস লিঙ্কন। কখনও কখনও রাতেও কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করতেন না টমাস লিঙ্কন। সমগ্র লিঙ্কন পরিবারেই যেন এক ছন্নছাড়াভাব জেগে উঠেছিল, কেউ দেখার ছিল না তাদের। সবই কেমন এলোমেলো উদাসীনতায় ভরা। নিজেদের পোশাক বা শরীরের প্রতিও তাদের নজর ছিল না।

বিচিত্র বেদনাময়, জীবন কেটে চলেছিল লিঙ্কন পরিবারের। সংসারের কাজকর্মে দায়দায়িত্ব তুলে নিতে হয়েছিল বালিকা বয়সের সারা লিঙ্কনকেই। সেই রান্নার দায়িত্ব পালন করতে অভ্যস্ত ছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন সংগ্রহ করে আনতেন কাঠ আর দূরের ঝর্নার জল প্রায় এক মাইল দূর থেকে। অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে যখন বয়ে যেত প্রচণ্ড বাতাস তখন ওই কুটিরে ছোট্ট লিঙ্কন আর তার বোন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠত। মাঝে মাঝে শোনা যেত নেকড়ের ক্ষুধার্ত্ত ডাকও।

অভাবিত দারিদ্র্য ছিল হতভাগ্য লিঙ্কন পরিবারের চিরসঙ্গী। সাবান জাতীয় কোন ক্ষার পদার্থ তারা বহুকালই চোখে দেখেনি। এইজন্য নিদারুণ অপরিচ্ছন্ন শরীর আর পোশাক ছিল সকলের অবলম্বন। আমেরিকার ভবিষ্যত রাষ্ট্রপতিকে এই ভাবেই জীবন কাটাতে হয় এই সময়। এই হত দারিদ্র্যের জীবনকথা ভুলতে পারেন নি আব্রাহাম লিঙ্কন কোনদিনও। পরবর্ত্তীকালে যখন খ্যাতির শিখরে উঠতে পেরেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন তখন তিনি বলেছিলেন : "আমার

আজকের জীবনে যা কিছু লাভ করেছি সবই আমার মহীয়সী মায়েরই জন্য।' যে কুটীরের মধ্যে বাস করতেন লিঙ্কন পরিবার তার মধ্যে আরামের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। মেঝেয় বিছানো থাকতো শুকনো পাতা আর বিচালি, এটাই সকলের শয্যা। কাঠের আগুনেই চলতো আলোর কাজ। উষ্ণতা বলতেও ওই কাঠের আগুনের তাপ। সূর্যালোক বিহীন ওই কামরাই ছিল মানুষগুলির আশ্রয়। একদিকের সেই উন্মুক্ত দরজা বা খোলা অংশ দিয়ে ঢুকত প্রচণ্ড বাতাস। টমাস লিঙ্কন সেই খোলা অংশে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ভালুকের চামড়ার পরদা। আড়াল বলতে ছিল শুধুমাত্র ওই চামড়াই।

পরের শরৎকাল এসে গেল। আর তারই সঙ্গে এসে পড়ল ন্যান্সীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। এক বছর দেখতে দেখতেই যেন কেটে গেল। টমাস লিঙ্কন আগের মতই সেই ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়ে চলেছিলেন। এই একবছর কাটার পর টমাস লিঙ্কন বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন ঘর গৃহস্থালী দেখাশোনার জন্য একজন স্ত্রী থাকা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এছাড়া অন্য কোন উপায় দেখতে পেলেন না টমাস। মনে মনে তাই ঠিক করে ফেললেন আর একবার বিয়ে করা ছাড়া পথ নেই।

ন্যান্সীকে বিয়ে করেন নি যখন টমাস লিঙ্কন তখন তার সঙ্গে সারা বুশ জনষ্টন নামে একটি মেয়ের ভাব ছিল। প্রায় তেরো বছর আগে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন টমাস লিঙ্কন, কিন্তু সারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সারা বিয়ে করেছিলেন ড্যানিয়েল জনস্টন নামে একজন জেলারকে। তাদের বাস ছিল এলিজাবেথ টাউনে। সারার স্বামী ড্যানিয়েল জনস্টন ইতিমধ্যে প্রচুর দেনা রেখে মারা গেছিলেন। সারা আর তাদের তিনটি সন্তান এলিজাবেথ, ম্যাটিল্ডা ও জনকে রেখে যান তিনি। টমাস ঠিক করলেন সারার কাছে তিনি ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব রাখবেন।

কথা মতই নিজেকে তৈরিও করলেন টমাস লিঙ্কন। একদিন সেই কারণেই কেনটাকির এলিজাবেথ টাউনের দিকে রওয়ানা হলেন টমাস। দেহে সেই বিচিত্র পোশাক কোমরে ঝোলানো তরোয়াল টমাসের। সামান্য যা কিছু পুঁজি তাই সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি।

সময়টা ছিল ১৮১৯ সালের। সারা জনস্টনের যে তিনটি ছেলেমেয়ে ছিল তাদের বয়সও প্রায় টমাসের ছেলেমেয়ের সমান আর তাদের অভাব অভিযোগও প্রায় একই ধরণের ছিল। টমাস লিঙ্কন

সারার কাছে হাজির হয়ে সোজাসুজি বলেছিলেন যে তার স্ত্রী মারা গেছে আর সারারও স্বামী নেই। তিনি তাই সারার কাছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই এলিজাবেথ টাউনে উপস্থিত হয়েছেন। এখন সারা যদি তাকে বিয়ে করতে রাজি থাকে তাহলে সেটা ঘটে যাওয়াই ভাল হবে।

শোনা যায় সারা বলেছিলেন টমাসকে বিয়ে করতে তার আদৌ কোন আপত্তির কারণ নেই, তবে তার একটাই মাত্র অসুবিধা আছে তাহল সারার কিছু দেনা আছে সেটা আগে শোধ করতে হবে। এ কথায় অবশ্য টমাস মোটেই হতাশ হননি, নিজের শেষ কপর্দক দিয়ে সারার দেনা তিনি পরিশোধ করেও দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সারা জনস্টন পদবী পরিবর্তন করে হয়ে গেলেন সারা লিঙ্কন।

টমাস লিঙ্কন একদিন নব বিবাহিতা স্ত্রীকে আর তার তিনটি সন্তানসহ এসে পৌঁছলেন তার পিজান ক্রীকের কুটিরের সামনে।

সারা বুশ লিঙ্কন ছিলেন সত্যিকার একজন দৃঢ় চরিত্রের নারী। দারিদ্র্য আর অভাবে জড়িত লিঙ্কন পরিবারকে তিনি তার চমৎকার চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। টমাস লিঙ্কনের দুই সন্তান, সারা আর আব্রাহামকে নিজের সন্তানের মতই তিনি আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আমেরিকার ভবিষ্যত প্রেসিডেন্টের উপর ওই মহীয়সী রমণীর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল একথা স্বয়ং লিঙ্কনই স্বীকার করেছিলেন।

সময়টা ছিল নব উন্মেষেরই যুগ।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

আব্রাহাম লিঙ্কনের শিক্ষা ও ছাত্রজীবন

পরিপূর্ণ শিক্ষালাভ করতে পারেননি আব্রাহাম লিঙ্কন কোনদিন। কিশোর বয়স পর্যন্ত তার সবেমাত্র বর্ণমালা সম্পর্কে জ্ঞানই জন্মেছিল। কিশোর বয়স অর্থাৎ প্রায় চোদ্দ বছর বয়স অবধি বলা যায় সে সময় বর্ণমালা চিনতে পারলেও তিনি লিখতে তখনও শেখেননি।

লেখা পড়া করার জন্য লিঙ্কন অবশ্য কিছুকাল স্কুলেও গিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন তিনি টুকটাক স্কুলে গিয়েছিলেন। তাঁর মোটামুটি স্কুলে কেটেছিল নবছর ধরে অথচ তাঁর মোট স্কুলে পড়ার দিনগুলো যোগ করলে হয়তো বা এক বছরেরও কমই হবে। সারা জীবন ধরে এমন কি যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন লিঙ্কন তখনও তিনি এই বলে দুঃখ করেছেন যে তিনি কোনদিন কেতাদুরস্ত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা পাননি আর যা শিখেছিলেন তার সবটাই আয়ত্ব করেছিলেন অসামান্য অধ্যবসায়ের জোরে। দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার পরিবেশ ছিন্ন করে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে আব্রাহাম লিঙ্কন যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন কোটি কোটি মানুষ হাজার সুযোগ সুবিধা আর স্বচ্ছলতা সত্বেও সেই জ্ঞানের কণামাত্রও লাভ করতে পারে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ আব্রাহাম লিঙ্কনের এখানেই তফাৎ।

গরীবের সন্তানরাও যেমন শিক্ষালাভ করার জন্য স্কুলে যেতে শুরু করে টমাস লিঙ্কনের ছেলে আব্রাহাম লিঙ্কনও সেই ভাবে একদিন ইণ্ডিয়ানার অরণ্য অঞ্চলের স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। লিঙ্কনের বোন সারাও তাই। ঘন অরণ্য এলাকার মধ্য দিয়ে লিঙ্কন আর সারা প্রথম স্কুলে যেতে আরম্ভ করলেন ১৮২৪ সালের কোন একদিন। স্কুল ছিল প্রায় চার মাইল দূরে। দীর্ঘ ওই পথ হেঁটেই পার হতে হত ভাই-বোনকে। পিজান ক্রীকের কাছে যে স্কুলে প্রথম পাঠ নিতে আরম্ভ করলেন আব্রাহাম আর তার বোন সেই স্কুলের নাম ছিল ডোর্সের স্কুল।

এক বছরেরও কম সময় ধরে লিঙ্কন যে সব স্কুলে পড়েছেন তাদের মধ্যে ছিলেন পাঁচজন শিক্ষক। এদের মধ্যে দুজন কেনটাকির আর তিনজন ইণ্ডিয়ানার।

সীমান্ত এলাকার ওই সমস্ত স্কুল প্রধানত চলত চাঁদার সাহায্যে। সমস্ত স্কুলগুলোর অবস্থা ছিল একই রকম। এই সমস্ত স্কুলে ছাত্রদের বেশ চেঁচিয়ে পড়া অভ্যাস করতে হত। এটাই ছিল সেকালের প্রচলিত পদ্ধতি। ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা চিৎকার করে নামতা মুখস্থ করে চলার সময় মনে হত স্কুলটি যেন বিরাট কোন মৌমাছির চাক। ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায় থাকত না ছাত্রদের। ফাঁকি দেওয়ার অর্থ ছিল শাস্তি পাওয়া। শিক্ষক এজেল ডোর্সে ফাঁকির শাস্তি দিতেন হিকরি গাছের ছড়ি দিয়ে সকলের পিঠে আঘাত করে।

যে স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন সেই স্কুলবাড়ি ছিল কাঠের গুঁড়িতে তৈরি। জানালা বলতে কিছুই ছিল না সেখানে। ভিতরে ছিল আধো অন্ধকার। জানালায় তেলা কাগজ লাগানো থাকায় ম্লান আলো ঢুকতে পারত সে ঘরে। চেরা কাঠের বানানো বেঞ্চিতে বসে আরাম বলতে কিছুই মিলত না। প্রচণ্ড শীতকে বাগ মানাতে ঘরে জ্বালানো হত কাঠের আগুন। জ্বলন্ত ওই কাঠের তাপে শিক্ষক আর ছাত্রদের সারা শরীরই যেন জ্বলে যেত আর পিছনের ছাত্ররা কাঁপত হিহি করে।

ইণ্ডিয়ানার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন এজেল ডোর্সে ছাড়াও ক্রফোর্ড আর সুইনি। লিঙ্কনকে পড়তে হত নীল মলাট দেয়া ওয়েবস্টারের বানান শিক্ষার বই পাইকের অঙ্কের বই আর বাইবেলের নানা গল্প। জর্জ ওয়াশিংটন আর টমাস জেফারসনের জীবনীও তাঁর পাঠ্য ছিল। তাদের বীরত্ব কাহিনী ভাল লাগত লিঙ্কনের।

পড়ার মত হাতের লেখাও যত্ন করে অনুশীলন করতেন লিঙ্কন। তাই তাঁর হাতের লেখা ছিল চমৎকার, মুক্তোর মতই সুন্দর। একটু একটু লিঙ্কন পড়তে আর লিখতে শিখে ফেলেন। তার কোন পেন্সিল বা লেখার কাগজ জুটত না। কাগজ ছিল একান্ত দুষ্প্রাপ্য। কাগজের অভাব লিঙ্কন মেটাতেন কাঠের বোর্ডের উপর কাঠ কয়লার সাহায্যে লিখে। পরে যখন কোনদিন কাগজ সংগ্রহ করতে পেরেছেন লিঙ্কন কাঠের উপরের সেই লেখা তাতে কপি করেছেন বন্য মোরগের পালক দিয়ে তৈরি কলম আর ব্ল্যাকবেরি গাছের শিকড় থেকে তৈরি কালি

দিয়ে।

চার মাইল হেঁটে স্কুলে যেতেন লিঙ্কন আবার সেই দূরত্ব পেরিয়ে ফিরেও আসতেন। ভাল আবহাওয়ায় তাঁর এটা ভালই লাগত। স্কুলে থাকতে দারুন ভাল লাগত তাঁর, ভাল লাগত লেখাপড়ার কাজ। পড়তে তাঁর এতটা ভাল লাগত যে অবসর পেলেই বই পড়তেন তিনি। স্কুলে যেতে ভাল লাগত বলে লিঙ্কন প্রত্যেকটা মূল্যবান দিন কাজে লাগাতেন। তিনি সবার আগে স্কুলে পৌঁছতেন আর সকলকেই লেখাপড়ায় পিছনে ফেলে যেতেন। তাঁর মত ভাল বানান কেউই করতে পারত না। অঙ্ক বই তার না থাকায় ধার করে বই এনে রাতের পর রাত জেগে থেকে সেই সব অঙ্ক টুকে নিতেন তিনি। অঙ্ক বই অত্যন্ত দামী বলে গরীবের সন্তান লিঙ্কন সে বই কিনতে পারেন নি। তবুও তার অদম্য উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি কোন সময়েই।

ডোর্সে ও সুইনির স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করার সময় লিঙ্কন জন্তু জানোয়ারের প্রতি নিষ্ঠুরতার বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

লিঙ্কনের অনেক সহপাঠি সুযোগ পেলেই অতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে চাইত তাদের প্রতি। ওই রকম রুক্ষ সীমান্ত প্রদেশের কঠোর প্রকৃতির ছেলেরা খুবই হৃদয়হীন আর নিষ্ঠুরতায় অভ্যস্ত হয়ে থাকত। লিঙ্কন খুবই বেদনাবোধ করতেন। লিঙ্কনের সহপাঠিদের নিষ্ঠুর খেলা ছিল এই রকম ধরণের—ছেলেরা নদী থেকে কচ্ছপ ধরে তাদের পিঠের খোলার উপর জ্বলন্ত আগুন চেপে ধরে আনন্দ পেত। লিঙ্কন বারবার তাদের অনুরোধ করতেন ওই ধরণের নিষ্ঠুর আচরণ না করার জন্য। লিঙ্কনের ওই সদয় ব্যবহারের কথা অনেকেই দীর্ঘকাল ধরে স্মরণে রেখেছিল।

জীবজন্তুদের প্রতি ওই নিষ্ঠুরতার দৃশ্য লিঙ্কনের মনে যে গভীর দাগ কেটে বসেছিল তার জের অনেকদিন ধরেই চলেছিল। এই সব ঘটনা নিয়ে তাই লিঙ্কন জীবনের প্রথম এক রচনাও লিখেছিলেন। তিনি সেই রচনায় বলেছিলেন জীবজন্তুদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার না করে সদয় ব্যবহার করা দরকার। গভীর সমবেদনা নিয়ে তিনি সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন জীবজন্তুকে ভালবাসতে। এই সমবেদনার টান চিরদিনই হৃদয়ে লালন করেছিলেন লিঙ্কন। এ ছিল আমেরিকার ভবিষ্যত প্রেসিডেন্টের আজন্ম এক সংস্কার।

আব্রাহাম লিঙ্কনের আরও একটা বিষয়ে খুবই আগ্রহ আর হৃদয়ের টান ফুটে উঠেছিল। এ ছিল কবিতা লেখার প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা। লিঙ্কন সারা জীবন ধরেই কাব্যের ভক্ত ছিলেন। ছাত্র বয়সেই তার সেই আগ্রহ জেগেছিল আর সেই কারণেই তিনি ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনার চেষ্টাও করেছিলেন। ছেলেবেলায় লেখা এরকম কিছু কবিতার সন্ধানও এক সময় পাওয়া গিয়েছিল লিঙ্কনের। ডোর্সে আর সুইনির স্কুলে পাঠ গ্রহণ করার সময় আর তা ঢের পরেও লিঙ্কন এই ছন্দমিলে ভরা কবিতা লেখার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

কবিতাই শুধু নয়, লিঙ্কন এছাড়াও নিজের নানা রকম পছন্দ সই বিষয়ের উপর নানা প্রবন্ধও লিখতে ভালবাসতেন। লিখেও ছিলেন অনেক। লিঙ্কনের দৃষ্টিভঙ্গী এ ব্যাপারে বেশ মনোজ্ঞ ছিল সন্দেহ নেই। লিঙ্কনের লেখা ওই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে তাপমাত্রা, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়ও ছিল। জাতীয় জীবনে রাজনীতির ভূমিকা নিয়েও লিঙ্কন চমৎকার এক প্রবন্ধ লিখে প্রশংসা পেয়েছিলেন। এ ছিল লিঙ্কনের জীবনের এক চমৎকাব দিক ওহিওর কোন কাগজে এক সময় লিঙ্কনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই রকমভাবে চলেছিল আব্রাহাম লিঙ্কনেব শিক্ষা জীবন। পাঁচ বছর পরে তিনি অন্য কোন স্কুলে গিয়েছিলেন কিন্তু দারিদ্র্য আর সাংসারিক প্রচণ্ড নৈরাশ্যই তার ছাত্র জীবনে ছেদ টেনে দেয়।

এই ভাবেই তাই লিঙ্কনের সারাজীবনে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারটা টিকে ছিল হয়তো মাত্র বারো মাসেরই মত সে কথা আগেই বলেছি। একদিন তাই স্বাভাবিকভাবেই তার স্কুল জীবনে ইতি ঘটে গেল। জীবনে নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভ আর তার হয়ে উঠল না। শিক্ষালাভের পথ লিঙ্কনের জীবনে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে ওঠেনি। চিরজীবনে সে কথা ভুলতে পারেন নি লিঙ্কন। নিজের ওই দৈন্য মেটাবার আপ্রাণ চেষ্টা তাই তিনি করেছেন সারাটা জীবন ধরে। তার শিক্ষার আগ্রহে কোনদিনই তাই ভাঁটা পড়েনি।

প্রেসিডেন্টের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় লিঙ্কন তাই বলেছিলেন : অনেক বয়স হওয়া অবধি আমি লেখাপড়ার তেমন কোন সুযোগ পাইনি। তা সত্বেও যতটুকু সুযোগ পেয়েছিলাম সেটুকুই কাজে লাগিয়েছিলাম, শিখেছিলাম সামান্য লেখাপড়া।

আমার স্কুলে পড়ার মেয়াদ হয়তো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বারোটা মাসই হবে। আজ এই সময়ে আমি যতটুকু জেনেছি, যতটুকু শিখেছি তার সবই চলার পথের অভিজ্ঞতা আর সঞ্চয়ে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। প্রয়োজন আর জ্ঞানতৃষ্ণার অপার আকাঙ্ক্ষাই আমাকে অদম্য উৎসাহ আর প্রেরণা জুগিয়েছে। আমার প্রাণপন চেষ্টা আর পরিশ্রমই আমাকে যা কিছু শিখিয়েছে। জ্ঞানার্জনের এই আকাঙ্ক্ষা আমার মনকে উতলা করে বলেই আমি আজও শিখতে পিছপা হইনা। আমি জানি এ দৈন্য আমার হয়তো কোনকালেই মিটবে না।'

সত্যিই এ এক আশ্চর্য প্রতিভার স্ফুরণ সন্দেহ ছিল না। কোন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হয়েও আব্রাহাম লিঙ্কন জীবনের মহান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। জ্ঞানের বিশাল সাগরে আজীবন সাঁতার কাটার চেষ্টায় ভাঁটা পড়েনি তার। শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্খার ফলে একদিন লিঙ্কনের সামনে জ্ঞান রাজ্যের সমস্ত বাধা সরে গেলে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন নানা বিষয়ে জানার জন্য। ভালভাবে পড়তে শেখার মুহূর্তেই এই নতুন দিগন্তের দরজা এক সময় উন্মুক্ত হয়ে গেল তার সামনে। এই সময় লিঙ্কনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন টমাস লিঙ্কনের দ্বিতীয়া স্ত্রী, লিঙ্কনের বিমাতা। নানা জিনিসপত্রের সঙ্গে লিঙ্কনের জন্য নানা বিষয়ের বই আনতে ভুলতেন না তিনি। এই সব বইয়ের মধ্যে অনেকগুলোই লিঙ্কনকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। পড়ার অভ্যাস এই ভাবে দৃঢ়ভাবে জেগে ওঠে লিঙ্কনের মধ্যে। এই সব প্রিয় বইয়ের মধ্যে ছিল ঈশপের গল্প, রবিনসন ক্রুশো, পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস, আর পার্সন উইমের রচিত জর্জ ওয়াশিংটন। এছাড়াও প্রিয় বই ছিল লিঙ্কনের কাছে বাইবেল আর সিনবাদ নাবিকের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে এই সব বই ছিল সাতরাজার ধন এক মাণিকের মতই। বাইবেল আর ঈশপের কাহিনী লিঙ্কনের হৃদয়ে প্রায় গেঁথে ছিল সারা জীবন। তিনি পরবর্তী জীবনেও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হননি। যখনই ভবিষ্যত জীবনে সুযোগ পেয়েছেন লিঙ্কন এই দুটি বই থেকে নানা উদ্ধৃতি দিতে চেয়েছেন। যখনই সুযোগ এসেছে পঠিত বই প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছেন লিঙ্কন। তার স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রখর।

উইমের ওয়াশিংটনকে নিয়ে লেখা জীবনী গ্রন্থটি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিল আমেরিকার ভবিষ্যত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের উপর। আশ্চর্য কথা উইমের ওই জীবনীগ্রন্থ আবার অনেকেরই কঠোর সমালোচনাও লাভ করেছে। কিন্তু একথা বলতেই হবে সত্যপ্রিয় আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র গঠনে এই বইটি সুদূর প্রসারী আর স্থায়ী এক প্রভাব বিস্তার করে তাতে কণামাত্রও সন্দেহ ছিল না। অনেক দিক দিয়ে লিঙ্কন ওয়াশিংটনের চরিত্রের ছায়াতেই যেন নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। আমেরিকার এই ছুজন প্রেসিডেন্টের চরিত্রে আশ্চর্য রকম মিল ছিল। লিঙ্কন অদ্ভুতভাবে ভালবাসতেন ওই জীবনী গ্রন্থটি পাঠ করতে। রাত্রিতে সকলে ঘুমের কোলে আশ্রয় নিলে তিনি শুয়োরের চর্বির আলো জ্বালিয়ে সেই জীবনী বার বার পড়তেন। ওয়াশিংটনের সঙ্গে যে মিল তার চোখে পড়ত সেটা না বললে চলে না। ছুজনেই ছিলেন দীর্ঘকায়, ওয়াশিংটন ছ'ফিট এক ইঞ্চি, আর লিঙ্কন ছ'ফিট চার ইঞ্চি। ছুজনেই যৌবনে খেলোয়াড় হিসেবে নাম করেছিলেন, আবার বলাই বাহুল্য ছুজনেই হয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ছুজনেই ছিলেন প্রকৃত সৎ মানুষ সন্দেহ নেই।

ওয়াশিংটনের জীবনীব মত লিঙ্কনেব আর এক প্রিয় গ্রন্থ ছিল স্কটের রচিত 'স্কটস্ লেসনস্'। এ বই ছুটিই ছিল তার নিত্য কাছের জিনিস। সময় পেলেই তাতে তিনি ডুবে থাকতেন।

বই পড়া আব্রাহাম লিঙ্কনকে যেন নেশার মতই পেয়ে বসেছিল। যে সামান্য কিছু বই তার হাতে আসত তাতে তার মত জ্ঞান পিপাসুর তৃষ্ণা যে মিটত না বলাই বাহুল্য। বই কেনার সামর্থ্য তার ছিল না বলেই সুযোগ পেলেই তিনি লোকজনের কাছ থেকে পত্রপত্রিকা আর নানা ধরণের বই চেয়ে আনতেন পড়ার জন্য। এই নেশা তাকে টেনে নিয়ে যেত ওহিও নদী পেরিয়ে একজন মানুষের কাছে। এই ভাবেই লিঙ্কন বই এনে পড়ে ফেলেছিলেন ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের নানা আইন কানুনের বই, আমেরিকা মহাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র আর দেশের সংবিধান। এমনই তীব্র ছিল আমেরিকার ভবিষ্যত প্রেসিডেন্টের জ্ঞানলোকের স্পৃহা। লিঙ্কনের এই অধ্যবসায়ের কোন তুলনা আব কারো জীবনে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে তিনি তুলনাহীন অনন্য এক প্রতিভা।

লিঙ্কনের সম্পর্কিত ভাই ডেনিস হ্যাঙ্কস বলেছিলেন তিনি কোনদিনই লিঙ্কনকে বই ছাড়া দেখেন নি। মাঠে কাজ করার সময়ও তার পকেটে থাকত একখানা বই সুযোগ মত পড়ার জন্য। সিঁড়ির ধাপে পিঠ রেখে ঠেস দিয়ে বসে পড়তেন লিঙ্কন। চিরকালই তার ওই অভ্যাসটি বজায় ছিল।

এই পড়াশুনা করাব ফাঁকে লিঙ্কন করতেন কঠিন আর অপরিমিত কায়িক পরিশ্রম। কোন ক্লান্তি তাকে গ্রাস করতে পারত না। তিনি তার বাবা টমাস লিঙ্কনকে জঙ্গলে কাঠ কাটতে, মাঠে চাষ করতে, বীজ বুনতে আর ফসল সংগ্রহ করতে নিয়মিত সাহায্য করতেন। শুধু নিজেদের সংসারের জন্যই নয়, আব্রাহাম লিঙ্কন পড়শীদের চাষবাসেও সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন। আর সেই কাজ করার ফাঁকে পকেট থেকে বই বের করে পড়তে শুরু করতেন। বই পড়ার নেশা মিশে ছিল লিঙ্কনেব প্রতিটি বক্ত বিন্দুতে। একখানা বই পড়ার জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে তার আপত্তি ছিল না। তিনি নিজেই তার একজন বন্ধুকে বলেছিলেন কোন বইয়ের জন্য পঞ্চাশ মাইল হাঁটতেও তার আপত্তি ছিল না। এইভাবে পড়ার জন্য লিঙ্কনের মনের প্রসারতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্ষেত খামারের কাজে ব্যস্ত থাকার সময় লিঙ্কন কখনও কখনও জুলিয়াস সীজার বা হ্যামলেট থেকে ভরাট গলায় আবৃত্তি করে চলতেন। এসব ব্যাপার পড়শীদের অনেকেই আবার পছন্দ কবত না। কথাটা শেষ পর্যন্ত টমাস লিঙ্কনেরও কানে পৌছল। তিনি লিঙ্কনকে ডেকে কড়া ধমক দিয়ে বলেও দিলেন এইসব আবৃত্তি আর পড়াশোনার কাজ ভদ্রলোকের ছেলেকে সেকাজ তিনি করতে দেবেন না। লিঙ্কন স্বভাবতই প্রচণ্ড আঘাত পান এতে তাই বাবাকে কোনদিনই মনে প্রাণে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি।

শুধু কায়িক পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর পড়ায় আগ্রহই ছিল না লিঙ্কনের, তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি আর কথা বলার চমৎকার ক্ষমতাও ছিল অপর্যাপ্ত। তাছাড়া ভারি সুন্দর গল্প বলতেও পারতেন লিঙ্কন। এসব ক্ষমতা ছিল তার সহজাত। এইসব ক্ষমতার জন্যই লিঙ্কন বাড়িঘর তৈরি আর মৌমাছি পালনের জন্য বারবার সকলের আমন্ত্রণ পেতেন। এইসব কাজ করতে করতে তিনি পড়শীদের সকলকে নানা মজার কথা আর গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিতেন। বক্তৃতা করার ক্ষমতা সহজাত ছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের। ন্যায়ের প্রতিও ছিল তার আন্তরিক টান,

আর এই কারণেই তিনি আইন ব্যবসার দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

কোন সময় আদালতেও হাজির হতেন লিঙ্কন। মামলা চলাকালীন জেরা সওয়াল ইত্যাদি তাকে দারুণ আকর্ষণ করত। এই কারণেই তিনি মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে আদালতে হাজির হতেন। আদালতের বয়ান তিনি বহুক্ষেত্রে কণ্ঠস্থ করে আবৃত্তি করতেও পারতেন। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা। ইণ্ডিয়ানার আইন সম্পর্কে পড়ার জন্য কখনও কখনও লিঙ্কন বারো মাইল পথ হেঁটে যেতেন।

উনিশ বছর বয়সের সময় লিঙ্কন দীর্ঘ দেহের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তার উচ্চতা দাঁড়ায় ছ'ফিট চার ইঞ্চি। তাঁর দুটি হাত আর পা ছিল অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ। তাঁর দৈহিক ক্ষমতাও ছিল অস্বাভাবিক, প্রায় তিনজন মানুষের সমান। অনায়াসে তিনি বড বড় দুটো কাঠের গুঁড়ি হাতে তুলে নিতে পারতেন আর কাছাকাছি থাকা যে কোন মানুষকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারতেন। তার সমকক্ষ কেউই সেখানে ছিল না।

লিঙ্কনের এই সব কাজে সবচেয়ে বেশি উৎসাহদান করতেন তারই সৎমা সারা বুশ লিঙ্কন। একদিনের জন্যও তিনি লিঙ্কনকে তিরস্কার করেন নি। অন্যদিকে টমাস লিঙ্কনই ছিলেন যেহেতু পরিবারের প্রধান তিনিই লিঙ্কনের সমস্ত উপার্জন গ্রহণ করতেন। এইজন্য লিঙ্কনকে যেমন পড়শীদের জন্য চাষবাসের কাজ করে দিতে হত, তেমনই শুয়োর জবাইয়ের কাজও করতে হত। এর জন্য তার প্রাপ্য হত মাত্র একত্রিশ সেণ্ট। নিরানন্দের হলেও মুখ বুঁজে সে কাজ করতেন লিঙ্কন। যে কোন কাজ করতেন লিঙ্কন তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। সুযোগ পেলেই লিঙ্কন যোগদান করতেন মল্লযুদ্ধেও। এইভাবেই একটু একটু করে লিঙ্কনের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই সময় লিঙ্কনের জীবনে দুখানা বই দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বই দুখানা হল 'রিভাইজড্ লজ অব ইণ্ডিয়ানা, আর 'দি কলাম্বিয়ান ক্লাস বুক'। এই বই দুটি লিঙ্কন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে বারবার পড়েছিলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন শেষ পর্যন্ত হয়েছিলেন আইন ব্যবসায়ী এটা পরিচিত কাহিনী। তাঁর ওই জীবিকা গ্রহণে প্রথম বইখানা অপার আগ্রহশীল করে তোলে, শুধু তাই নয় স্বাধীনতার সনদ আর তার

রচয়িতা টমাস জেফারসনের প্রতি তার শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। তিনি ওই বই থেকেই জেনেছিলেন উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় দাসপ্রথা সম্পূর্ণ বেআইনী। এই থেকেই লিঙ্কনের মনে জাগে এই কথাটি : "জন্মসূত্রে সব মানুষ সমান—স্বাধীনতা সুখে সকলেরই সমান অধিকার।'

দ্বিতীয় বইখানি 'দি কলাম্বিয়ান ক্লাস বুক' লিঙ্কনের চিন্তাশক্তির পরিধিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে বাইরের জগতেও পরিব্যপ্ত করে। এই বইটিই তাকে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জনে প্রচুর সহায়তা করেছিল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

মিসিসিপির বুকে লিঙ্কন

লিঙ্কন একদিন বলেছিলেন, 'স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে কোন গরীবের ছেলের মতই আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। কখনও আমি ভাড়াটে মজুরের কাজ করেছি, কখনও কাঠ-চেরাইয়ের কাজ, আবার কখনও মালবাহী নৌকার মাল্লার কাজ—।'

কথাটা পরিপূর্ণ সত্য ছিল লিঙ্কনের জীবনে।

লিঙ্কন যাই করে থাকুন কৈশোরের সেই দারিদ্র্যেঘেরা জীবনলগ্নে তিনি যে কায়িক পরিশ্রম করেছিলেন সেটা তাঁর জীবনের এক অধ্যায়। তিনি সারা জীবন জলযান আর নদীতে নৌচালনায় বিশেষভাবেই আগ্রহ বোধ করেছেন। ১৮২৮ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সের সময় লিঙ্কন দায়িত্ব পেয়েছিলেন পড়শীর বিশাল একখানা তলাচ্যাপ্টা নৌকা তৈরি করে তাতে ফসল বোঝাই করে নিয়ে যেতে। ওই নৌকায় ছিল আরও নানা ফল শুয়োরের মাংস এই সব জিনিসও। তিনি ওই ভেলার মত নৌকা চালিয়ে নিয়ে গেছেন ১৮০০ মাইল দূরে মিসিসিপি নদী পেরিয়ে নিউ অর্লিন্সের তুলোর খামার মালিকদের কাছে বিক্রি করার জন্য।

লিঙ্কন ওই ভাবে নদী পার হয়ে চলতে দারুণ আনন্দ আর প্রচুর

উত্তেজনা বোধ করতেন। একাজ তিনি শিক্ষানবিশী করে শিখে ছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। এই ভাবে নৌ চালনার কাজ করার মুখে বহুবার নানা বিপদে পড়েছেন আব্রাহাম লিঙ্কন, পেয়েছেন আঘাত গুণ্ডাদের আক্রমণে। কিন্তু এসবের কিছু তার আগ্রহ টলাতে পারেনি, গুণ্ডাদের তিনি একাই শায়েস্তা করেছেন অসীম সাহসে নির্ভর করে। এই সব কাজের মধ্য দিয়ে উপার্জন করেছিলেন লিঙ্কন। কাজ করেছেন মজুরেরও। তার আয় ছিল দৈনিক মাত্র একত্রিশ সেণ্ট। জেমস টেলর নামে একজনের কাছে কাজ করেন লিঙ্কন। একদিন এক ডলার আয় ছিল তার কাছে চরম আনন্দ আর পরিতৃপ্তির।

উনিশ বছরের দীর্ঘকায় হাসিখুশি লিঙ্কন ক্রমেই সকলের কাছে একান্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। কোন কঠিন পরিশ্রমে তার ক্লান্তি আসত না হাসিমুখে তিনি যে কোন কাজেই এগিয়ে যেতেন। এছাড়া আরও একটি গুণ ছিল কিশোর আব্রাহামের—আর তা হল ন্যায় নিষ্ঠা এবং সততা। এই গুণটিব জন্য লিঙ্কন সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।

শারীরিক ক্ষমতা ছিল লিঙ্কনের সহজাত। এই বিশেষ গুণের জন্য লিঙ্কন একসময় জেমস জেণ্টি নামে একজন ধনীর কাছে খেয়া পারাপারের কাজ পেয়েছিলেন। কাজটি ছিল মানুষজনকে সেই বিশাল তলাচ্যাপ্টা নৌকায় পারাপার করানো। তাছাড়া মাল পরিবহণের কাজও ছিল বলাই বাহুল্য। ওই নৌকা নিয়ে লিঙ্কনকে যেতে হত নিউ অর্লিয়েন্সে। লিংকনের মাইনে ঠিক ছিল মাসে আট ডলার।

মিসিসিপির বুকে এইভাবে পারাপার করার মধ্যে সত্যিই এক বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করতেন কিশোর লিঙ্কন। মিসিসিপির বুকে যে সব জলযান ভাসতে দেখা যেত তার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র কিম্ভূত আকারের ছিল ওই তলা চ্যাপ্টা ভেলাকৃতি নৌকোগুলো। ওহায়ো নদীর তীরে যে সব বিশাল বিশাল গাছ জন্মাতো সেগুলো কেটে তক্তা বানিয়ে ওই নৌকা বানানো হত। এগুলো দৈর্ঘ্যে হত প্রায় কুড়ি থেকে আশি ফুটের মত। এর উপরে বানানো হত ঘর আর মালপত্র রাখার গুদাম। ডাকাত আর জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য নৌকার ধারগুলো অনেক উঁচু করে তৈরি করা হত। বেশ ভারি ছিল নৌকাগুলো তাতে সন্দেহ নেই। এটাই

ছিল সস্তা পরিবহণের একমাত্র মাধ্যম। লিঙ্কন যে শুধু ওই নৌকা চালাতেন তাই নয় এটা তৈরি করতেও হত তাঁকেই।

মিসিসিপির বিশাল জলরাশির উপর দিয়ে কাঠের গুঁড়ির ওই চ্যাপ্টাতল নৌকা বেয়ে চলায় ক্লান্তি ছিল না কিশোর লিঙ্কনের। এই কষ্টকর পথ পাড়ি দেয়া দুর্বল কোন মানুষের পক্ষে সত্যিই সম্ভব হত না। এক দস্যু মাইকের অত্যাচার এই পথে ছিল কিম্বদন্তীর মত। সে ছিল এক শয়তান। কিন্তু লিঙ্কন সব কিছু সামলাতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন বলে তাঁর মালিক জেন্টি ও নিশ্চিন্ত থাকতেন।

এক সময় যখন গাছে গাছে ফুল ফুটতো, জাগত নতুন সবুজ কচিপাতার রাশি, লিঙ্কন তখন নৌকা বোঝাই করে ফল, মাংস, সব্জী নিয়ে দিতেন দীর্ঘ পথে পাড়ি। বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য তখন মিসিসিপির দুই পারে। রাত্রিতে কোথাও নৌকা নোঙর করে চলত বিশ্রাম।

১৮১১ সাল থেকেই মিসিসিপির বুকে শুরু হয়েছিল অবশ্য বাষ্পীয় পোত চলাচল। কিন্তু সেগুলো ছিল ব্যয় সাপেক্ষ। যাই হোক লিঙ্কন মনে প্রাণে তার কাজ করে চলেছিলেন। সেই বিপদ সঙ্কুল যাত্রা পথে একদিন তাদের ঘুমোনোর অবসরে সাতজন নিগ্রো মালপত্র লুঠ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লিঙ্কনের নৌকা আক্রমণ করে। লিঙ্কন আর তার সঙ্গীরা প্রথমে হতচকিত হলেও হিকরি লাঠি হাতে রুখে দাঁড়ালেন। তার প্রচণ্ড আক্রমণে তিনজন আক্রমণকারী জলে ছিটকে পড়ল। প্রচণ্ড মারামারির মধ্যে এক গুণ্ডার ছুরির আঘাতে লিঙ্কনের কপাল কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীরা পালাতে পথ পেল না। লিঙ্কনের যে আঘাত লেগেছিল সেই চিহ্ন তিনি আজীবন বহন করেছেন।

এক একবার ওই নৌকা ভ্রমণে লিঙ্কনের সময় লেগে যেত কখনও কখনও দুমাসের মত। জলপথের ওই ডাকাতি গুণ্ডামি যারা করত তারা কেবল নিগ্রোই ছিল না, অনেক শ্বেতকায় আর রেড ইণ্ডিয়ানরাও এই দস্যুবৃত্তি করতে অভ্যস্ত ছিল। এই ঘটনা যেখানে ঘটেছিল তার পঁয়ত্রিশ বছর পরে লিঙ্কন যে ঘোষণাপত্রে সাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাতেই সমস্ত নিগ্রোরা দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে চিরকালের মত মুক্তি পায়।

নিউ অর্লিয়েন্স এক নতুন দিগন্তের দরজাই যেন খুলে ধরছে

চেয়েছিল ইণ্ডিয়ানার ওই কিশোরের সামনে। কত মানুষ, কত বিচিত্র পোশাক তাদের, কত পালতোলা জাহাজেরও সারি। লিঙ্কন আর সঙ্গীরা অবাক হয়ে সব চেয়ে দেখতেন। কত মানুষও সেখানে, স্পেনীয়, মেক্সিকান। সীমান্ত প্রদেশের পিজনক্রীকের দুই কিশোরের কাছে সে ছিল এক নতুন মোহময় জগত। মুগ্ধ বিস্ময়ে দুই তরুণ অবাক হয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সব উপভোগ করছিল সেদিন। সত্যিই তাদের চোখে সে এক আশ্চর্য বিচিত্র দুনিয়াই যেন।

নদীর বুকে নৌকায় ভেসে বেড়াতে নেশাগ্রস্ত যেন একসময় হয়ে পড়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। এক সময় মনে মনে তার বাসনাও জেগে ওঠে বিশাল কোন বাষ্পীয় পোতের সারেঙ হয়ে জীবন কাটাবেন। কিন্তু তাঁর এক শুভানুধ্যায়ী উইলিয়াম উডকে লিঙ্কন এ ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন করার পর উড বুঝিয়েছিলেন একুশ বছর বয়স না হলে সারেঙ হওয়া চলে না। লিঙ্কনের তাই আর ষ্টীমবোটের সারেঙ হওয়া হল না! হলে হয়তো আমেরিকার ইতিহাসের ধারাই বদলে যেত কে বলতে পারে।

এইভাবেই লিঙ্কনের জীবন কেটে চলেছিল। মিসিসিপির বুকে নৌকা চালনা করে অবসর সময়ে পড়াশোনার কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন লিঙ্কন। গতানুগতিকতাময় বাঁধা সে জীবন। ঠিক ওই সময়েই এক ঘটনা ঘটে গেল ইণ্ডিয়ানার ওই সীমান্ত প্রদেশে। আবার সীমান্ত এলাকা জুড়ে দেখা দিল সেই মিল্ক সিকনেস মহামারী। সময় ছিল ১৮৩০ সালের শীতকাল। মহামারীর ওই আক্রমণে সেবারও বহু লোক আর পশু মারা পড়ল। এবার সত্যিই ভয় পেলেন টমাস লিঙ্কন। তিনি মনস্থির করলেন ইণ্ডিয়ানা ছেড়ে এবার চলে যাবেন ইলিনয়ের উর্বর কালো মাটির প্রান্তরের দিকে সকলকে নিয়ে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

ইলিনয়ের দাস ব্যবসা ও লিঙ্কন

১৮৩০ সালে টমাস লিঙ্কন ইণ্ডিয়ানার সীমান্তে সেই অরণ্য অঞ্চলের বসবাস তুলে দিয়ে রওয়ানা হলেন সপরিবারে ইলিনয়ের দিকে। ষাঁড়ে টানা বিরাট এক ওয়াগনে মালপত্র বোঝাই করে দীর্ঘপথে শুরু হল একদিন তাদের যাত্রা। যা কিছু সম্পত্তি শুকর, ভেড়া আর শস্য সব কিছুই টমাস লিঙ্কন বিক্রি করে দিলেন মাত্র আশি ডলারে। আবার সেই নিরুদ্দেশ যাত্রাই যেন শুরু হল লিঙ্কন পরিবারের। যে ইলিনয়ের উদ্দেশ্যে তাদের যাত্রা সে জায়গা নাকি রেড ইণ্ডিয়ানদের মতে খুবই উর্বর। চারদিকে যার বিস্তৃত ছিল বিশাল প্রেইরী ঘাসের গালিচা।

প্রতিবেশী আর বন্ধুদের কাছে বিদায় লগ্ন এসে গেল। বিদায় নিলেন টমাস লিঙ্কন। এবার তার লক্ষ্য ওয়ারাশ নদীর অন্য পারে 'কানান' এর জমি, যেখানে নাকি অবিচ্ছিন্ন সুখেরই রাজত্ব। কর্কশ আওয়াজ তুলে যাত্রা আরম্ভ করল মন্থরগতি সেই যান। চালকের আসনে তরুণ আব্রাহাম লিঙ্কন। ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি। সঙ্গে ছিল টমাস লিঙ্কন, সারা বুশ জনস্টন, সারার ছেলেমেয়েরা তো বটেই। বিরক্তিকর একঘেয়ে যাত্রাপথে কিছুই ছিল না। মাঝপথে ভেলায় পার হতে হল নদী। প্রথম লক্ষ্য এবার ইণ্ডিয়ানার শহর ভিনসেনস্।

কষ্টকর যাত্রাপথ এক সময় শেষ হল। ১৮৩০ সালে মার্চ মাসের গোড়ায় একদিন লিঙ্কন পরিবার এসে পৌঁছলেন স্যাংগামন নদীর উত্তর দিকের বনভূমি আর বিস্তীর্ণ তুন্দ্রা প্রান্তরের মাঝখানে এক উঁচু জমিতে। জায়গাটা ডিকেটুরের দশ মাইল পশ্চিমে। আস্তানা খাটানোর ব্যবস্থা হল ওখানেই। একুশ বছরের লিঙ্কন উৎসাহে কাঠ কেটে চললেন আস্তানা বানাবার জন্য, এ কাজে তার সমকক্ষ কেউই ছিল না। কুড়ুল দিয়ে কাঠ খণ্ড খণ্ড করতে লাগলেন লিঙ্কন। তৈরি হয়ে গেল কাঠের কেবিন। ওই আস্তানাতেই লিঙ্কন পরিবারের

তেরোজন মানুষ ১৮৩০ সালের বসন্ত, গ্রীষ্ম আর শরৎকাল কাটিয়ে ছিলেন। ১৮৩০-৩১ সালের অস্বাভাবিক শীতের দিনগুলোও তাই।

শুধু কেবিন বানানোই নয়, জীবন ধারণের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করাও লক্ষ্য ছিল তরুণ লিঙ্কনের। লিঙ্কনের সারাদিনের কাজ ছিল কাঠ চেরাই করা, ঝোপঝাড় জঙ্গল কেটে সাফ করা, আগাছা পরিষ্কার, কয়েক একর জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা, বীজ বোনা, এমনই হাজার কাজ। আর একটা কাজ ছিল লিঙ্কনের, কাঠের খুঁটি পুঁতে জমি ঘিরে নেয়া। লিঙ্কনের হাতের স্পর্শই যেন উর্বর ওই জমিতে ক্রমে গজিয়ে উঠল সতেজ ভুট্টার চারা।

এত কষ্টের পরেও এরপর এল এক ভয়ানক দুঃখের দিন। ডিকেটুরের কাছাকাছি ওই এলাকায় সেবার শীতকালে পড়েছিল দুঃসহ শীত। ১৮৩০ সালের বড়দিনের সময় শুরু হয়েছিল তুষার পাত। প্রচণ্ড বাতাস আর চোখ ধাঁধানো তুষার পড়ে সমস্ত প্রান্তর এ: াকা চাপা পড়ে গেল। এমন প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ওই এলাকায় আগে কেউ দেখেনি, প্রায় পনেরো ফুট উঁচু প্রেইরী ঘাসের প্রান্তরও বরফের নিচে চাপা পড়ে গেল। নিজেদের আস্তানার কাছাকাছি এসেও তুষার ঝড়ে পথ হারিয়ে মৃত্যুবরণ করল অসংখ্য মানুষ। মারা গেল গরু, ভেড়া, শুয়োর, হরিণ আর নানা গবাদি পশু। সমস্ত ইলিনয় সীমান্ত জুড়েই চলল 'সাদাশত্রু'র তীব্র আক্রমণ।

ভয়ানক ওই শীতের আক্রমণে কাজের শ্রমিক দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকের অভাব পূর্ণ করলেন লিঙ্কনই। কায়িক পরিশ্রমে তার কণামাত্র ক্লান্তি ছিল না। ওই কল্পনাতীত শীতের মাঝখানেও লিঙ্কন মুগুর পিটিয়ে জমি সমান করার কাজ করলেন। তৈরি করলেন কাঠের হাজার হাজার খুঁটি। এর সবই সামান্য এক জোড়া জীনের তৈরি প্যান্টের জন্য।

শীতের আক্রমণে ইলিনয় এলাকা হয়ে উঠেছিল সে সময় যেন সাদা প্রান্তর। শুধু বরফ আর বরফ। হিমাঙ্কের বারো ডিগ্রী নিচে নেমে গেল তখনকার তাপমাত্রা। কত পশু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। লিঙ্কন পরিবারের সকলে সামান্য ভুট্টার খাবার খেয়েই পুরো ওই শীতকাল জীবনধারণ করেছিল। দীর্ঘ নটা সপ্তাহ তাদের ওই দুঃসহ অবস্থায় কাটাতে হয়। বাইরের পৃথিবী তখন যেন

জীবনশূর্ণ মৃত এক তুনিয়া।

এই সময় এক তুর্ঘটনাতে পড়ে গেলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় স্যাংগামন নদীর বুকে নৌকা চালাতে গিয়ে জলে পড়ে গেলেন তিনি। কোন রকমে প্রাণপন চেষ্টায় তিনি কাছাকাছি মেজর ওয়ারনিকের বাড়িতে পৌছেছিলেন লিঙ্কন প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায়। প্রায় একমাস হাঁটাচলা করার শক্তি ছিল না তরুণ লিঙ্কনের। মেজর ওয়ারনিকের বাড়িতে নানা গল্প বলে, আবৃত্তি করে বই পড়ে খুবই আনন্দ দিতেন তাদের লিঙ্কন। তার প্রধান শ্রোতা ছিল মেজরের কিশোরী কন্যা।

মেজর ওয়ারনিকের বাড়িতে থাকার সময় লিংকন একদিন তার কাছে তার কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু মেজর ওয়ারনিক সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ লিংকনের কিছু তো ছিল না, এককথায়. সে চালচুলো বিহীন একজন মানুষ। মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলেন তরুণ লিংকন। আঘাতটা তার খুবই বেজেছিল হৃদয়ে। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তরুণ লিংকন।

এরপর আরও নানা কাজে নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছিলেন লিঙ্কন। তার মধ্যে ছিল কসাইখানায় শুয়োর মারার কাজ। তাছাড়া জঙ্গলে গাছ কেটে নদীতে ভাসিয়ে কারখানায় পৌছে দেবার কাজও করেছিলেন লিঙ্কন। মিসিসিপির বুকে চ্যাপটা নৌকোয় মালপত্র চাপিয়ে এইভাবে ঘুরেও বেড়াতেন লিঙ্কন।

এই সময়ে লিঙ্কনের জীবনে ঘটে গেল এক অভুতপূর্ব ঘটনা। যে ঘটনা তাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে বিচলিত করেছিল। সেই ঘটনা হল লিঙ্কনের নিজের চোখে দেখা নিগ্রো ক্রীতদাস বিক্রি। এ ঘটনার উৎস ছিল নিউ আলিয়েন্সের দাস বেচাকেনার এক হাট। সেখানে মনুষ্যত্বের চরমতম অবমাননা প্রত্যক্ষ করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন।

দাস বেচাকেনা আমেরিকার দক্ষিণীরাজ্যগুলোয় পাপের মতই প্রকট হয়ে উঠেছিল সে সময়। দাসত্ব আর মানুষ কেনার যে রোমহর্ষক দৃশ্য চোখে পড়ে লিঙ্কনের তা তাঁকে বেদনায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল সে দিন। যে বর্বরতা মানুষ মানুষকে এই ভাবে লাঞ্ছনা করে সেকথা লিঙ্কন জানলেও কোন কালে প্রত্যক্ষ করেন নি আগে। আজ তার চোখ

খুলে গেল। লিঙ্কন দাস কেনা বেচার যে হাটে উপস্থিত হন সেদিন সেখানে এক সুন্দরী নিগ্রো সংকর যুবতীকে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। ক্রেতারা গরু ছাগল কেনার মতই সেই হতভাগিনী যুবতীর নানা গোপন অঙ্গ যাচাই করে দেখছিল।

এই চরম অবমাননাকর দৃশ্যে সেদিন শিহরিত হয়ে উঠেছিল লিঙ্কনের মন। এক অপরিমিত ঘৃণায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায় সেদিন, মন হয়ে যায় ক্ষতবিক্ষত। সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেদিন তরুণ লিঙ্কনের সমব্যথী হৃদয়ও। মানবাত্মার এই কলঙ্কময় অপমান ছিল কল্পনাতীত লিঙ্কনের কাছে।

যাদের সঙ্গে কদর্য ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদের লিঙ্কন বলেছিলেন 'এ জায়গা ছেড়ে চলো—এ নরক।' কোন দিন যদি সুযোগ পাই এই জঘন্য ব্যবস্থাব উপর আমি কঠোরতম আঘাত হানবো—।'

নিঃশব্দে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে সেদিন ক্রীতদাস বিক্রীর বাজার থেকে বিদায় নেন লিঙ্কন। এর বেশ কয়েক বছর পর জঘন্য দাস কেনাবেচার উপর প্রকাশ্যে তার মতামত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করেছিলেন লিঙ্কন। একদিনের জন্যও হতভাগ্যদের কথা ভোলেননি মহান লিঙ্কন। তার হৃদয় অনবরত উদ্বেগ হতে চাইত হতভাগ্য ক্রীতদাসদের কথা ভেবে। ভবিষ্যতে একদিন তিনি দৃঢ় হাতে এই কলঙ্কময় ব্যবস্থাকে নির্মমতার মধ্য দিয়েই উচ্ছেদ করেছিলেন। হয়তো তার জন্য দামও দিতে হয় অনেক বেশি। আমেরিকায় এই দাস ব্যবসা ছিল অত্যন্ত স্বার্থপরতার কাজ, লিঙ্কন ধীরে ধীরে তাই এগিয়ে ছিলেন তাকে নির্মূল করে দিতে। সেদিনের ক্রীতদাস বিক্রির বাজারের দৃশ্যই তাকে ওই কাজে উদ্বুদ্ধ করে সেকথা বলাই বাহুল্য। হয়তো লিঙ্কন নিজেও সেদিন কল্পনা করতে পারেন নি তাঁর হাত দিয়েই ভবিষ্যতে একদিন ওই অত্যাচারিত হতভাগ্যরা দাসত্বের বন্ধন মুক্ত হয়ে মানুষ বলে গণ্য হবে। আমেরিকার বুক থেকে চিরকালের জন্য মুছে যাবে ওই কলঙ্কিত অধ্যায়।

দাস বেচাকেনার ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এবার কাজের খোঁজ করতে শুরু করলেন লিঙ্কন, নির্দিষ্ট কোন কাজই তার প্রয়োজন ছিল। শিগ্‌গির সেই সুযোগও এসে পড়ল। ডেন্টন অফফুট নামে একজন দাম্ভিক উচ্চাভিলাসী ব্যবসায়ী লিঙ্কন আর ডেনিস হ্যাঙ্কসকে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক হলেন। ১৮৩১

সালের ১লা মার্চ লিঙ্কন লোকটির সঙ্গে দেখাও করলেন। বিরাট এক ডোঙ্গায় চড়ে লিঙ্কন আর তুজন সঙ্গী স্যাংগামন নদীর বুকে ভেসে পড়লেন। এই ভাবেই তিনি সর্বপ্রথম স্যাংগামন কাউন্টিতে পদার্পণ করেন।

স্প্রিংফিল্ড এলাকায় সেই লোকটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল লিঙ্কনের। লোকটি ছিল প্রচণ্ড রকম সুরাসক্ত। লিঙ্কনের সঙ্গে তার চুক্তি হল লিঙ্কনকেই বিশাল কোন তলাচ্যাপ্টা নৌকা বানিয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য তিনি পাবেন মাসে বারো ডলার। তাতেই রাজি হয়ে গেলেন লিঙ্কন। শুরু হল তার নতুন কাজ আর অমানুষিক পরিশ্রমের কাল। তবুও ভেঙে পড়েন নি তিনি।

নিউ অর্লিয়েন্সে যে লোকের কাছে কাজ করতেন লিঙ্কন সে ক্রমে ক্রমে লিঙ্কনকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছিল। লিঙ্কনের গুণগুলি তার নজর এড়ায়নি। কথা বলা, গল্প করা, আবৃত্তি করা, তাছাড়া মজা সৃষ্টিতেও লিঙ্কনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যেত। তাছাড়া ছিল তার সততা, কাজের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা। এই সব গুণের জন্য লিঙ্কন অল্পদিনের মধ্যেই নিউ অর্লিয়েন্সের সকলের কাছে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। স্থানীয় যুবকদের প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিলেন তরুণ লিঙ্কন তার সহজাত ভালবাসা আর মুগ্ধ করার ক্ষমতা দিয়ে। এমন অবস্থায় সবাই তাকেই তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিল।

লিঙ্কন যে ডেণ্টন অফফুটের দোকানে কাজ করতেন তারই কাছে ছিল এক শুঁড়িখানা। ওই শুঁড়িখানা ছিল নিউ অর্লিয়েন্সের কিছু দূরে নিউ সালেম নামে এক গ্রামে। দোকানটিও নিউ সালেমেই। সেখানকার লোকসংখ্যা একশর বেশি ছিল না। এখানে দোকানে কাজ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন লিঙ্কন।

নিউ সালেমের শুঁড়িখানায় সবসময়েই চলত গুণ্ডা বদলোকের আড্ডা। তাদের কাজই ছিল সবসময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা। ওই শুঁড়িখানার মালিক ছিল ক্ল্যারি নামে একজন। ডেণ্টন অফফুট তার কর্মচারি লিঙ্কন সম্পর্কে খুবই আশাবাদী ছিলেন। তিনি জানতেন লিঙ্কনের শারীরিক ক্ষমতা প্রচুর। তিনি তাই রটনা করে দিলেন কেউ লিঙ্কনকে মল্লযুদ্ধে হারাতে পারলে পাঁচ ডলার বাজি রাখবেন।

নিউ সালেমে ওই সময় জ্যাক আর্মস্ট্রং নামে এক যুবক ছিল। সে

ছিল ওই এলাকার অবিসম্বাদিত নেতা। মল্লযুদ্ধে তার সমান প্রায় কেউই ছিলনা। জ্যাক আর্মস্ট্রং তাই একদিন লিঙ্কনকেই মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানাল। এই লড়াই নিয়ে বাজি ধরারও হিড়িক পড়ে গেল সেদিন।

এক শনিবার অনুষ্ঠিত হল মল্লযুদ্ধ। আব্রাহাম লিঙ্কনের পরবর্তী জীবনে এই বিখ্যাত মল্লযুদ্ধ সুদূর প্রসারী কোন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কারণ হয়ে ওঠে।

লড়াই দেখার জন্য প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিল। সকলেই লড়াইয়ের জন্য উদগ্রীব। লিঙ্কন আর আর্মস্ট্রং কোমর পর্যন্ত খালি দেহে সতর্কভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে সুযোগ খুঁজতে শুরু করলেন। লিঙ্কন দীর্ঘকায়, কিন্তু জ্যাকের দেহ সুগঠিত ও এক বুনো ষাড়ের মতই শক্তিশালী। লিঙ্কনের সবচেয়ে সহায় ছিল তার আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু দুটি। তবুও লিঙ্কন জানতেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচণ্ড শক্তিমান।

এই মল্লযুদ্ধের কাহিনীতে শোনা যায় এক সময় প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর লিঙ্কন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হন। জ্যাক আর্মস্ট্রং পরাজিত হতেই শুঁড়িখানার বাকি লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল লিঙ্কনের উপর। লিঙ্কন চিৎকার করে বলে উঠলেন : সাহস থাকে একজন করে লড়াই করতে এসো।' ঠিক ওই মুহূর্তে জ্যাক আর্মস্ট্রং প্রকৃত খেলোয়াড়ের মতই লাফিয়ে উঠে ওর সাকরেদদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লিঙ্কনের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করল। ওই দিন থেকে জ্যাক ও তার স্ত্রী হানা সারাজীবন লিঙ্কনের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে ওঠে আর লিঙ্কনের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতাও করে যায়। প্রতিদানে লিঙ্কন তাদের নানাভাবে সাহায্য করে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর থেকেই লিঙ্কন ওই অঞ্চলের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন। সারা নিউ অর্লিয়েন্সেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। লিঙ্কন ভালমতই প্রমাণ করেছিলেন আশেপাশের সকলের চেয়ে তিনি ভাল দৌড়তে পারেন, লাফাতে পারেন, ভারি মুগুর তুলে কাজ করায় তার সমকক্ষ কেউ নেই। তরুণ লিঙ্কনের আরও গুণ ছিল তিনি মদ খেতেন না, শক্তি নিয়ে গর্ব করতেন না। মানুষের প্রতি তার মমতাও ছিল অসীম।

একটু একটু করে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে গেলেন লিঙ্কন। স্থানীয় যেকোন কাজেই তিনি না হলে কাজ হত না। ঘোড়দৌড়, মুরগীর লড়াই যেকোন কিছুই হোক লিঙ্কনকে সকলে এক বাক্যে বিচারক নিয়োগ করতে চাইত।

শুধু এই ধরণের কাজেই নয় লিঙ্কনের বিচিত্র প্রতিভার বিকাশ অন্য পথেও প্রকট হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। সাহিত্য, বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়ে যে লিঙ্কন খুবই দক্ষ সেটাও প্রমাণিত হতে দেরি হল না। স্থানীয় এক সাহিত্য বিষয়ক সভায় লিঙ্কনকে চমৎকার ভূমিকায় দেখা গেল। নিজের লেখা কবিতা আর রচনা পাঠ করে সকলকে আশ্চর্য করে দিলেন তিনি। প্রতিসপ্তাহ শেষে রুটলেজ ট্যাভার্নের ডাইনিং কামরায় সাহিত্যসভার বিশেষ আয়োজন করা হত। সেখানেই লিঙ্কন তার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তুলতেন। একদিন তিনি স্যাংগামন নদীর বুকে নৌ চলাচলের যোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোরালো বক্তব্য রাখলেন। লিঙ্কনের ওই বাগ্মীতার কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভবিষ্যত জীবনে এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল লিঙ্কনকে।

নিজের সুপ্ত ক্ষমতার বিষয় এইসব বক্তৃতা আর সাহিত্য সভার মাধ্যমে লিঙ্কন টের পেয়েছিলেন। লোকের মন জয় করার যে বিশেষ ক্ষমতা নিজের মধ্যে আছে বুঝতে দেরি হয়নি লিঙ্কনের। তার শুভানুধ্যায়ীরাও তা টের পেয়েছিলেন। এখন কেবল প্রয়োজন ছিল তাকে মেজে ঘসে তৈরি করে নেওয়া। দারুণ আত্মবিশ্বাসও জেগে উঠল আব্রাহাম লিঙ্কনের মধ্যে।

নিউ সালেমে থাকার সময় সাতমাসের জীবনে লিঙ্কনের হিতৈষীও বন্ধুদের সংখ্যা আশাতীত রকম হয়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে দুজন লিঙ্কনের সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করতে পেরেছিলেন। এই দুজন মানুষের একজন হলেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মেণ্টার গ্রাহাম। আর অন্যজন জ্যাক কেলসো।

মেণ্টার গ্রাহামই লিঙ্কনের সুপ্ত ক্ষমতাকে বাইরে প্রকাশ করার সম্ভাব্য সবরকম পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিলেন এই সময়। স্কুল শিক্ষক গ্রাহাম লিঙ্কনের মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে সেকথা টের পেতে তাঁর দেরি হয়নি। তিনি অত্যন্ত যত্ন আর আনন্দের সঙ্গে ইংরাজী গ্রামার আর অঙ্ক শেখাতে শুরু করেন। মেণ্টার গ্রাহামের

চেষ্টায় লিঙ্কন সহজেই অনেক তথ্য শিখে ফেলেছিলেন।

মেণ্টার গ্রাহাম যেমন লিঙ্কনকে জীবনের প্রয়োজনীয় দিকটাকে উন্নত করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই রকমই আবার অন্য দিকটি উজ্জ্বল করে তোলেন জ্যাক কেলসো। অথচ ওই জ্যাক কেলসোকেই সকলে জানতো তিনি একজন ঘরকুনো মানুষ, একেবারে অকর্মা পুরুষ। তার কাজ ছিল মাছ ধরা আর বেহালা বাজানো। তিনি সাধারণ সমস্ত কাজের চেয়ে আবৃত্তি আর সাহিত্য চর্চা ঢের ভাল কাজ বলেই ভাবতেন। বেচারি শ্রীমতী কেলসোকেই সংসারের ভার বহন কবতে হত। ঘরভাড়া দিয়ে আর নানা কাজ করে তিনি সংসার চালাতেন। এই জ্যাক কেলসোর দৌলতেই ইংরাজী সাহিত্যের নানা দিক খুলে গিয়েছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের সামনে। জ্যাক কেলসোর শেকস্‌পীয়ার ও রবার্ট বার্নসের কবিতার উপর অগাধ দখল ছিল। তিনিই পরবর্তী জীবনের দিনগুলোয় লিঙ্কনকে শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করে তোলেন। কেলসো তাই নানাভাবে লিঙ্কনকে শেকস্‌পীয়ার আর বার্নসের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে সক্ষম হন। লিঙ্কন এই কারণেই সারা জীবন শেকস্‌পীয়ার আর বার্নসের কাব্য এবং নাটকের অনুরাগী ছিলেন।

জ্যাক কেলসোর কাছে অনুপ্রাণিত হয়ে আব্রাহাম লিঙ্কন তখনই প্রথম জানতে পারলেন শেকস্‌পীয়ার বা রবার্ট বার্নসের দুজনের কারো পক্ষেই স্কুলের গণ্ডী পেরোনো সম্ভবপর হয়নি। অশিক্ষিত টমাস লিঙ্কনের ছেলে হলেও সেই সময় লিঙ্কনের মনে আশার সঞ্চার হয় যেভাবেই হোক স্থির প্রত্যয়ী হয়ে সত্যিকার শিক্ষায় মার্জিত সম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে, আর চেষ্টার ফলেই তা সম্ভব। মনে মনে ওই সময়ে স্থির সংকল্পে অটল হতে চেয়েছিলেন লিঙ্কন যেভাবেই হোক শুধু কায়িক পরিশ্রমের বদলে তাকে শিক্ষায় দীক্ষায় বড় হতে হবে। তার সামনে আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন উইলিয়াম শেকসপীয়ার আর রবার্ট বার্নস। এই ভাবেই একদিন ভবিষ্যতে লিঙ্কনের পক্ষে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করার দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। নিউ সালেমে আগমন তাই লিঙ্কনের জীবনে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছিল।

এইভাবেই একসময় মেণ্টার গ্রাহাম উদ্যোগ নিয়ে এক বিরাট সভার আয়োজন করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল জনসভায় লিঙ্কনের বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা করা। যথারীতি লিঙ্কন সেই সভায়

জ্বালাময়ী আর আন্তরিক বক্তৃতা দিলেন। তার বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত বাস্তব আর আন্তরিকতাপূর্ণ। বক্তৃতার মাঝখানে এটাই প্রকাশ হল আব্রাহাম লিঙ্কন রাজ্য বিধান মণ্ডলীর আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩২ সালের ৯ই মার্চ। লিঙ্কন অত্যন্ত আত্মনির্ভরতার সঙ্গে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কথা জানালেন। এই রাজনৈতিক বক্তৃতায় লিঙ্কন সুচিন্তিত মতামতও ব্যক্ত করেছিলেন। লিঙ্কনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হল অতি জনপ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাণ্ড্ জ্যাকসনের বিরুদ্ধে। লিঙ্কন তার বক্তৃতায় দেনার উপর সুদের হার কমিয়ে আনা, (যেহেতু অধিকাংশ শ্রোতারাই ঋণে আবদ্ধ ছিলেন), লেখাপড়া শেখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা (তখন স্কুল প্রায় ছিলই না), যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্যাংগামন নদীর ধারাকে সোজাপথে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা, ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় সমস্যার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্যাংগামন নদীর আঁকাবাঁকা অংশকে ঠিক মত কাটতে পারলে মালবাহী জাহাজ ২৫—৩০ টন মাল নিয়ে ভিতরে আসতে পারে। এই কাটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে পারলে জলধারা সোজাপথে আসতে পারবে।

লিঙ্কন তার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম বক্তৃতার শেষে বলেছিলেন নিচের এই অনুচ্ছেদটি। এটি এতই চমৎকার হৃদয়গ্রাহী ছিল যে ভোটারদের অধিকাংশই তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। লিঙ্কন উপসংহারে বলেছিলেন : "আমার জন্ম খুবই গরীবের ঘরে আর চিরকালই আমি খুবই নিম্নমানে জীবন কাটিয়েছি···আমার সদাশয় সহ-অধিবাসীরা যদি আমাকে পিছনে ফেলে রাখাই উচিত মনে করেন আমি কিছুই মনে করব না, দুঃখিতও হব না, কারণ দুঃখ আর নৈরাশ্যের সঙ্গে আমার খুবই পরিচয় আছে। জন্ম নেবার পর থেকেই আমি শুধু কাজ করেছি মানুষের কল্যাণের জন্যই। তাই আপনাদের মত সৎদেশপ্রেমী মহৎ হৃদয় মানুষই আমার পিছনে দাঁড়াতে পারেন। আপনাদের বন্ধু ও সহনাগরিক—এ. লিঙ্কন।"

নির্বাচনী প্রচার চলার সময়েই বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটে গেল নিউ সালেমে। এই ঘটনা ভয় আর উত্তেজনার জন্ম দিয়েছিল। এর

কারণ আচমকা খবর পাওয়া যায় 'ব্ল্যাক হক' নামে দুর্ধর্ষ এক রেড ইণ্ডিয়ান, স্যাক ও ফক্স জাতির শ্রদ্ধাভাজন অধিনায়ক তার দলবল নিয়ে প্রায় চারশ সৈন্য সহ রকবিভারের দিকে ছুটে আসছে। ব্ল্যাক হকের সৈন্যরা নির্মম অত্যাচারে অভ্যস্ত ছিল, ঘববাড়ি জ্বালিয়ে, হত্যা করে সে শ্বেতকায়দের উচ্ছেদ করতে চায়। সে ছিল কুখ্যাত রেড ইণ্ডিয়ান সর্দার।

ব্ল্যাক হকের আগমন সংবাদ পেয়ে সাবা নিউ সালেম এলাকা জুড়ে ত্রাসের সঞ্চার হল। এই আতঙ্ক প্রশমনের জন্য গবর্ণর বেনল্ডস এক সেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের আবেদন জানালেন। সর্বসাধারণ ও স্বয়ং গভর্ণরের অনুরোধে আব্রাহাম লিঙ্কনই হলেন ওই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর নেতা। সেই শুঁড়িখানার ছেলেরা স্বভাবতই এগিয়ে এল লিঙ্কনের অধীনে কাজ করতে। জ্যাক আর্মস্ট্রং হল লিঙ্কনেব প্রধান সহকারী।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য লিঙ্কনের স্বেচ্ছাসেবকদেব সঙ্গে ব্ল্যাক হকের দলের কোন সংঘর্ষ হয়নি। লড়াই করার জন্য লিঙ্কন অবশ্য তৈরিই ছিলেন। ব্ল্যাক হক পরে সরকারী সেনাদলের হাতে বন্দী হয়।

ব্ল্যাক হক উত্তেজনা কমে আসার পরেই আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়ে যায় নির্বাচনী প্রচার। লিঙ্কন নতুন করে আবাব শুরু করলেন সভায় সভায় বক্তৃতা। গ্রামের চাষীদের সামনে হাজির হলেন তিনি। ফসল তোলার মাঝখানে আবেদন প্রচাব পুরোদমে চালালেন লিঙ্কন। তার দেহে থাকত শণের কাপড়ে বানানো প্যাণ্ট, জিনের তৈরী কোট আর মাথায় ঘাসের টুপি।

নানা বক্তৃতায় লিঙ্কন বলতে লাগলেন. 'বন্ধু, নাগরিকগণ, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমি কে। আমি দীন আব্রাহাম লিঙ্কন। আমার শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধেই আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। আমি যা চাই তাহল, একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক, আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, মানুষের জীবন-ধারণের সুযোগসুবিধা ও শিক্ষার ব্যবস্থা। এটাই আমার মনোবাসনা আর রাজনীতির মূলতত্ত্ব। আমি যদি নির্বাচিত হই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব—যদি না হই তাতেও ক্ষতি নেই।'

নির্বাচনে কিন্তু লিঙ্কন পরাজিত হলেন। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে জীবনে এটাই একমাত্র পরাজয় লিঙ্কনের। তবে নিজের গণ্ডীর মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন—

পক্ষে ২৭৭, বিপক্ষে ৭। এই সময় নিউ সালেমে তিনি সর্বজনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এর আগেই তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই নির্বাচনের তুবছর পর লিঙ্কন নির্বাচনে জয়ী হন। তারপর ১৮৩৬, ১৮৩৮, ১৮৪০ সালেও হন পুনর্নির্বাচিত।

এইভাবেই রাজনীতির মঞ্চে হাতেখড়ি হয়েছিল লিঙ্কনের।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

প্রেমিক পুরুষ লিঙ্কন ও তাঁর বিভিন্ন কাজ

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছিলেন লিঙ্কন। রাজনীতির অঙ্গনে সেই তার প্রথম প্রবেশ। ঠিক ওই মুহূর্তে তার জীবনে এক নতুন দিগন্তেরই সূচনা হল।

নিউ সালেম আর রুটলেজ টেভার্ণের প্রতিষ্ঠাতা আর মালিক ছিলেন জেমস রুটলেজ নামে একজন ভদ্রমানুষ। রুটলেজ টেভার্ণ আসলে এক সরাইখানা। জেমস রুটলেজের ছিল উনিশ বছর বয়সের এক নীলনয়না কিশোরী কন্যা। মেয়েটির নাম অ্যান রুটলেজ। সত্যিকার সুন্দরী ছিল অ্যান। মাথার চুল তার সোনালী কোঁকড়ানো।

লিঙ্কন অ্যান রুটলেজকে প্রায় প্রথম দর্শন থেকেই মনে মনে ভাল বাসতে আরম্ভ করেছিলেন। অবশ্য লিঙ্কন ভালই জানতেন অ্যানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই স্থানীয় এক পয়সাওয়ালা যুবক ম্যাকনীলের বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়েছিল। ম্যাকনীলের আসল নাম ছিল ম্যাকনামারা। লিঙ্কন এও জানতেন অ্যান সুপুরুষ ম্যাকনামারাকেই বিয়ে করতে ইচ্ছুক। অ্যানের পড়াশোনার কাজ শেষ হলেই ওই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।

ইতিমধ্যে ঘটনার গতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল। ম্যাকনীল ইতিমধ্যে তার স্থানীয় ব্যবসাপত্র বিক্রি করে দিল আর নিউ ইয়র্কে রওয়ানা হল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করবে বলে। সে অ্যানকে

জানিয়ে গিয়েছিল যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। সে ফিরে এসেই অ্যানকে বিয়ে করবে। অ্যান ম্যাকনীলের কথা অবিশ্বাস করতে পারেনি। ম্যাকনীল চিঠি লিখবে বলে জানিয়েও গিয়েছিল। অ্যান শুধু চোখের জলে বিদায় জানিয়েছিল তাকে।

এরপর সময় কেটে যায় প্রাকৃতিক নিয়মেই। ম্যাকনীল আর ফিরে আসেনি নিউ সালেম গ্রামে, অত্যন্ত দুঃখের কথা সে শপথ করে গেলেও কোন চিঠি লেখেনি তার প্রেমিকা অ্যানকে। দেখতে দেখতে দীর্ঘ তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অ্যান আর লিঙ্কন এই সময় যদি ভেবে থাকে যে ম্যাকনীল অ্যানকে বিয়ে করার ব্যাপারে মত বদল করেছে তাহলে তাদের দোষ দেখা যায় না।

এই সময় লিঙ্কন নিউ সালেমের ডাকঘরে পোস্ট মাষ্টারের কাজ পেয়েছিলেন। সপ্তাহে দুবারের মত ঘোড়ার গাড়িতে ডাকের চিঠিপত্র আসতো। ম্যাকনীলের কোন চিঠি এসেছে কিনা সেকথা জানার জন্য অ্যানও আসতো তখন ওই ডাকঘরে। এইভাবে সময় কেটে চলার ফাঁকে এক চিঠিতে ম্যাকনীল পরিষ্কার জানিয়ে ছিলো সে আর নিউ সালেমে ফিরে আসছে না। অ্যান দুঃখে ভেঙে পড়ল ওই চিঠি পেয়ে।

লিঙ্কনও দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন অ্যানের দুঃখে। তিনি তাই সমব্যথী হয়ে অ্যানকে দুঃখে সান্ত্বনা জানাতে চেয়েছিলেন। অ্যানকে দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন ভাবে চেষ্টা শুরু করলেন লিঙ্কন। অ্যানের ভগ্ন হৃদয়ে প্রেমের প্রলেপ বুলিয়ে এবার কাজই হাতে নিয়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। রুটলেজ টেভার্নের কাছাকাছি তাকে প্রায়ই কবিতা আবৃত্তি করে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল সে সময়। প্রেমিক লিঙ্কন সারাদিন তার প্রেমিকা অ্যানকেই খুঁজে বেড়াতেন। তার ওই সময়ের ভালবাসা ছিল একান্ত হৃদয়ের জিনিস।

এই সময় স্থানীয় সূচীশিল্পের খুবই কদর ছিল। এ ছিল মহিলাদের পরিচালিত সূচীশিল্প। নানা ধরণের হাতের কাজের এইরকম কোন এক প্রতিষ্ঠানে অ্যান রুটলেজ জড়িত ছিল। অ্যানের হাতের কাজও ছিল ভারি চমৎকার। খুবই নাম কিনেছিল অ্যান সূচী শিল্পে।

ধীরে ধীরে অ্যান একদিন ম্যাকনীলের বিশ্বাসঘাতকতা বিস্মৃত হতে পারল। ওর হৃদয়ে আস্তে আস্তে জায়গা করে নিয়েছিলেন তরুণ লিঙ্কন তার প্রেমময় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। লিঙ্কন বুঝলেন একদিন

অ্যানও তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। অ্যানের লজ্জারুণ মুখ দেখেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন লিঙ্কন।

বেশ কিছুদিন পরপর নানান কাজের ফাঁকে লিঙ্কন ওই সীবন শিল্প প্রতিষ্ঠানে না ছুটে গিয়ে পারতেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল দয়িতা অ্যানকে চোখের দেখা। অ্যানও যেন অপেক্ষায় থাকতেন ওই ক্ষণটুকুর জন্য। নিউ সালেমের অনেকেই জানতেন তুই তরুণ তরুণীর ওই ভালবাসার কথা। দীর্ঘকাল পর আব্রাহাম লিঙ্কন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর একদিন ওই প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধা পরিচালিকা সকলকে ,লিঙ্কন আর অ্যানের সেই প্রেমকাহিনী শোনাতে চাইত। বিচিত্র ছিল সেদিনের মিষ্টি মধুর সেই প্রেমকাহিনী দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনেও তা মলিন হয়নি।

অ্যানের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসায় মশগুল হয়েও লিঙ্কন তার কাজকর্মে অবহেলা করেননি। একথাও ঠিক নিউ সালেমে থাকার সময় লিঙ্কনের আর্থিক অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি, কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি অনেক কিছুই সঞ্চয় করেছিলেন। গ্রামার, অঙ্ক, জরিপের মূল পদ্ধতি আর আইনের মুলতত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেন।

মনে হয় আব্রাহাম লিঙ্কন উত্তর জীবনে যে মহৎ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যান কেবল তার প্রস্তুতির জন্যই যেন কোন ইন্দ্রজালে তৈরি হয়ে যায় ওই নিউ সালেম গ্রামটি। আরও আশ্চর্য হওয়ার কথা লিঙ্কন নিউ সালেম ছেড়ে আসার পর তু বছরের মধ্যেই ভূতুড়ে শহরে পরিণত হয়ে যায় গ্রামটি। হয়তো এটাই ছিল ভবিতব্য। নিউ সালেমের মেণ্টার গ্রাহাম, জ্যাক কেলসো, এই সব চরিত্র একদিন লিঙ্কনকে সত্যিকার যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন। লিঙ্কনের জীবনের উন্নতিতে এই সব চরিত্র অসাধারণ ভূমিকাই পালন করেন একথা অনস্বীকার্য। এইভাবে লিঙ্কনকে সাহায্য করেন স্প্রিংফিল্ডের অধিবাসী আর স্যাংগামন কাউন্টির আমিন জন ক্যালগুন। ক্যালগুন লিঙ্কনকে খামার বাড়ির সীমানা নির্ধারণ, নতুন শহর, রাস্তার নকশা ইত্যাদি তৈরির কাজে লিঙ্কনকে তার সহকারী নিয়োগ করেছিলেন। একাজে মেণ্টার গ্রাহামের সাহায্যও ছিল প্রচুর। রাতের পর রাত আগুনের সামনে বসে তুজনে আলোচনা আর পড়াশোনা করেছিলেন। মেণ্টার গ্রাহাম সত্যিকার ভালবাসতেন তার

ছাত্রটিকে। তিনি একদিন বলেছিলেন এত তাড়াতাড়ি কাউকেই তিনি শিখতে দেখেননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি পাঁচ হাজার ছাত্রকে শিক্ষাদান করে থাকি তার মধ্যে লিঙ্কনের মত এমন অধ্যবসায়ী যত্নবান ছাত্র আর কাউকেই পাইনি।'

মানুষের উপকার করার কর্তব্যবোধ লিঙ্কনকে চিরকালই আকর্ষণ করেছিল এরই সঙ্গে। লোকে তাকে নাম দিয়েছিল 'সৎআবে'। শোনা যায় কোন একটা ভুল সংশোধনের জন্য লিঙ্কন মাত্র ছ' সেণ্টের বদলে ছ মাইল হেঁটেছিলেন। লিঙ্কনের সততার কাহিনীও প্রায় কিম্বদন্তী হয়ে ওঠে এই সময়। অফফুটের দোকান চালানোর সময় কোনভাবে কয়েক সেণ্ট বেশি নিয়ে ফেললে লিঙ্কন সেই বেশি পয়সা ক্রেতার বাড়ি গিয়ে ফেরত দিয়ে আসতেন।

পোস্ট অফিসে কাজ করার সময় লিঙ্কন নিউ সালেমের গ্রাহকদের কাছে পাঠানো সব কাগজ পড়ে ফেলতেন। এই সব খবর তার মনে গাঁথা হয়ে থাকতো। ইণ্ডিয়ানায় ফিরে গেলে এই সব খবর, তিনি অন্যদের শোনাতেন। তার নাম হয়ে যায় এতে 'খবর বলা ছেলে।'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

প্রেমিকার মৃত্যু ও দুঃখ ভারাক্রান্ত লিংকন

একটু একটু করে অতিক্রান্ত হয়ে চলেছিল জীবনের দিনগুলো। অ্যানের প্রতি বুকভরা ভালবাসা নিয়ে লিঙ্কনও যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। মাঝে মাঝেই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎকারও ঘটে যেত। দুজনের কাছে সে ছিল এক রঙীন আলোয় ভরা মুহূর্ত।

গ্রীষ্মের উষ্ণতা মাখা দিনে অ্যান আর লিঙ্কনকে কখনও দেখা যেত স্যাংগামন নদীর তীরে প্রকৃতির দিগন্ত রেখায়। গাছে গাছে পাখির কলকাকলি শুনতে শুনতে দুজন মুগ্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে চাইত। কান পেতে দুজনে শুনতো পাতার মর্মর ধ্বনি আর নদীর কলকল ধ্বনি। অদ্ভুত দৃষ্টিতে অ্যানের নীলাভ চোখের তারার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরতো আব্রাহাম লিঙ্কন। যেন অ্যানের নীল নয়নের

গভীরতায় ডুব দিতে চাইতেন লিঙ্কন। আবেগে ভরে উঠত অ্যানের মন। গ্রীষ্মের পর এল শীত, নির্জন অরণ্য প্রান্তরে দেখা যেত দুজন তরুণ তরুণীকে। সে ছিল দুটি তাজা তরুণ প্রাণের চরম সুখানুভূতি।

ইতিমধ্যে নানা কাজেও পিছিয়ে থাকেন নি লিঙ্কন। নানা রকম ইচ্ছাই তার মনে জাগত এই সময়। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এক উদগ্র বাসনাও মনে জেগে উঠেছিল তাঁর। প্রায় বেকারত্বই ছিল তখন লিঙ্কনের। কারণ অফফুটের দোকানটি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দেনার দায়ও পড়ে তার উপর। লিঙ্কন নিজেই বলেছিলেন যে দোকানটা প্রায় উঠে যায়।

ঠিক ওই সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। বেরী নামে এক সুরাসক্ত লোকের সঙ্গে একজন মানুষ লিঙ্কনকে ধারে কিছু জিনিস বিক্রি করতে রাজি হয়ে যান। লিঙ্কন সুযোগটা ছাড়লেন না, তাই ওই মাতালের সঙ্গেই একটা দোকান খুলে নিউ সালেমে ব্যবসা শুরু করে দিলেন। ব্যাপারটা বেশ কঠিন ছিল সন্দেহ নেই কারণ তখনকার দিনে দোকান চালানো বেশ কঠিন কাজ ছিল।

একদিন ঘটল একটি ঘটনা। একজন লোক বেশ কিছু মালপত্রসহ ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়ার সময় ওদের দোকানের সামনে বিশ্রাম নিতে থামলেন। অত্যন্ত বেশি মালপত্র থাকায় তিনি কিছু মাল মাত্র পঞ্চাশ সেণ্টে লিঙ্কনকে বিক্রি করে দিলেন। মালগুলো ছিল বড় কাঠের বাক্সে। কাঠের বাক্স খুলে লিঙ্কন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন সেদিন। কারণ বাক্সের মধ্যে ছিল ব্ল্যাকস্টোনের লেখা আইন বিষয়ক রচনাবলী। হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গিয়েছিলেন লিঙ্কন। রচনাবলীর প্রতিটি খণ্ডই বাক্সের মধ্যে ছিল।

লিঙ্কন আনন্দে কাজে নেমে পড়তে দেরি করলেন না, কাজ অবশ্য ছিল একটাই বইয়ের সবকটা খণ্ড পড়ে ফেলা। দোকানে কেনার মত কেউ আসেনি যে যার বাড়িতে কাজে ব্যস্ত। লিঙ্কন এ সুযোগ নষ্ট না করে ব্ল্যাকস্টোনের লেখায় প্রায় ডুবে গেলেন। এক এক করে প্রত্যেকটা খণ্ডই মন দিয়ে বার বার পড়ে ফেললেন। তাকে দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যেন কয়েকটা দিন অভুক্ত থেকে গোগ্রাসে খাবার গিলতে শুরু করেছেন।

ব্ল্যাকস্টোনের রচনা লিঙ্কনকে দারুণভাবে সেদিন থেকে উদ্বুদ্ধ

করতে চাইল। তিনি মনে মনে ঠিক করে নিলেন যেভাবেই হোক আইন তাকে পড়তে হবে। তিনি হয়ে উঠবেন একজন আইনবিদ।

মনস্থির করে ফেললেন লিঙ্কন। কথাটা অ্যানকে না জানানো অবধি শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। অ্যান নিশ্চয়ই খুশি হবে, সে নিশ্চয়ই এ ছাড়াও গর্ব অনুভব করবে একজন আইনবিদকেই বিয়ে করবে ভেবে। লিঙ্কন শেষ পর্যন্ত সব কথাই জানালেন অ্যান রুটলেজকে। অ্যান সানন্দে ওর মনোভাব জানিয়ে দিল। সে খুবই খুশি হল লিঙ্কন আইন পড়বে শুনে। দুই প্রেমিক-প্রেমিকা ঠিক করলেন আইন পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে তারা বিয়ে করবেন।

দিন কেটে চলল *এইভাবেই। ব্ল্যাকস্টোনের রচনা শেষ করে ফেলেছিলেন লিঙ্কন। এবার তিনি ঠিক করলেন আইন অধ্যয়ন করতে স্প্রিংফিল্ডে যাবেন।

ইতিমধ্যে বেরীর সঙ্গে চালানো লিঙ্কনের দোকানের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। দোকান এবার সত্যিই উঠে গেল। এর কারণ হল লিঙ্কন সারাদিন মেতে থাকতেন তার বই নিয়ে আর বেরীর কাজ ছিল সারাটা দিন খালি বোতল বোতল সুরাপান করে চলা। এইভাবেই ১৮৩৩ সালে দোকানগুলো, মোট তিনটি দোকান উঠে গেল। মিঃ বেরী কিছু পরেই মারা গেলেন। প্রায় ১২০০ ডলার দেনার দায় পড়ে গেল লিঙ্কনেরই ঘাড়ে। লিঙ্কন সহজেই দেউলিয়া বলে নিজেকে ঘোষণা করতে পারতেন কিন্তু মহান, সততার প্রতীক লিঙ্কন সে কাজ ভাবতেও ঘৃণা বোধ করতেন তাই সব দেনার শেষ সেন্টও তিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন একটু একটু করে। একাজ করতে তার লেগে যায় প্রায় পনেরো বছর।

এবার স্প্রিংফিল্ড। প্রেইরী ঘাসে জড়ানো প্রান্তর পার হয়ে বিশ মাইল দূরের স্প্রিংফিল্ডে একদিন রওয়ানা হলেন লিঙ্কন। তার উদ্দেশ্য ছিল পরিচিত কোন আইনজ্ঞের কাছ থেকে আইন সংক্রান্ত বইপত্র নিয়ে আসা। এই মানুষটির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয় লিঙ্কনের সেই ব্ল্যাকহক যুদ্ধের দিনগুলোতে। হাঁটা পথেই আবার বই নিয়ে ফিরে এলেন লিঙ্কন আর পথ চলার অবসরে বই খুলে পড়েও নিতে চাইলেন। বই পড়ার আনন্দে পথ চলার দীর্ঘ সময় কখন কেটে

গেল টের পাননি তিনি।

আইন সম্পর্কে লিঙ্কন অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। এরপর থেকে কখনও কোথাও গেলে আইনের বই কাছে থাকত তার, এ বই হয়ে উঠেছিল তার নিত্য সঙ্গী। অবসর পেলেই আইনের বইয়ের পাতা উল্টাতেন লিঙ্কন। খামারের কাজ করার মুহুর্তেও এ বই কাছছাড়া করতেন না তিনি। এই সময়ে তিনি এক-জনের কাছে জানতে পারেন ভাল আইনজ্ঞ হয়ে উঠতে গেলে ব্যাকরণেও ব্যুৎপত্তি দরকার। কীর্কহ্যামের গ্রামারই ছিল এ বিষয়ে সব চেয়ে ভাল বই। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লিঙ্কন একজনের কাছ থেকে সেই কীর্কহ্যামের গ্রামার নিয়ে এসে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়ে শেষ করেছিলেন। তার ওই সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করেই তার শিক্ষক মেণ্টার গ্রাহাম বলেছিলেন তার ছাত্রদের মধ্যে লিঙ্কনের মত অধ্যবসায়ী কাউকেই দেখেননি।

এরপর একে একে লিঙ্কন আরও নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেন, তার মধ্যে ছিল, ইতিহাস, ভূগোল ও বিখ্যাত মানুষদের জীবনীগ্রন্থ।

এইসব নানা কাজের মধ্যেও অ্যানকে আরও গভীরভাবে ভাল বাসতে শুরু করেন আব্রাহাম লিঙ্কন। দারিদ্র্য তাকে কোনভাবেই কাবু করতে পারেনি এমনই ছিল তার মনের জোর।

এরপর আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। এই ঘটনা লিঙ্কনের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জেমস রুটলেজের সেই বিখ্যাত রুটলেজ টেভান' নামের সরাইখানাটি ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। খুবই কঠিন অবস্থায় পড়ে গেল এর ফলে রুটলেজ পরিবার। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে অ্যানকেও কোন খামারে রান্নার কাজ নিতে হল। লিঙ্কনও সেই খামারে কাজ করতেন। অ্যানের সঙ্গে কাজের ফাঁকে দেখাও হত তার। দুই প্রেমিক প্রেমিকার মন তখন এক অপরিমিত আনন্দে ভরে উঠতে চাইত।

এই প্রেমিকার সংস্পর্শ লিঙ্কনের জীবনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ হয়েই জাগরূক ছিল চিরদিন। লিঙ্কন নিজেই পরে এক সময় বলে-ছিলেন প্রেসিডেণ্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে থাকার সময়েও ওই খামার বাড়িতে অ্যানের সংস্পর্শ লাভের আনন্দ আর তিনি পাননি।

দারিদ্র্য তার সে সময়ের অনাবিল আনন্দ কেড়ে নিতে পারেনি। ওই দারিদ্র্যময় জীবনে ভাল খাওয়া জুটত না লিঙ্কনের, ছিলনা ভাল পোশাকও। তবুও তার মনে ছিল অপার আনন্দ।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বোধহয় সেদিন আড়ালে হেসেছিলেন। কারণ এমন আনন্দ দুজনের জীবনে বেশিদিন তাঁর রইল না। আচমকা একসময় অ্যান রুটলেজ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। দীর্ঘদিন জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় ক্রমশই অ্যানের শরীর খারাপ হয়ে চলল। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল অ্যান রুটলেজ। শেষ পর্যন্ত বহুদূর থেকে ডাক্তার আনা হল। ডাক্তার পরীক্ষার পর জানালেন অ্যান টাই-ফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়েছে। দুঃখের কথা সে সময় টাইফয়েড রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি পৃথিবীতে।

বেদনায় ভেঙে পড়েছিলেন লিঙ্কন। কিন্তু চরম অসহায় ছিলেন তিনি করার মত কিছুই যে তার ছিল না। এমন কি ওই সময় অ্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করারও বিশেষ সুযোগ পাননি লিঙ্কন। অ্যান ক্রমেই ঢলে পড়ছিল মৃত্যুর দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর জ্বরে প্রায় বেহুঁস হয়ে পড়ল অ্যান রুটলেজ। বিবর্ণ নিস্তেজ হয়ে এল এক কালের চঞ্চলা সেই কিশোরী অ্যান। এক সময় প্রলাপ বকতেও আরম্ভ করে দিল সে। বারবার প্রলাপের মধ্যে সে নাম করে চলল লিঙ্কনের। লিঙ্কনকে সে সময় সুযোগ দেওয়া হল মৃত্যু পথযাত্রী অ্যানের কাছে বসতে। বেদনায় মূক আব্রাহাম লিঙ্কন স্তব্ধ হয়ে মাথার কাছে বসেছিলেন অ্যানের। তার মুখে ভাষা ফোটেনি। চোখের সামনেই তিল তিল করে অ্যানকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখলেন লিঙ্কন। রুটলেজ পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসতে চলেছিল একটু একটু করে।

বোবা হয়ে গিয়েছিলেন সেই মুহূর্তে লিঙ্কন। প্রায় শোকে পাথর হয়ে যান তিনি অ্যানকে দেখে। অ্যানের চোখ বেয়ে নেমে আসতে শুরু করেছিল জলের ধারা। অন্তিম লগ্নের বোধ হয় আর দেরি ছিল না। অ্যানের জীবনের ওটাই যেন ছিল অন্তিম লগ্ন।

এরপরের দিনই এল সেই শোকার্ত ভয়ঙ্কর বেদনাময় লগ্ন। সকলের বেদনার্ত চোখের সামনেই বিদায় নিল অ্যান রুটলেজ। মৃত্যুর কঠিন করাল স্পর্শে অকালে ফুলের মতই ঝরে গেল এক নির্মল

কচি প্রাণ। লিঙ্কনের হৃদয় যেন কেউ তপ্ত শলাকায় বিদ্ধ করে দিল ওই মৃত্যু সংবাদে। প্রায় শোকে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন লিঙ্কন ওই বিচ্ছেদের ফলে। কোন কাজেই আর স্পৃহা ছিল না হতভাগ্য লিঙ্কনের। চোখের ঘুম উধাও হয়ে গেল তার। এক ভয়ঙ্কর অবস্থাই যেন ঘটতে চলেছিল তার জীবনে। লিঙ্কন ভাবতে পারতেন না কিভাবে জীবনে বেঁচে থাকবেন অ্যানকে ছাড়া। কথাবার্তাও বলতে চাইতেন না কারও সঙ্গে। এ এক অসহনীয় অবস্থা নেমে আসে হতভাগ্য লিঙ্কনের জীবনে। তার কাছে জীবন হয়ে যায় একেবারেই অর্থহীন। যে পৃথিবীতে অ্যান নেই সে পৃথিবীতে যেন শ্বাস প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হতে লাগল লিঙ্কনের। এক সময় প্রায় মানসিক ভার-সাম্য হারাতে বসলেন লিঙ্কন। তিনি পরিচিত জনদের বলেই ফেললেন তিনি আত্মহননের পথই বেছে নেবেন—এই জীবন তার সহ্য হচ্ছে না। লিঙ্কনের বন্ধু আর প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীরা রীতিমত আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তার মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখে। বন্ধুরা তাই প্রায় চোখের আড়ালে যেতে দিতেন না লিঙ্কনকে যাতে অঘটন কিছু ঘটে না যায়। লিঙ্কনের কাছে যাতে কোন সামান্যতম অস্ত্র ইত্যাদি না থাকে তারা সেটাও লক্ষ্য রাখতে চাইলেন। কোন দুর্বল মুহূর্ত্তে লিঙ্কন যাতে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে না পড়তে পারেন সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখা হল।

এই সময় লিঙ্কন প্রায় সমস্ত কাজেই উদাসীন হয়ে পড়লেন। যে লিঙ্কন মানুষকে এতটা ভালবাসতেন, তাদের সঙ্গ কামনা করতেন, সেই লিঙ্কনই মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চাইলেন। সম্পূর্ণ নির্জনতাই বেছে নিলেন এক কালের হাসি খুশি যুবকটি। সব কিছুতেই তার উদাসীনতা প্রকট হয়ে উঠেছিল সেই দিনগুলিতে।

অ্যানের অকাল মৃত্যুর ওই আঘাত কোনদিনই ভুলতে পারেন নি আমেরিকার ভবিষ্যত প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন। যন্ত্রণার ক্ষত তার কোন কালেই শুকিয়ে যায়নি। অ্যানের মৃত্যুর কিছু পর থেকেই দীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তার সমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে লিঙ্কন ঘণ্টার ঘণ্টা চোখের জল ফেলতেন। প্রেমিকের অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যেত প্রেমিকার সমাধি। প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে উন্মত্তের মত অশ্রুপাত করতেন লিঙ্কন এই বলে যে অ্যানের কষ্ট হচ্ছে।

লিঙ্কন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন বলেই ধরে নিলেন তাঁর বন্ধুরা। শেষ পর্যন্ত একজন ডাক্তারকে আনা হলে তিনি লিঙ্কনকে পরীক্ষার পর জানালেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তাকে কাজের মধ্যেই রাখা দরকার বলে অভিমত জানালেন ডাক্তার। শারীরিক সুস্থ থাকলেও লিঙ্কন হারিয়েছিলেন মানসিক স্থৈর্য্য আর ভারসাম্য।

নিউ সালেমে লিঙ্কনের একাকীত্বভরা জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। লিঙ্কনের বন্ধু ছিলেন এই সময় বোলিং গ্রীণ। স্যাংগামন নদীর তীরে ছিল গ্রীণের বাড়ি। লিঙ্কনের অবস্থা লক্ষ্য করে বোলিং গ্রীণ তাকে নিজের বাড়িতে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেলেন। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে নানা গাছের পরিচর্যায় লিঙ্কনকে প্রায় জোর করেই লাগাতে চাইলেন বোলিং গ্রীণ ও তার স্ত্রী ন্যান্সি গ্রীণ। বলতে গেলে গ্রীণ দম্পতির ঐকান্তিক চেষ্টায় কিছুটা ভারসাম্য ফিরে পেলেন লিঙ্কন। গাছের পরিচর্যার মধ্যে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে থাকায় কোন রকমে দিন কাটাতে লাগলেন লিঙ্কন।

এইভাবেই বেশ কয়েকটা মাস আর বছরও কেটে গেল। কিন্তু লিঙ্কনের মুখের সেই হাসি যেন শুকিয়ে গেল দীর্ঘকালের জন্য। আগের সেই ভাব আর ফিরে এলোনা। অ্যানের শোক কোনভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি লিঙ্কন। চিরকালের মতই এক বিষাদ চিহ্ন আঁকা হয়ে গিয়েছিল লিঙ্কনের মুখে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

স্প্রিংফিল্ডে ভাগ্যান্বেষণে লিঙ্কন ● আইন ব্যবসা ও মেরী টড

প্রেমিকা অ্যান রুটলেজের অকাল প্রয়াণে যে আঘাত পেয়েছিলেন প্রেমিক লিঙ্কন সে আঘাতের ফলে নিউ সালেম তার কাছে নিরানন্দের হয়ে উঠেছিল। এখানকার আকর্ষণ তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ১৮৩৭ সালে ঠিক আটাশ বছর বয়সে তিনি এপ্রিল মাসের একদিনে আইন ব্যবসা করবেন মনস্থ করে স্প্রিংফিল্ডে রওয়ানা হয়েছিলেন। পিছনে পড়ে রইল একরাশ স্মৃতি। আর তারই মধ্যে ভালবাসার পাত্রী অ্যান রুটলেজের সমাধিও।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে একদিন স্প্রিংফিল্ড অভিমুখে রওয়ানা হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। এর আগে অনেক ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল, বেকার জীবন, দোকান উঠে যাওয়া, দেনার দায় মাথা পেতে গ্রহণ করা এমন অনেক কিছুই। অনেক পার্থিব সম্পদ এর ফলে হারাতে হয় লিঙ্কনকে দেনা শোধ করতে। কিন্তু কোন কিছুতেই দমে যান নি লিঙ্কন এমনই ছিল মনের জোর।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত প্রেসিডেন্ট যেদিন প্রথম স্প্রিংফিল্ডে হাজির হলেন সেদিনকার কথা কেন্টাকি থেকে আগত সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী সুদর্শন তরুণ যশুয়া এফ. স্পীডের স্পষ্টই স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করেছিল। লিঙ্কন এখানে ছিলেন প্রায় দীর্ঘ চব্বিশটি বছর আর স্পীড হয়ে উঠেছিলেন লিঙ্কনের অকৃত্রিম একজন সুহৃদ আর শুভাকাঙ্ক্ষী। ধার করা একটা ঘোড়ায় চড়ে জিনের দুপাশে চটের থলেয় ভরে যাবতীয় জিনিসপত্র সহ লিঙ্কন অত্যন্ত দীনভাবেই সেদিন উপস্থিত হন স্প্রিংফিল্ডে। তিনি স্পীডের দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন একটা খাট আর আসবাবপত্রের জন্য কত দাম দিতে হবে। যখন শুনলেন সতেরো ডলার তখন তিনি বলেছিলেন, 'দামের দিক থেকে হয়তো এটা খুবই সস্তা, কিন্তু যত সস্তাই হোক সে দাম দেবার

ক্ষমতা আমার নেই। তবে আপনি যদি বড়দিন পর্যন্ত জিনিসগুলো ধার হিসেবে দিতে পারেন আর এখানে আইনবিদ হিসেবে আমি যদি কৃতকার্য হতে পারি তাহলে সব ধারই আমি শোধ করে দেব। আর আমি যদি কৃতকার্য না হই তাহলে এ ধার হয়তো কোনদিনই আর শোধ করতে পারব না।'

অনেকের কথায় জানা যায় আব্রাহাম লিঙ্কনের মুখে যে বিষণ্ণতার ছাপ সেদিন ফুটে উঠেছিল সেরকম বিষণ্ণতা কেউ দেখেন নি।

বেঢপ চেহারার দীর্ঘকায় যুবকের অসুন্দর মুখ দেখে সেদিন বিচিত্র এক সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছিলেন সুদর্শন স্পীড। দোকানের কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ম্রিয়মান মুখের তরুণ আইনজীবির দিকে তাকিয়ে স্পীড বললেন, 'এত অল্প দেনার জন্য আপনার যখন এতই দুশ্চিন্তা হচ্ছে তখন আমি আপনাকে একটা মতলব দিতে পারি। এতে আপনার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে আর দেনাও হবে বলে মনে হয় না। আমার একটা বড় ঘর আছে আর সে ঘরে দুজনের মত বিছানাও আছে। আপনার যদি কোনরকম আপত্তি না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে সেই ঘরে থাকতে পারেন।'

স্পীড পরে একথাও বলেছিলেন যে লিঙ্কনকে দেখে তিনি আবিষ্ট হয়ে যান। সে এসে দাঁড়িয়েছিল দীনহীন ভঙ্গীতেই তার জেনারেল স্টোরের সামনে। যে ঘোড়ায় চড়ে লিঙ্কন এসেছিলেন সেও ছিল ধার করে আনা।

যাই হোক স্পীডের প্রস্তাব শুনে লিঙ্কন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ঘর কোন দিকে ?

স্পীড বললেন, 'উপরে।'

লিঙ্কন কোন কথা না বলে সোজা উপরে উঠে গেলেন তার থলে দুটো হাতে করে। কিছুক্ষণ পরে ঘরের এক কোণে থলে দুটো নামিয়ে রেখে উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে নেমে এলেন লিঙ্কন।

লিঙ্কন স্পীডের সামনে এসে সানন্দে বলে উঠলেন, 'স্পীড, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা রইল না। আমি রয়ে গেলাম—।'

স্পীডের বিছানা ভাগাভাগি করে এখানেই লিঙ্কন রয়ে গেলেন প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর। কোন ভাড়া কোনদিনই তাকে দিতে হয়নি।

স্প্রিংফিল্ডে এসেও বিষণ্ণতা আর নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসেছিল লিঙ্কনকে। কিছুতেই তার মন সুস্থির হয়নি। এক চিঠিতে স্বয়ং লিঙ্কনই নিজের নিঃসঙ্গতার কথা লিখেছিলেন। কিন্তু এ সত্বেও এক হিসেবে ভাগ্যবান মানুষ ছিলেন লিঙ্কন। কারণ যশুয়া স্পীডের কাছে থাকার সময় তিনি যে কেবল বিনা ভাড়ায় থাকার সুযোগই পেয়েছিলেন তা নয়, আড্ডা দেওয়ার ও নানা মানুষের সঙ্গে নানা ধরণের আলাপ আলোচনার অঢেল সুযোগ পেয়েছিলেন।

স্পীডের দোকানের ঠিক পিছন দিকেই চুল্লীর আগুনে উত্তপ্ত একটি বড় আকারের ঘরে শহরের প্রচুর শিক্ষিত বুদ্ধিমান তরুণ জমায়েত হয়ে সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনায় সোৎসাহে মেতে উঠতেন। স্পীড নিজে শিক্ষিত তরুণ, লিঙ্কনের চেয়ে কোন অংশেই তিনি কম ছিলেন না বরং অনেক বিষয়েই সভ্য আর শিষ্টাচারী ছিলেন।

স্পীডের মত লিঙ্কন আরও একজন অতি ভদ্র, শিষ্টাচারী উপকারী বন্ধু লাভ করেছিলেন। তার নাম উইলিয়াম বাটলার। বাটলারও একসময় লিঙ্কনকে তার বাড়িতে নিজে থেকেই পাঁচবছর থাকতে দিয়েছিলেন। শুধু এটুকুই নয়, বাটলার লিঙ্কনকে প্রচুর সাহায্যও করেন সে সময় অনেক পোশাক ও নানা দরকারী জিনিসপত্র দিয়ে। লিঙ্কন উপকারী এই দুই বন্ধুর কথা কোনদিনই বিস্মৃত হননি। স্পীড ও বাটলারের কথা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও মনে রাখেন লিঙ্কন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, 'এই দুই বন্ধুকে ওই দুঃসময়ে পেয়েছিলাম বলে আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।'

স্পীডের ঘরে যে আলোচনা সভা বসত তাতে যোগদান করতেন স্পীডের সঙ্গে তারই একজন বুদ্ধিমান ও দক্ষ কর্মচারি 'বিলি হার্ণডন'। কখনও কখনও আবার তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসতেন তরুণ রাজনীতিক স্টিফেন এ ডগলাস। ডগলাস ছিলেন ডেমোক্র্যাট দলের সমর্থক। বেঁটে খাটো চেহারার ডগলাস কোন বিষয়ে হার মানতে চাইতেন না। ওদিকে আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন দীর্ঘকায়, আপোষকামী আর হুইগদলের সমর্থক। সাধারণতঃ আলোচনা যখন জমে উঠত তখন কোথা দিয়ে যেন সময় কেটে যেতে চাইত। সবাই পরস্পর হাসি ঠাট্টা তামাশার মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন কখনও নানা

আলোচনা হত, চলত গল্প বলা আর কবিতা আবৃত্তি। অনেক সময় তুমুল তর্ক বেধে যেত ডগলাস ও লিঙ্কনের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে। তর্কে কেউই হারতে চাইতেন না তুজনের মধ্যে।

ভাগ্য অন্য আর এক ব্যাপারেও সহায়ক হয়ে উঠেছিল লিঙ্কনের। যিনি একসময় লিঙ্কনকে আইন অধ্যয়ন করার জন্য উৎসাহ—দান করেন সেই জন টি স্টুয়ার্ট এই সময় লিঙ্কনকে তার আইনব্যবসায়ের সঙ্গী করে নিলেন। স্টুয়ার্ট নিজে অ্যাটর্নী ছিলেন। ওই সময়কার খাতাপত্র থেকে জানা গেছে তারা আইন সম্পর্কে পরামর্শ আর সাহায্য করার জন্য মাত্র পাঁচ ডলার পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। এ সত্ত্বেও তেমন ভাল না হলেও যৌথ কারবারটি বেশ চালুই ছিল আর সাধারণ মানুষ তাদের তুজনকেই বরাবর শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল।

এর আগে লিঙ্কন নিউসালেমে থাকার সময় একটা কাজ করে-ছিলেন তার উল্লেখ থাকাও দরকার। ইলিনয়ের জন্য রাস্তা খাল, ইত্যাদি উন্নয়নের প্রচণ্ড দাবী উঠেছিল সে সময়। এই দাবীর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো দাবীর প্রবক্তা ছিলেন স্বয়ং লিঙ্কন। সে সময় রাজ্যের রাজধানী ছিল ভ্যাণ্ডালিয়ায়। লিঙ্কন ও তাঁর বন্ধুদের প্রচণ্ড দাবী ছিল রাজধানী ভ্যাণ্ডালিয়া থেকে স্প্রিংফিল্ডে সরিয়ে আনা হোক। শেষ পর্যন্ত লিঙ্কনেরই জয় হয়, স্প্রিংফিল্ডে রাজধানী সরিয়ে আনার দাবী স্বীকৃত হয়। লিঙ্কন এর ফলে স্প্রিংফিল্ডে বীরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এই সময় শিল্ডস নামে একজনের সঙ্গে লিঙ্কনের আলাপ হয়, পরে একসময় তিনি লিঙ্কনের শত্রু হয়ে ওঠেন। লিঙ্কনকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধেও আহ্বান করেছিলেন একদিন।

স্টুয়ার্টের সঙ্গে আইন ব্যবসা তুলকি চালে চললে লিঙ্কন কিছুটা হতাশ হয়েও পড়েন। আইন বিষয়ে তেমন ভাল পসার না হওয়ায় একসময় তিনি এমনও ভেবে বসেছিলেন যে আবার জুতোর মিস্ত্রীর কাজই শুরু করে দেবেন। আইনের বইপত্রের উপরও তার সাময়িক বিতৃষ্ণা এসে যায়। নিরাশায় ভেঙে পড়েছিলেন লিঙ্কন।

এসব সত্ত্বেও, বিশেষ করে ভ্যাণ্ডালিয়া থেকে স্প্রিংফিল্ডে রাজধানী সরিয়ে আনায় লিঙ্কনকে ভালবাসতো স্থানীয় মানুষ। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন শহরে।

তু'বছর আগেকার আদমসুমারি থেকে জানা যায় যে লিঙ্কন যে

সময় স্প্রিংফিল্ডে আসেন তখন সেখানকার জনসংখ্যা ছিল ১৫০০ হাজারের মতই। দোকান আর গির্জার সংখ্যাও ছিল সমান সমান। মাত্র ছটা দোকান ও ছটা গির্জা।

লিঙ্কন নিজে গির্জায় যেতে চাইতেন না, হয়তো গির্জায় প্রার্থনা করার নিয়ম কানুন তার জানা ছিল না বলে। স্প্রিংফিল্ডে পরস্পর বিরোধী দুটো সংবাদপত্রও ছিল। একসময় এই কাগজ দুটি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী লিঙ্কন ও স্টিফেন এ. ডগলাসের ব্যক্তিগত মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে লিঙ্কনের একনিষ্ঠ সমর্থক সিমিয়ন ফ্রান্সিস সম্পাদনা করতেন 'স্যাংগামন জার্নাল' আর ডগলাসের বন্ধু জর্জ আর. ওয়েবার সম্পাদনা করতেন 'ইলিনয় রিপাবলিকান'। এই কাগজটির নাম পরে বদলে যায় 'ইলিনয় স্টেট রেজিস্টারে'।

স্প্রিংফিল্ডে বেশ কিছুকাল কাটানোর পরেও লিঙ্কন তার প্রথম প্রেমিকা অ্যান রুটলেজের স্মৃতি ভুলতে পারেন নি। মুখে গাম্ভীর্য নিয়েই অধিকাংশ সময় থাকতে চাইতেন এককালের হাসিখুশি আব্রাহাম। কোন মেয়ের সঙ্গে পারতপক্ষে কথাও বলতে চাইতেন না তিনি।

ইলিনয়ের এই নতুন রাজধানী শহর বলে পরিচিত হলেও এখান-কার জীবনযাত্রার রীতিনীতি অনেকটাই ছিল রুক্ষ গ্রাম্য আর অশিষ্ট। তবুও কোথায় যেন প্রাণের স্পর্শও ছিল সেখানে। এসব সত্ত্বেও লিঙ্কন স্প্রিংফিল্ডের অধিবাসীদের কাছে সহৃদয় ও আন্তরিক ব্যবহারই পেতেন।

এখানেই একদিন লিঙ্কন পরিচিত হলেন স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের শিরোমণি নিনিয়ান ডব্লিউ. এডওয়ার্ডস ও তার স্ত্রী এলিজাবেথ টড এডওয়ার্ডসের সঙ্গে। লিঙ্কন তাদের কাছে সাদরে গৃহীত হলেন। ইতিমধ্যে লিঙ্কন বিধান সভায় হুইগ দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিতও হয়েছিলেন। স্টুয়ার্টের আইন ব্যবসার সহযোগী হওয়াতেও সর্বত্রই লিঙ্কন সসম্মানে গৃহীত হতেন। অভ্যর্থনাও লাভ করতেন সব জায়গাতে। কিন্তু তখনও তিনি ভালভাবে পোশাক পরতে পারতেন না, পারতেন না মার্জিত ভাষায় কথা বলতে, বেশ গ্রাম্য টানও ছিল তার কথায়। মেয়েদের মনোরঞ্জন কৌশলও তার

জানা ছিল না। নাচেও পারদর্শী হয়নি লিঙ্কন। এইখানেই লিঙ্কনের জীবনে এক নতুন দিগন্তের দ্বার একদিন আচমকা উন্মুক্ত হয়ে গেল। সময়টি ছিল ১৮৩৯ সালের কোন এক সময়। শোনা যায় এই সময় স্প্রিংফিল্ডের বিধান সভার প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক বলনাচের আসরের মজলিসে লিঙ্কন ছোটখাট গোলগাল চেহারার নীল নয়না, মেরী টডকে প্রথম দেখেছিলেন। মেরী টড ছিলেন মিসেস এডওয়ার্ডসের ছোট বোন। বেশ বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা, রাশভারী প্রকৃতির মেয়ে মেরী টড। শোনা যায় ফুল দিয়ে সাজানো স্বল্পালোকিত নাচের মজলিসে বড়গলা নাচের পোশাক পরা মেরী টডই ছিলেন সবারচেয়ে সুন্দরী।

বেমামান নৈশ পোশাকে সজ্জিত লম্বা, লাজুক প্রকৃতির আব্রাহাম লিঙ্কন কিন্তু বারবার অন্য মনস্ক হয়ে পড়ছিলেন সেদিনের সান্ধ্য সেই অনুষ্ঠানে। এমন কি যে মজার মজার গল্প বলে তিনি সকলকে খুশি করতেন সেই গল্পেরও ছন্দ কেটে যাচ্ছিল সেই সন্ধ্যায়। বারবার তার দৃষ্টি পড়ছিল সুন্দরী তরুণীর উপর। মেরী টড ইতিমধ্যে কখনও নাচছিলেন সেই শিল্ডসের বা কখনও ডগলাসের সঙ্গে। আবার সে নাচ শেষ হলে আবার নাচছিলেন অন্য কোন তরুণের সঙ্গেও।

লিঙ্কনের মনে যেন ঝড় উঠেছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত শোনা যায় বেশ সাহস সঞ্চয় করেই মেরী টডের কাছে তার সঙ্গে নাচতে অনুরোধ জানিয়ে ফেললেন। অবশ্য সঙ্গে একথাও জানাতে ভোলেন নি যে তিনি মোটেই ভাল নাচতে পারেন না।

মেরী টড গররাজি হলেন না। কিন্তু পরে একসময় বলেছিলেন সত্যিই নাচতে জানতেন না লিঙ্কন।

এইভাবেই শুরু হল একদিন রাগ অনুরাগে ভরা এক পূর্বরাগের খেলা। শেষ পর্যন্ত একদিন আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে ঝঞ্ঝাটের বিয়ের মধ্যে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

মেরী টড নিঃসন্দেহে লিঙ্কনকে প্রথম দর্শনেই জয় করে ফেলেছিলেন। মেরী টড মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন লিঙ্কনকেই বিয়ে করবেন। মেরী লিঙ্কনকে কেবল কথা বলাতেই পারেন নি আবার মেলামেশার মধ্যেও টেনে এনেছিলেন নৈরাশ্য কাটিয়ে।

আশ্চর্য হতে হয় এটাই ভেবে যে আব্রাহাম আর মেরী টডের মত এরকম তাজ্জব প্রকৃতির দুজন মানুষ কিভাবে প্রথম দর্শন মাত্রই পরস্পরকে হৃদয়দান করেছিলেন। মেরী টড বেশ উঁচু বংশেরই মেয়ে সন্দেহ ছিল না। তার বাবা কাকা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন খুবই সম্ভ্রান্ত উচ্চপদের মানুষ। সামরিক বা অসামরিক কর্মচারি হিসাবে তাদের প্রতিপত্তিও কম ছিল না। মেরী নিজেও শিক্ষিতা, তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন কেনটাকি প্রদেশের লেক্সিংটনের এক অভিজাত ফারাসী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেখানে শুধু পয়সাওয়ালা মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল।

মেরী ফরাসী ভাষার খুবই দক্ষ ছিলেন, তাছাড়া সামাজিক আদব কায়দায় তো বটেই। তিনি নাচতে শিখেছিলেন, জানতেন আরও বহু কিছু। নাটক ও সাহিত্য তার প্রিয় বিষয় ছিল। দামী পোশাক পরিহিতা, প্রসাধনে মণ্ডিত হয়ে থাকতেই ভালবাসতেন মেরী। সকলের দৃষ্টি পড়ত তাই তার উপর। এ ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকতেন মেরী।

অন্যদিকে লিঙ্কন একেবারেই সাদাসিধে সাধারণ স্তরেরই মানুষ। কোন উঁচু বংশ মর্যাদা তার একেবারেই ছিল না, বরং বেশ অখ্যাতই ছিলেন। একদিক দিয়ে মায়ের দিক থেকে কিছুটা কুখ্যাতিও ছিল তার। মেরী টডের বংশ সেদিক থেকে বিশেষ নামী।

লিঙ্কন ছিলেন সাদামাটা মানুষ, চরিত্র শান্ত, বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও ক্ষমাশীল মানুষ। কিন্তু মেরী অসম্ভব রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, পরিচ্ছন্ন ফিটফাট, অত্যন্ত অমিতব্যয়ী, অহঙ্কারী, অসহিষ্ণু, অল্পেই রাগে ফেটে পড়তেন। মেরীর মত উচ্চাভিলাসী মেয়ে স্প্রিংফিল্ডে খুব কমই ছিল তখন। অভিজাত বৈভবে লালিত মেরী অল্পবয়সের সময় থেকেই বলে বেড়াতেন সে যাকে বিয়ে করবে সে হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকেই তার পছন্দ। কথাটার মধ্যে বড় বেশি অহঙ্কার জড়ানো থাকলেও মেরী গ্রাহ্য করতেন না লোকের সমালোচনা। তিনি তার দম্ভোক্তি বন্ধ করেন নি কখনও। মজার বিষয় হল লিঙ্কন ও স্টিফেন ডগলাসই ছিলেন মেরী টডের দুই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত স্বামীর একজন।

অনেকে মনে করেছেন যে এঁদের মধ্যে যে কোন একজনকে মেরীর উচ্চাশা আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে আসীন করতে পারত।

মেরী যে সাংঘাতিক রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন তার নিজের বোনই এ কথা বলেছেন। তার দিদি লিঙ্কনের সম্পর্কে বলেছেন, 'লিঙ্কন দেখা করতে এলে মেরী একাই কথা বলে যেত একটানা। মিঃ লিঙ্কন চুপচাপ একপাশে চুপ করে বসে থাকতেন আর তার কথা শুনতেন। ক্বচিৎ দু-একটা কথাই বলতেন তিনি। মনে হত কোন এক মহান শক্তি তাকে আকর্ষণ করছে। এটা ঠিক, মেরীর মত উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি—।'

দেখা হওয়ার 'পর মেরী আর লিঙ্কনের মত দুই অসম প্রকৃতির নারী ও পুরুষের মধ্যে বিচিত্র প্রেমের পূর্বরাগের পালা বিচিত্রভাবেই চলতে শুরু করেছিল। শুধু মাঝে মাঝে মেরীর বাক্যযন্ত্রণায় বিষন্ন না থাকলে লিঙ্কন মন্ত্রমুগ্ধের মতই ওর কথা শুনে যেতেন। তবে দুটো বিষয়ে দুজনের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা ছিল তাতে কণামাত্র সন্দেহ নেই, আর তা হল সাহিত্য ও রাজনীতি।

মেরীর সবচেয়ে বদগুণ ছিল তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী প্রকৃতির নারী। যখন তখন জেদের বশেই অনেক কাজ করে বসতেন, কোন খেয়াল থাকত না। এই জেদের বশেই একদিন তিনি নিজের বাড়ি ত্যাগ করে বিবাহিতা দিদির কাছেও চলে যান।

একটা কথা এখানে জানানো দরকার, সেটা হল মেরী টড আমেরিকার যে ভাবী প্রেসিডেণ্টকে স্বামী হিসেবে কামনা করতে আরম্ভ করেছিলেন তার কাছে ইলিনয়ের ওই স্প্রিংফিল্ড শহরটি ছিল খুবই উপযুক্ত নির্বাচন। এর কারণ একটাই—মেরী ওই শহরে না থাকলে হয়তো কোনদিন এমন মানুষকে তিনি স্বামী হিসেবে পেতেন না যিনি ভবিষ্যতে একদিন হবেন আমেরিকার মহান প্রেসিডেণ্ট। স্প্রিংফিল্ডের মত ছোট শহর যেখানে লোকসংখ্যা ১৫০০ শতেরই মত, শহরও তেমন পরিছন্ন ছিল না ভাঙা পথঘাট। অথচ আশ্চর্য ঘটনা যে ওই ছোট্ট শহরে সে সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হওয়ার যোগ্য দুজন মানুষই ছিলেন।

সেই দুজন হলেন স্টিফেন এ. ডগলাস ও আব্রাহান লিঙ্কন।

ডগলাস ছিলেন ডেমোক্রাট দলের নির্বাচিত প্রার্থী আর আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী। মজার ব্যাপার ছিল এই যে দুজনেই মেরী টডের প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষ। দুজনেই গভীরভাবে চেয়েছিলেন মেরীর ভালবাসা আর দেখতেন তাকে বিয়ে করার স্বপ্ন।

কিন্তু মেরী চেয়েছিলেন কাকে? মেরীকে সকলে প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি জবাব দিতেন, 'আমি তাকেই স্বামী নির্বাচন করব যার পক্ষে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা সকলের চেয়ে বেশি রয়েছে—।'

এ বিষয়ে স্টিফেন এ. ডগলাসের সম্ভাবনা যে লিঙ্কনের তুলনায় অনেকটাই বেশি মাত্রায় ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। ডগলাসের রাজনৈতিক জীবন লিঙ্কনের চেয়ে অনেক বেশি সফল ছিল। বয়সও কম, অভিজাত মানুষ তাছাড়া জোরালো বক্তৃতার ক্ষমতাও ছিল তার। চেহারা সুন্দর, ব্যবহারও মার্জিত। ডগলাস এ সময় ছিলেন আবার রাজ্যের সেক্রেটারি। সেক্ষেত্রে লিঙ্কন তখনও বলতে গেলে নিজের পায়ে সম্পূর্ণ দাঁড়াতে পারেন নি, আইনজীবি হওয়ার জন্য। প্রতিষ্ঠিত হতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। যশুয়া স্পীডের দোকান ঘরে তার তখনও দিন কাটছিল। লিঙ্কনকে যে সময় তার নিজের বাইরের মানুষ প্রায় চিনতই না তখন ডগলাস ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত মানুষ, সুবক্তা, রাজনীতি সচেতন পুরুষ। ওখানকার মানুষ শুধু শুনেছিল লিঙ্কন নামে একজন ডগলাসকে একবার তর্কে পরাজিত করেছিল, ব্যাস এটুকুই শুধু। এক হিসেবে সম্ভাবনার দিক থেকে ডগলাস ছিলেন অনেকটাই এগিয়ে।

এডওয়ার্ড দম্পতির কিন্তু ইচ্ছা ছিল না মেরী লিঙ্কনকে স্বামী হিসেবে বেছে নিক। তাঁরা মেরীকে সেকথা বলেও ছিলেন। মেরীর অন্যান্য আত্মীয়রাও চাইতেন সে ডগলাসকেই বিয়ে করুক। এর কারণ তারা বুঝেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তারই আছে, সে সুপুরুষ আর সকলের কাছে গ্রহণীয় তো অবশ্যই। বংশ মর্যাদায় লিঙ্কন ডগলাসের কাছাকাছি আসতেই পারতেন না। লোকে ডগলাসের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হত। মানুষকে কাছে আনার যাদুকরী ক্ষমতাই ছিল স্টিফেন এ. ডগলাসের। তার গলার স্বরও ছিল লোককে আকর্ষণ করার মত সুন্দর, ভরাট। ডগলাসের

এ ছাড়া নিজস্ব গাড়িও ছিল। সে কৌশলও ভাল জানতো। রমণীদের মন জয় করার সমস্ত রকম কলাকৌশলও রপ্ত ছিল ডগলাসের। মেরী টডকে সে নানা উপহার দিত যখনই সুযোগ আসতো। এরই ফলে মেরী একসময় নিজেকে মেরী টড ডগলাস বলে ভাবতে শুরু করেছিল। এক অনাস্বাদিত আনন্দে মেরীর মন তখন ভরে উঠত। মেরী তখন স্বপ্ন দেখতে চাইতেন হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হিসেবে ওয়ালজ নাচে অংশ নিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে ঘটনাপ্রবাহ একদিন অন্যখাতেই বয়ে গেল। ছোটখাট একটা মারামারির ঘটনা ঘটে গেল স্প্রিংফিল্ডে। এর পরিণতি ডগলাসের পক্ষে খারাপই হয়ে দাঁড়াল। এক পান্থশালায় বড় নৈশভোজের সময় মেরীরই এক বান্ধবীর স্বামীকে মারধর করলেন শিল্ডস ও স্টিফেন ডগলাস। ভদ্রলোক এক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। মদ খাওয়া তার একটু বেশি মাত্রাতেই হয়ে গিয়েছিল। ডগলাস কুৎসিত ভাষায় গালমন্দও করেছিলেন, খাবার ইত্যাদি লাথি মেরে ফেলে নষ্টও করেছিলেন। প্রচুর কাচের কাপ, প্লেট, গ্লাসও ভেঙে যায় ডগলাস ওয়ালজ নাচ নাচতে থাকায়। এ ঘটনার কথা শোনার পর মেরী টড ঘৃণায় শিউরে উঠেছিলেন। তার আভিজাত্যে দারুণ আঘাত লেগেছিল ডগলাসের কদর্য ব্যবহারের কথা শুনে। মেরী মনে মনে ঠিক করে ফেলেন ডগলাসেব মত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না।

ডগলাস অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরে অনুতপ্ত হয়ে মেরীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। মেরী তাতে টলেন নি। ডগলাস মেরীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু মেরী ঘৃণায় সে প্রস্তাব সোজা বাতিল করে দেন। মেরী কিছুতেই ডগলাসের ওই অভব্য আচরণ মেনে নিতে পারেন নি। মেরীকে বিয়ে করার আশা তাই ডগলাসের ব্যর্থ হয়ে গেল। মেরী কিছুতেই ক্ষমা করলেন না তাকে।

ব্যাপারটা এখানেই তখনকার মত মেনে নিলেও ডগলাস কিন্তু আশা ছাড়েন নি। তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন মাত্র। অত্যন্ত কৌশলী রাজনীতি সচেতন হওয়ায় তিনি সহসা মেরীর কাছে আর বিয়ের কথা জানাতে চাননি।

ডগলাসকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করেও মেরীর মনে অবশ্য শান্তি

ছিল না। ডগলাসের জনপ্রিয়তার কথা ওর জানা ছিল বলেই মেরী টড ভাবছিলেন কিছুদিন পরে ডগলাস আবারও হয়তো ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এগিয়ে আসবে, বিয়ের প্রস্তাবও করবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা একেবারেই ঘটল না। কিছুদিন অপেক্ষার পর মেরী বুঝতে পারলেন ডগলাস ওর জীবন থেকে এবার সত্যিই দূরে সরে গেছে। ও তবুও ডগলাসকে ঈর্ষান্বিত করার উদ্দেশ্যে খোলাখুলিভাবেই আব্রাহাম লিঙ্কনের দিকে ওর দৃষ্টি দিলেন। আঁকড়ে ধরতে চাইলেন লিঙ্কনকে। কিন্তু ডগলাস সে দিকে আর দৃষ্টিপাত করেন নি। মেরীর জীবন থেকে হারিয়ে গেলেন স্টিফেন ডগলাস।

মেরী এবার নিশ্চিত হয়ে গেলেন স্টিফেন ডগলাস চিরকালের মতই ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তিনি এবার তাই সত্যিকার আঁকড়ে ধরলেন আব্রাহাম লিঙ্কনকে। মনে মনে সেদিন শপথ নিয়েছিলেন আব্রাহামকে সে বিয়ে করবেই।

মেরী লিঙ্কনকে কাছে টেনে নিতে চাইলে লিঙ্কনও প্রায় আত্মসমর্পণ না করে পারলেন না। মেরীর কাছে তাকে প্রায়ই দেখা যেত কিন্তু তিনি থাকতেন নীরব শ্রোতা হয়েই। আসলে মেরীর বাকশক্তি আর রসজ্ঞান লক্ষ্যই যেন বাকহীন হয়ে যেতেন লিঙ্কন। প্রবল উচ্ছ্বাসে একরকম প্রায় ভাসিয়ে দিয়ে যেতেন লিঙ্কনকে মেরী। একথা মেরীর আত্মীয় স্বজনরাও স্বীকার করেছিলেন। অসম্ভব বাক-পটু ছিলেন মেরী এটা তারা ভালই জানতেন।

এই ভাবেই ১৮৪০ সালের একসময় তুজনে বাগদান করলেন পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন বলে।

।। দশম পরিচ্ছেদ ।।

লিঙ্কন ও প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে মেরী টড

মেরী টডের সঙ্গে বিয়ের বাগদান ঘোষণা করেছিলেন লিঙ্কন ১৮৪০ সালের একদিনে। এই সময় লিঙ্কন রাজনীতিতেও নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। অসাধারণ ভাবে তিনি জনগণের সামনে বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেকে প্রায় উজাড় করে দিতেন। ডেমোক্রাট দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে লিঙ্কনের জনগণকে উদ্দীপ্ত করার সে বক্তৃতা ছিল তুলনাহীন।

ডেমোক্র্যাট দলের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন মিঃ হুইগ। তার দেহে থাকতো অতি মূল্যবান চমক দেওয়া পোশাক, তাতে যেন কৌলীন্য আর ঐশ্বর্য ফুটে বেরোত। তার বক্তৃতার বিপক্ষে সাধারণ পোশাক পরিহিত লিঙ্কন রাখতেন জোরালো আকর্ষণীয় বক্তব্য : 'এই ইলিনয় গ্রামে আমি এসেছিলাম একজন অতি দীন উদ্বাস্তু হিসেবেই। আপনাদের কাছে এক অখ্যাত অপরিচিত মানুষ হয়ে। আমার জীবন চলত তলাচ্যাপ্টা নৌকায় নদীতে মাঝি হয়ে। মাসিক আয় বলতে মাত্র কয়েকটা ডলারই ছিল আমার সম্বল। পোশাকও ছিল হতমান দারিদ্রের উপযুক্ত। আমার নিজের বলতে ছিল কেবল আমার এই লম্বা শরীর আর দুটো সবল হাত। অতি সামান্য ভাবেই চলত আমার দিন। অর্থের প্রাচুর্য আমার ছিল না।। আজও নেই। আমি তাই দামী পোশাক কাকে বলে জানি না। সে পোশাক পরে আমি অপরাধী হয়ে উঠতে চাই না—।'

লিঙ্কনের ওই হৃদয় আকর্ষণকারী ভাষণে জনতা সত্যিই উদ্বেল হয়ে উঠল। তারা সেদিন বুঝতে পেরেছিল লিঙ্কন তাদেরই একমাত্র কাছের মানুষ। এই বক্তৃতা লিঙ্কনকে আরও জনপ্রিয় করে তুলল।

লিঙ্কনের চমৎকার বক্তৃতার কথা কানে গেল মেরী টডেরও। লিঙ্কন এরপর এডওয়ার্ডস দম্পতির বাড়িতে গেলে মেরী উচ্ছ্বাসে

আবেগে অস্থির করে তুললেন লিঙ্কনকে। লিঙ্কনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মেরী বললেন, 'তুমি আমার সত্যিকার গর্ব। ও: তুমি সত্যিই কত বড় মাপের বক্তা। আমি ঠিক বলছি তুমি একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে—।'

খুশি হলেন লিঙ্কনও। মেরীকে কাছে টেনে নিলেন তরুণ প্রেমিক আব্রাহাম লিঙ্কন। দুটি তরুণ হৃদয়ে সেদিন জ্বলতে শুরু করল নতুন প্রেমের দীপশিখা। নিজেকে সত্যিকার একজন সুখী মানুষ ভাবতে শুরু করলেন লিঙ্কন। ভালবাসার আশ্লেষে পূর্ণ হয়ে গেল মেরী টডের সমস্ত রমণীহৃদয়।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েও গেল দুজনের বিয়ের দিন। দিনটি ছিল আরও ছমাস পরে ১৮৪১ সালের ১লা জানুয়ারী।

কিন্তু এই ছমাসের মধ্যে যেন সবই ওলোটপালোট হতে যেতে চেয়েছিল দুটি তরুণ প্রাণের মনের গভীরে।

বিচিত্র এক ঘটনাও ইতিমধ্যে ঘটেছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনে। এই ঘটনায় লিঙ্কনের জীবন সংশয়ও হতে পারার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বহুদিন ধরেই খোঁচা দেওয়া মজা করার কাজে লিঙ্কন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একাজ তিনি ব্যঙ্গ রচনার মধ্যদিয়ে করতে পারতেন। এবার তিনি তার সেই ক্ষমতা রাজনীতিক দ্বন্দ্বেও ব্যবহার করতে চাইলেন। স্যাংগামন জার্নাল কাগজে লিঙ্কনের ইচ্ছামত লেখার অধিকার থাকায় তিনি সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন। বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে তিনি ছদ্মনামে আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করে চললেন। তীক্ষ্ণ, বিদ্রুপাত্মক ভাষায় লিঙ্কন লেখা চালাতে লাগলেন এক কাল্পনিক পত্র লেখিকা 'আন্ট বেকার' নামে।

লিঙ্কনের ওই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন রাজনৈতিক প্রতি-দ্বন্দ্বী সেই আইরিশ বংশের জেমস শিল্ডস।

পুরো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এক লজ্জাজনক অবস্থাতেই এসে পৌঁছে যায়। এটা না হলে লিঙ্কনকে হয়তো দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর্যায়ে আসতে হত না। শিল্ডস প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে লিঙ্কনকে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন।

লিঙ্কন শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলেন যাতে ঘটনা ওখানেই মিটে যায়, কিন্তু শিল্ডস কিছুতেই রাজি হলেন না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিন বন্ধুদের চেষ্টায় দুপক্ষই আত্মসংবরণ করেন। অসি নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর হয় নি। লিঙ্কন চরম বিপদ থেকেই উদ্ধার পেয়ে যান।

এই অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবশ্য দুটো ফল দেখা গেল। লিঙ্কন এরপর আর কখনই বেনামী চিঠিতে কাউকে আক্রমণ করতে চায় নি। মেরী টডও আবার নতুন দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন লিঙ্কনের সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে। মেরী টডের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়া ঘোষণা করার পর থেকেই দেখা গেল অন্য এক সমস্যা। লিঙ্কন যে পোশাক ইত্যাদি মার্জিত নন মেরী সেটা জানতেন তাই এবার তার চেষ্টা শুরু হল লিঙ্কনকে কেতাদুরস্ত বানানো। লিঙ্কনের পোশাকে চাকচিক্য আর রুচির স্পর্শ ছিল না বলেই ভাবতেন মেরী। যেমন তেমন ভাবেই প্যাণ্ট জামা পরতেন লিঙ্কন। মেরী নানা ভাবেই চেষ্টা করে চলেছেন লিঙ্কনকে শুধরে নেবার। কিন্তু লিঙ্কন ওসবে মোটেই আগ্রহ বোধ করতেন না তাই মেরীও সফল হলেন না। মেরী নিজে শিক্ষিতা, রুচিবান মহিলা হওয়ায় লিঙ্কনকে নিজের যোগ্য করে তুলতে চাইছিলেন বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়ায় লিঙ্কনেব কাছে চরম বিরক্তির কারণ।

মেরীর সমস্ত রকম গুণ হয়তো ছিল কিন্তু মানুষের মন জয় করার কৌশল তিনি মোটেই জানতেন না। বিপদ তাইতেই ঘটল। লিঙ্কনকে শুধরে নিতে না পারায় মেরীর একগুঁয়েমি ভীষণ বেড়ে উঠেছিল। তিনি প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে চাইতেন। বারবার রাগ করতেন লিঙ্কনের উপর, কড়া ভাষায় চিঠি লিখতেও চাইতেন তাকে। লিঙ্কন খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন মেরীর ব্যবহারে। এর ফলে তিনি এবার মেরীকে এড়িয়ে চলতেও শুরু করলেন। মেরীর সংস্পর্শে এলেই লিঙ্কনের মনে হত মেরী আবার চিৎকার শুরু করবে। এ অবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না লিঙ্কন। দুজনের জীবনে আস্তে আস্তে একটা অন্ধকার মেঘ ঘনিয়ে আসতে আরম্ভ করেছিল ওই সময়।

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দিল এর পরের কোন ঘটনা। এরই পরিণতি ডেকে এনেছিল এক দুঃখময় পরিস্থিতি। মেরী টডের সঙ্গে বিয়ের চুক্তি ভেঙে দিয়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৪১ সালের ১লা

জানুয়ারী। এ ছিল এক সত্যিই রহস্যময় ব্যাপার। এর কারণ আজও জানা যায় নি। এ ঘটনার অনেকটাই অন্ধকারে ঢাকা।

হঠাৎ একদিন স্প্রিংফিল্ড শহরে নতুন একটি মেয়ের আগমন ঘটে গেল। খুবই সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী চেহারা, অতি সহজ আর সরলতা ভরা মুখখানা তার। মেয়েটির নাম ম্যাটিলডা। সম্পর্কে সে মেরীরই দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়া। মেয়েটির সহজ আর নম্র স্বভাবের জন্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওই সময়। লিঙ্কন মেরীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় ম্যাটিলডাকে স্বভাবতই দেখেছিলেন। তারও কেমন ভাল লেগে যায় মেয়েটিকে। মেরীর তুলনায় হয়তো ম্যাটিলডা কম শিক্ষিতা, নাচে গানে আর বাকপটুতাতেও তেমন দক্ষ নয় সে, তবুও শিষ্টাচার আর ভব্যতা তার সহজাত বলেই বোঝা যেত। লিঙ্কন স্বভাবতই অজান্তে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন সে সময় ম্যাটিলডার প্রতি। ভালবাসার রঙীন ঝুরি যেন ফুটে উঠতে চাইছিল লিঙ্কনের মনে। মেরী ব্যাপারটা ঠিক লক্ষ্য করেছিলেন। ঈর্ষা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে শুরু করেছিল।

লিঙ্কনের কিছু কাজ আবার মেরীর ঈর্ষাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে বসল। একদিন লিঙ্কন মেরীর বদলে ম্যাটিলডার সঙ্গে নাচে অংশ নেওয়ায় মেরী অত্যন্ত অশোভন আচরণ শুরু করে দিলেন। লিঙ্কনকে কথা দিতে হল তিনি ম্যাটিলডার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারবেন না।

মেরীর ওই অশোভন ব্যবহারে লিঙ্কন মনে মনে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। লিঙ্কনের মনে একটু একটু করেই মেরীর প্রতি আকাঙ্ক্ষার ঘাটতি দেখা দিতে শুরু করল ওই সময় থেকে। মেরী তার আচরণের মধ্য দিয়ে তার প্রেমাস্পদকে দূরে ঠেলে দিতে আরম্ভ করেছিলেন অথচ নিজের আচরণ তিনি সংশোধন করতে চান নি। লিঙ্কন এই সময় ভাবতে শুরু করলেন মেরীকে জীবন সঙ্গিনী করে নেয়া সঠিক হবে কিনা। দুজনে সত্যিই দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা, শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য, মানসিক গঠন, দৃষ্টিভঙ্গী দুজনেরই একে-বারে আলাদা। বিয়ের পর বিপর্যয় যাতে না ঘটতে পারে তাই লিঙ্কন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলেন এ বিয়ে না করাই হয়তো সবদিক থেকে মঙ্গলজনক হবে। হয়তো দুজনে সুখী হতে পারবেন না,

সারা জীবন বহন করে চলতে হবে যন্ত্রণা। মেরীর আত্মীয় স্বজনও এই আশঙ্কা করে এ বিয়ে না করার পরামর্শই দিয়েছিলেন মেরী টডকে। কিন্তু জেদী একগুঁয়ে মেরী কারও কথাই কানে নিতে চাইলেন না। লিঙ্কনকে ছাড়া অন্য কাউকেই তিনি বিয়ে করবেন না। মেরী এ সময় যদি প্রেমের পরশ বুলিয়ে লিঙ্কনকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা চালাতেন তাহলে হয়তো সব ব্যাপারটাই সুখকর কোন পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু গ্রাম্য একগুঁয়েমি আর জেদের বশে একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর যেন গড়ে উঠল দুজনের মাঝখানে।

লিঙ্কন অসম্ভব যন্ত্রণা আর মনোকষ্টের স্বীকার হয়ে পড়লেন এই সময়। তিনি যে মেরীকে বিয়ে করতে পারবেন না একথাটা বলার মত সাহসও তার ছিল না।

প্রচণ্ড এক মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে আরম্ভ করলেন লিঙ্কন। কি করবেন, কি করা উচিত এ কথা হাজার ভেবেও ঠিক করতে পারছিলেন না তিনি। তিনি এমনই ভেঙে পড়লেন যে ঘর থেকেও বেরোতে চাইতেন না। এই সময় মিস ওয়েন্স নামে আর একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল লিঙ্কনের। মিস ওয়েন্সের বড় বোন লিঙ্কনেব সঙ্গে ছোট বোনেব বিয়ের কথাটাও তুলেছিলেন কিন্তু লিঙ্কন তাতে রাজি হয়নি। সে সময় প্রায় অসুস্থতার শিকাব হয়ে পড়েন লিঙ্কন।

লিঙ্কনের বন্ধুরা ব্যাপারটা বুঝেই তাকে উপদেশ দিল যেভাবেই হোক বিয়ে যদি না করতে চান লিঙ্কন তাহলে সেকথা স্পষ্ট করে মেরীকে জানিয়ে দেওয়াই সবদিক থেকে ভাল। লিঙ্কন তাতে রাজীও হন।

শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করেই লিঙ্কন মেরীর বাড়ীতে রওয়ানা হলেন। এর আগে মেরীকে চিঠি লিখে মনের কথা জানাতে চেয়েছিলেন লিঙ্কন, কিন্তু লিঙ্কনের অকৃত্রিম বন্ধু সেই স্পীডের কথায় সে পথ গ্রহণ করেন নি। স্পীড বলেছিলেন এভাবে লেখালেখির মধ্যে না যাওয়াই ভাল হবে। এটা ভবিষ্যতে তার রাজনৈতিক জীবনে ক্ষতি করতে পারে। হয়তো বা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে মেরীই কোনভাবে ওই চিঠির সাহায্যে বিপদে ফেলতে পারে লিঙ্কনকে।

লিঙ্কন শেষ অবধি তাই মন স্থির করেই মেরীকে জানাতে গেলেন যে এ বিয়ে অসম তাই না হওয়াই শ্রেয়ঃ। লিঙ্কনের বন্ধুরা অপেক্ষায়

রইলেন তিনি কখন ফিরে আসবেন আর তার মুখ থেকে ঘটনার কথা শুনবেন ভেবে। অনেক রাত হলে তবেই ফিরে এলেন লিঙ্কন। লিঙ্কনের তখনকার মুখস্মৃতিই প্রকাশ করে দিলো বন্ধুদের কাছে লিঙ্কন মোটেই সফল হয়ে ফিরে আসেননি।

ব্যাপারটা ঘটেছিলও অবিকল তাই। বন্ধুদের জেরার উত্তরে লিঙ্কন একে একে জানালেন তিনি মেরীকে সোজাসুজিই বলেছেন যে তাকে বিয়ে করতে পারছেন না কারণ দুজনের মনের মিল না হওয়ারই সম্ভাবনা। তিনি আর মেরীকে ভালবাসেন না।

লিঙ্কন আরও বললেন, 'আমার কথায় দারুণ আঘাত পেল মেরী আমার বুঝতে অসুবিধা হল না। মেরীর দুচোখ থেকে অবিরল জল ঝরতে শুরু করল। আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি। আমি—।' লিঙ্কন প্রায় কথা হারিয়ে ফেললেন।

লিঙ্কন যে কোথাও একটা বড় গোলমাল পাকিয়ে এসেছেন এটা বুঝে নিতে দেরী হল না স্পীডের।

স্পীডের জেরায় লিঙ্কন বলে ফেললেন মেরীর চোখের জল দেখে তিনি আর কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারেন নি। আর ওঁর নিজের চোখেও জল এসে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি ওকে কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করেও ফেলেছেন।

লিঙ্কনের কথায় নিঃসন্দেহে তাঁর বন্ধুরা তাজ্জব হয়ে যান। তারা পরিষ্কার উপলব্ধি করলেন লিঙ্কন যে কাজ করে এসেছেন তাতে বিয়েটা বাতিল তো বলা যাবেই না বরং বিয়ে করার মুখবন্ধই রচনা করে এসেছেন তার কাজের মধ্য দিয়ে।

বন্ধুরা তাই বেশ রাগতঃ ভাবেই জানালেন লিঙ্কনের পক্ষে এখন আর কোন রকমেই মেরী টডকে বিয়ে না করে পিছিয়ে যাওয়ার কণামাত্রও উপায় নেই। লিঙ্কনও বেশ বুঝতে পারলেন তিনি বেশ অপরিণামদর্শীর মতই কাজ করে এসেছেন।

শেষ পর্যন্ত লিঙ্কন নীরস কণ্ঠে বলে ফেললেন, 'আমি যখন কথা দিয়েই ফেলেছি মেরীকেই আমি তবে বিয়ে করব।' লিঙ্কন যেন কাঠের পুতুল, নিজেকে যেন ফাঁসি কাঠে ঝোলানোর আদেশ দিচ্ছিলেন তিনি।

লিঙ্কন যে শেষ পর্যন্ত মেরী টডকেই বিয়ে করছেন একথা

জানাজানি হতে দেরী হল না। মেরী টড নিজেকে সত্যিকার সুখী ভাবতেও শুরু করেছিলেন। তার দৃঢ় ধারণা হলো আব্রাহাম লিঙ্কনই হবেন এক সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আর মেরী টড হবেন দেশের প্রথমা নাগরিকা।

ইতিমধ্যে লিঙ্কনের জীবনে অবধারিত নিয়মেই যেন চলেছিল ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা। মেরী টডকে বিয়ের কথা জানিয়ে দিয়ে মনে কণামাত্রও শান্তির লেশ ছিল না লিঙ্কনের। অনেকেরই ধারণা এই সময় তাকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হন একমাত্র লিঙ্কনের অকৃত্রিম বন্ধু যশুয়া স্পীড। স্পীডও আশ্চর্যজনক ভাবে নিজের বিয়ের ব্যাপারে অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ লিঙ্কনই তাকে সাহস জুগিয়ে চললেন। স্পীড বিয়ে করার সাহস না পাওয়ায় লিঙ্কন তাকে বললেন এমন অনিচ্ছার কোন মানেই হয় না। স্পীড বাগদত্ত ছিলেন কেনটাকিতে ফ্যানি হেনিং নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। ফ্যানি হেনিং খুবই সুন্দরী, আর শিক্ষিতা। শেষ পর্যন্ত স্পীড লিঙ্কনকে জানালেন তিনি বিয়ে করছেন। বিয়ের পরে যে চিঠি এল তাতে স্পীড জানিয়েছিলেন বিয়েতে তিনি খুবই সুখী হয়েছেন। যশুয়া স্পীডের ওই চিঠিতে লিঙ্কন যেমন আনন্দলাভ করেছিলেন সে রকম আনন্দ তিনি সেই শোচনীয় ১লা জানুয়ারীর পর আর বোধ হয় পাননি।

এডওয়ার্ডস পরিবারে ইতিমধ্যে বিয়ে উপলক্ষ্যে পড়ে গিয়েছিল সাজসাজ রব। নতুন ভাবে সব সাজানো গোছানোর কাজ শুরু হল সেখানে। এইভাবেই সপ্তাহ আর মাসও কেটে চলল, ক্রমেই বিয়ের দিনও এগিয়ে আসতে লাগল।

এই বিয়ে এগিয়ে আসায় সবচেয়ে দুঃসময় দেখা দিল সম্ভবতঃ লিঙ্কনেরই। এক অজানা আতঙ্ক চেপে ধরতে চাইছিল লিঙ্কনকে। যত দিন এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার অস্বস্তি বাড়তে লাগল, যেন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন হাসিখুশি মানুষটি আর তার পিছিয়ে আসার মত কোন পথই খোলা ছিল না সামনে। লিঙ্কনের মানসিক স্থৈর্যও প্রায় ভেঙে পড়ার কিনারায় এসে দাঁড়াল। এ বিয়েতে তার যে সামান্যতম ইচ্ছাও ছিল না সেকথা শুধু প্রকাশ করতে না পেরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন লিঙ্কন।

এক সময় প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়ার লক্ষণ তার মধ্যে দেখা দিল। বিধানসভার সদস্য হয়ে মানসিক বিপর্যয় ঘটার ফলেই সেই বিধানসভার অধিবেশনেও যোগ দিতে পারলেন না আব্রাহাম লিঙ্কন। এটা ছিল তার জীবনের চরম এক অন্ধকারময় দিন।

এক সত্যিকার অন্ধকারাতেই যেন আটকে গেলেন লিঙ্কন নামের যুবকটি। কি করছেন কি বলছেন তার কোন স্থিরতা ছিল না। বিয়ের ভীতি তাকে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছিল সেদিন। জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা করায় যার প্রায় জুড়ি ছিল না সেই মানুষটি প্রায় কথা বলতেও ভুলে গেলেন। শূন্য দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে থাকতেন সামনের দিকে। খাওয়াতেও রুচি ছিল না, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আর কথা বলাতেও ছিল বিতৃষ্ণা। যেন অবসাদের আর মৌনতার প্রতিমূর্তি। লিঙ্কনের চিরকালের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা বলেছিলেন এমন বিষাদময় পুরুষ তারা কোনদিনই আগে দেখেন নি।

লিঙ্কন শুধু ভাবনার অতল গহ্বরেই তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিলেন সে সময়। একমাত্র ভাবনা ছিল দুঃখময় জীবন আরও দুঃখে না ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অসম বিয়ের ফলে। হয়তো বিয়ে করার ফলে নতুন অশান্তির সৃষ্টি হবে সে ধাক্কা আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। সাধারণ চিকিৎসায় কোন ফলই হল না। ক্রমশঃই অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠতে চললো।

এদিকে সময় কেটে চলেছিল স্বাভাবিক নিয়মে। বিয়ের নির্দিষ্ট দিনটিও এগিয়ে এল যথাসময়ে। ১৮৪১ সালের ১লা জানুয়ারী, বিয়ের নির্দিষ্ট তারিখ। মেরী টডের বাড়িতে উৎসবের আমেজ জেগে উঠল। পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল না। নানা রকম প্রয়োজনীয় আসবাব আর জিনিসপত্র এসে পৌঁছতেও শুরু করেছিল এডওয়ার্ডস পরিবারের বাড়িতে। নিমন্ত্রণ করাও যথারীতি শেষ। নামী গণ্য মান্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হলেন। নানা সুখাদ্য পরিবেশন করা হবে বলে তারও ব্যবস্থা করা হলো। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সারা শহরেই উৎসবের আমেজ ফুটে উঠল। সময় এগিয়ে এল। এক সন্ধ্যা লগ্ন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের সমাবেশ ঘটতে শুরু হল বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। এক আনন্দঘন শুভ মুহূর্তের জন্যই সকলে উদগ্রীব।

কিন্তু এর পরেই সকলে একটু একটু করে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন। সাতটা বেজে গেলেও বরের দেখা মিলল না। উৎকণ্ঠিত এডওয়ার্ডস পরিবারে গুঞ্জন উঠল 'লিঙ্কন আসছেন না কেন? কোন বিপদ ঘটেছে? কোন অভাবিত দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সে?' এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর কারোরই অবশ্য জানা ছিল না। উৎকণ্ঠা তাই ক্রমশঃ বেড়ে চলল। সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত মেরী টড। বারবার অধীর আগ্রহে তিনি পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন 'কেন লিঙ্কন এখনও এসে পৌঁছলেন না।' রাত ক্রমে বেড়ে ওঠায় শেষ পর্যন্ত এই ভাবনাই সকলের কাছে তীব্র হয়ে উঠল কিছু একটা অঘটন কোথাও নিঃসন্দেহে ঘটেছে যার জন্যই লিঙ্কন এলেন না। অতিথিরাও বিব্রত হয়ে পড়লেন। আহারে কারও রুচি রইল না।

বিয়ে বাড়িতে একটা বেদনাময় ব্যথাতুর পরিবেশ যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠলো। মেরী টড কান্নায় ভেঙে পড়লেন। লজ্জা যে তারই বেশি, কারও কাছে মুখ দেখানো যাবে না এবার। সমাজে সবাই ওকে করুণার দৃষ্টিতে দেখতে চাইবে, সমবেদনা জানাবে এ পরিস্থিতি সত্যিই অসহ্য। হয়তো বা আড়ালে তারা হাসাহাসিও করতে শুরু করবে। লিঙ্কন এভাবে তাকে লজায় ফেলে দেবেন কল্পনাও করেন নি মেরী।

সকলেই হতচকিত আর বিমূঢ় হয়ে কি করণীয় সেই আলোচনা করতে শুরু করলেন। নিশ্চিত কোন বিপদে পড়েছেন লিঙ্কন। হয়তো কোন দুর্ঘটনাই ঘটেছে। নাকি তিনি বিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথটাই বেছে নিলেন কে বলতে পারে। চোখের জল বাধা মানছিল না মেরীর। দীর্ঘ নীল চোখের তারায় তার অতলান্ত বেদনার ছায়া।

শেষ পর্যন্ত এডওয়ার্ডস পরিবারের লোকজন বেরিয়ে পড়লেন লিঙ্কনকে খুঁজে বের করতে। এছাড়া করণীয় আর যে কিছুই ছিল না। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাই তারা প্রায় চষে ফেললেন লিঙ্কনের হদিশ খুঁজে বের করতে।

, এই ভাবেই কেটে গেল বিয়ের লগ্ন।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

হতাশায় আচ্ছন্ন লিঙ্কন ● মেরী টডের সঙ্গে পুনর্মিলন

১৮৪১ সালের ১লা জানুয়ারী লিঙ্কন ও মেরী টডের বিয়ের অনুষ্ঠান দুঃখজনক ভাবেই শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। লিঙ্কন বিয়ের অনুষ্ঠানে শেষ অবধি উপস্থিত হতে ব্যর্থ হতেই দুঃখময় ঘটনাটি ঘটেছিল। লিঙ্কনের খোঁজে তোলপাড় হয়ে চলল এরপর সারা শহর। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল লিঙ্কনকে প্রায় অবশ, উন্মত্ত অবস্থায় তার অ্যাটর্নী-অফিসেই। প্রায় বিকারগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন লিঙ্কন।

লিঙ্কনের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা ভীত হয়ে পড়লেন সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে গেছেন লিঙ্কন। মেরী টডের আত্মীয়স্বজন লিঙ্কনের ওই অবস্থা দেখে বলাবলি করতে লাগলেন এ বিয়ে না হওয়াই ভাল কারণ পাত্র বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। একথা বলা ছাড়া তাদেরও সমাজে মুখ দেখানোর উপায় ছিল না। এডওয়ার্ডস পরিবারের কাছে এ ঘটনা চরম লজ্জাজনক আর অপমানের তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

এই সময় সত্যিই আব্রাহাম লিঙ্কন এই দুঃসহ ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। অ্যান রুটলেজের অকাল মৃত্যুর পর লিঙ্কনের যে ধরণের মানসিক অবস্থা দেখা দিয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাই যেন আবার ফিরে এসেছিল লিঙ্কনের জীবনে। মানসিক অবস্থা তার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি বারবার আত্মহত্যা করবেন বলে সকলকে জানাচ্ছিলেন। ডঃ হেনরি নামে বিখ্যাত একজন ডাক্তারকে শেষ পর্যন্ত খবর দিয়ে জানানো হল। ডাক্তারের পরামর্শ মতই বন্ধুরা সবসময় চোখে চোখে রাখতে শুরু করলেন লিঙ্কনকে। সামান্য সময়ের জন্যেও তারা তাকে চোখের আড়াল করতেন না এমন কি সামান্য ছুরিও কাছাকাছি রাখতেন না পাছে লিঙ্কন সত্যিই তাই দিয়ে আত্মহত্যা করে বসেন।

ডাক্তার আরও পরামর্শ দিলেন লিঙ্কনকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য

আবার কাজের মাঝখানেই নিজেকে সঁপে দিতে হবে। তিনি বললেন লিঙ্কন যেন আবার বিধান সভার অধিবেশনে নিয়মিত যোগদান করতে থাকেন। লিঙ্কন অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তা নিয়মিত কখনই নয়। তার অনুপস্থিতি আর অসুস্থতার কথা বিধান সভায় জানানো হয় এ সময়।

বেশ কয়েক মাস এই অভাবিত বিপর্যয়ের মধ্যে কেটে গেল। লিঙ্কন তখনও সুস্থ হতে পারেন নি। বিষাদের প্রতিমূর্তি লিঙ্কন কোন ভাবেই নিজেকে সামলে নিতে পারলেন না। এই সময় নিজের মানসিক যন্ত্রণা বিস্মৃত হওয়ার জন্যই তিনি একখানি চিঠিও লিখে-ছিলেন তার আইন ব্যবসার অংশীদারকে। সে চিঠিতে ছিল লিঙ্কনের মানসিক যন্ত্রণার পরিষ্কার একটা ছবি। তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন তার মনে নরকযন্ত্রণা হয়ে চলেছে হয়তো কোনদিন সেই যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি নেই। হয়তো সারা জীবন ধরেই সেই যন্ত্রণার দাবদাহ তাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

এই চিঠির প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছিল দুঃখ পীড়িত, যন্ত্রণায় দগ্ধ একজন যুবকের বেদনার আর্তি। লিঙ্কন সেই চিঠিতে যে বিষাদ ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছিলেন পৃথিবীতে এর কোন দ্বিতীয় নেই। জীবন বা মৃত্যু যে তার কাছে সমার্থক একথাই সেদিন লিখেছিলেন লিঙ্কন। নিজের মৃত্যুর কথাই যেন বারবার বলতে চেয়েছিলেন তিনি। জীবন সম্পর্কে তার সেদিন সত্যিই কোন রকম আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা ছিল না।

লিঙ্কনের সে সময়কার মানসিক অবস্থায় সবচেয়ে দুঃখ বোধ করেছিলেন তার শ্রেষ্ঠতম সুহৃদ যশুয়া স্পীড, স্প্রিংফিল্ডে যার দোকান ঘরে প্রথম আশ্রয় লাভ করেন আব্রাহাম লিঙ্কন। লিঙ্কনের ওই পরিণতি দেখে নিদারুণ ভয় পেয়ে স্পীড একরকম জোর করে তাকে নিজের গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে রেখে এলেন। সেখানে এক-রকম নির্জন বাস চলেছিল লিঙ্কনের। গ্রামের প্রকৃতিই একমাত্র সঙ্গী ছিল লিঙ্কনের। একখানা বাইবেল ছিল লিঙ্কনের নিত্য সঙ্গী। বই পড়া আর গভীর অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকাই ছিল লিঙ্কনের সময় কাটানোর পথ।

কিন্তু ইতিমধ্যে মেরী টডের জীবন কোন খাতে বইছিল? ইতি-

মধ্যে দীর্ঘ একটা বছর অতিক্রান্ত। লিঙ্কন প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন মেরী টডকে। কিন্তু মেরী ভোলেন নি। লিঙ্কন যেখানে অবহেলা আর উদাসীনতার মধ্য দিয়ে মনে মনে চাইছিলেন মেরী টড তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাক, মেরীর জেদ আর প্রচণ্ড ক্রোধ সেখানে তাকে আরও কঠিন সঙ্কল্প নিতে উৎসাহ জোগাতে চাইছিল।

লিঙ্কন এটাও ভেবেছিলেন তার অনাগ্রহ আর উদাসীনতায় যদি কোন ভাবে মেরী অন্য কারও প্রতি আগ্রহী হতো তাহলে তার চেয়ে বেশি সুখী বোধ হয় কেউই হতেন না। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল ঠিক উল্টোটাই। মেরীর আভিজাত্য আর রুচিতে চরম আঘাত করেছিলেন লিঙ্কন আর তাতেই অহঙ্কারী মেরীর একগুঁয়েমি আরও বেড়ে উঠল। লিঙ্কন ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে সে চায় না, তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। মেরীর সেই ধারণা আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তিনি যাকে বিয়ে করবেন সেই হবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর সে সম্ভাবনা যে লিঙ্কনের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি মেরী সেটা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করতেন। লিঙ্কনকে বিয়ে না করলে তার পক্ষে যে আমেরিকার প্রথমা নাগরিকা হওয়া যাবে না এটা জানতেন মেরী টড। তাই তার শপথ হয়ে দাঁড়াল অটল, সঙ্কল্পে অবিচল মেরী।

মেরীর সঙ্কল্পে অনড় অবিচল হয়ে ওঠার জন্য ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছিল অনেকেই। এরা বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় হাস্যহাসি করেছিল একদিন মেরীকে নিয়ে। মেরী সেকথা ভুলতে পারেন নি। তার আত্মসম্মানে নিদারুণ ঘা লেগেছিল বলেই এটা তাকে আরও কঠিন সঙ্কল্পে বলীয়ান করে তুলেছিল। তার প্রতিজ্ঞা তাই যেভাবে যেমন ভাবেই হোক লিঙ্কনকে তিনি বিয়ে করবেনই আর তার সমালোচকদের উপযুক্ত জবাব দেবেন এই পথেই। এখন শুধু নিরবিচ্ছিন্ন অপেক্ষার কাল জানতেন মনে মনে মেরী টড।

মেরীকে ভুলে যাওয়ার জন্য লিঙ্কনও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। তিনি এই উদ্দেশ্যে চেয়েছিলেন অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করতে। এমনই একজন হল সারা রিকার্ড। লিঙ্কন একসময় যে বোর্ডিং হাউসে বাস করেছিলেন তারই মালিক মিসেস বাটলারের বোন সারা। কিন্তু লিঙ্কন সারাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেও সারা রিকার্ড তাতে রাজি হয়নি। লিঙ্কনের সঙ্গে সারার বয়সের তফাৎ ছিল অনেক।

সারার বয়স হয়তো ষোল বছরের বেশি ছিল না। সারা জানাল এই অসম বিয়েতে সে রাজি নয়। লিঙ্কনকে সে ভাই ছাড়া অন্য—কিছু ভাবতে পারে না।

লিঙ্কন এখানেও ব্যর্থ হয়ে আবার নিজেকে আস্তে আস্তে স্প্রিংফিল্ড জার্নালে লেখালেখির কাজ শুরু করেছিলেন। এই সময় একটু একটু করে তিনি মানসিক বিপর্যয়ের ভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন। স্প্রিংফিল্ড জার্নালের সম্পাদক সিমিয়ন ফ্রান্সিস খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কনের।

সিমিয়ন ফ্রান্সিসের স্ত্রী মিসেস ফ্রান্সিস এই সময় বিচিত্র একটি কাজ করে বসেন যার পরিণতি মধুর হয়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন আর মেরীর মধ্যে পুনর্মিলন সংগঠিত হয় একদিন এরই ফলে। দুই বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে প্রণয়ী প্রণয়িনীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য নিয়েই একদিন মিসেস সিমিয়ন ফ্রান্সিস আব্রাহাম লিঙ্কনকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। মিসেস সিমিয়ন ফ্রান্সিস পছন্দ করতেন লিঙ্কনকে। তিনি সিমিয়ন ফ্রান্সিসের উপযুক্ত সহধর্মিনী ছিলেন। লিঙ্কনও শ্রদ্ধা করতেন মহিলাটিকে। লিঙ্কনের জীবনের সমস্ত কাহিনী জানতেন মিসেস ফ্রান্সিস, মেরীকেও চিনতেন। তাই তিনি লিঙ্কনকে ওই নিমন্ত্রণ করলেন।

লিঙ্কন মিসেস ফ্রান্সিসের ওই আমন্ত্রণ পেয়ে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বলাই বাহুল্য। অবশ্য আমন্ত্রণ তিনি আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

যথাসময়ে লিঙ্কন সিমিয়ন ফ্রান্সিসের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তারিখটা ছিল ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসের একদিন। মিসেস সিমিয়ন যথারীতি আপ্যায়ন করে লিঙ্কনকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। লিঙ্কন তখনও জানতেন না এরকম আচমকা আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য কি হতে পারে।

সরল বিশ্বাস নিয়েই লিঙ্কন ঘরে ঢুকলেন। আর তখনই পেলেন জীবনের এক পরম চমক।

ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট স্বয়ং মেরী টড। সেই মেরী টড যার সান্নিধ্য এড়িয়ে থাকার জন্য লিঙ্কন প্রায় আত্মহননের পথেও যাবেন বলে একসময় ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন।

মেরী টড লিঙ্কনের আগমণের অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন যেন। ওই মুহূর্তে কিন্তু দুই প্রেমিক-প্রেমিকা বাক্য হারা, স্তব্ধ হয়ে শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ঘরে আর কেউই তখন ছিল না, মিসেস সিমিয়ন ফ্রান্সিস এর আগেই গোপনে স্থানত্যাগ করে দুজনকে বোঝাপড়া করারই যেন সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে তেমন নির্দিষ্ট কোন বিবরণ কারও জানা নেই। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে ধারণা করে নেওয়া যায় মেরী টড হয়তো তার প্রেমিককে কাছে টেনে নিতেই সক্ষম হয়েছিলেন। হয়তো লিঙ্কনও তার ভুল বুঝতে পেরে মেরীকে ভালবাসায় কাছে টেনে নিতে দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু এরপরেও দুজনের দেখা সাক্ষাৎ নিয়মিত ভাবে হলেও তারা গোপনেই পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হতেন। এ গোপনীয়তা মেরীর ইচ্ছাতেই হতো তাতে সন্দেহ নেই। এই ভাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার ব্যাপার এডওয়ার্ডস পরিবারের সকলে জানতেন।
মেরী তাদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে ছিলেন তিনি চান না আবার কোন ভাবে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে সকলের কাছে তিনি হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠেন। আবার কোন কারণে তাদের মিলন বিঘ্নিত হলে তা যেন লোক চক্ষুর আড়ালেই থেকে যায় যেন মানুষের তামাশার খোরাক না হয়।

শুধু এটুকুই নয় দীর্ঘদিনের মানসিক যন্ত্রণা আর বিরহ মেরীকে বেশ দৃঢ়চেতা করেও তুলেছিল। আগেকার কিশোরী সুলভ চপলতা আর সারল্য যেন অনেকটাই সুপ্ত হয়েছিল মেরীর মন থেকে।

মেরী তাই ওর দিদির প্রশ্নের জবাবে গোপনীয়তা সম্পর্কে বলেছিলেন ; 'আমি চাই না বিষাক্ত কোন নিঃশ্বাসে আমাদের দুজনের স্বর্গীয় ভালবাসা কোন ভাবে আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

মেরী আর লিঙ্কনের মধ্যে স্বভাবতই যেন একটা নতুন সমঝোতা গড়ে উঠল দ্বিতীয় এই সাক্ষাৎকারের পরিণতিতে। এর কৃতিত্ব অবশ্যই দাবী করতে পারেন মিসেস সিমিয়ন ফ্রান্সিস। মেরীর অনুরোধে লিঙ্কনও এবার দুজনের প্রেমের মর্যাদা দানে স্বীকৃত হলেন। দুজনের প্রেমের সম্মান রাখার জন্য সততারই যে প্রয়োজন মেরী লিঙ্কনকে সেটা উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। একটা নির্দিষ্ট পরিণতিরই

অপেক্ষায় রইলেন দুজনে। যে পরিণতি সেই ভেঙে যাওয়া বিয়ে দুজনেই তা জানতেন।

লিঙ্কন আর মেরীর পুনর্মিলন কাহিনী অবশ্য অনেকেই জেনে নিতে পেরেছিলেন। শহরের অনেকেই কথাটা শুনে এবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন শুভ সংবাদ কবে জানতে পারবেন।

লিঙ্কনের একান্ত শুভানুধ্যায়ী বিলি হার্নডন লিঙ্কনের দ্বিতীয় দফার ওই ভালবাসার বিষয়ে আলোকপাত করেন এই বলে, 'আমি এবার দৃঢ় নিশ্চিত যে মিঃ লিঙ্কন তার পূর্বতন প্রণয়িনী মেরী টডকেই বিয়ে করবেন কথা দিয়েছেন তাকে। এটা যে তার পক্ষে আদৌ গৃহের শান্তি রক্ষার কাজ করবে না এটাও ধ্রুব সত্য। নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল মিঃ লিঙ্কন। তিনি ভালই জানতেন মেরী টডকে তিনি মন থেকে ভালবাসেন না। তাই শুধুমাত্র কথা রাখতেই তিনি বিয়ে করতে চলেছেন তাকে। এক হতাশাতেই তাই তিনি আছন্ন, ব্যক্তিগত সুখ হয়তো তার এ জীবনে আর হবে না।'

লিঙ্কন গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন এই সময়। তার কাছে মেরী টডকে দান করা কথার মর্যাদা রক্ষার বিষয়টাই বড় হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা আর তিনি মনে রাখলেন না। নিজেকে চিরদিনের জন্যই যেন যূপকাষ্ঠে বলিদানের ব্যবস্থাই পাকাপাকি করে ফেলতে চলেছিলেন লিঙ্কন। ইতিহাস সাক্ষী, আব্রাহাম লিঙ্কন এই বিয়ের পরেই চিরকালীন দুঃখের আর যন্ত্রণার বোঝা বয়ে বেড়িয়েছিলেন। সারাটা জীবনের মতই সুখী গৃহকোণের শান্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন।

লিঙ্কনের সত্যিকার বন্ধু ছিলেন সেই যশুয়া স্পীড। যেকোন কাজ করার আগেই তিনি স্পীডের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলতেন না। মেরী টডের সঙ্গে ঘটে যাওয়া পুনর্মিলনের সমস্তটাই লিঙ্কন জানালেন স্পীডকে, জানতে চাইলেন তার কর্তব্য কি হওয়া উচিত। স্পীড সব শুনে জানালেন এটা লিঙ্কনেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তার মনে হয় লিঙ্কন এবার বিয়ে করলে সে বিয়েতে অনেক বেশি সুখী হবেন।

লিঙ্কন মেনে নিলেন বন্ধুর উপদেশ। তিনি মেরীকে এবার জানালেন তিনি সত্যিই তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। সেদিন ছিল শুক্রবার। ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ।

মেরী আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন লিঙ্কনের প্রস্তাব শুনে। এবার তার মনের গোপন সেই ইচ্ছা সফল হতে চলেছে। এটাই যে তার আমেরিকার প্রথমতমা নাগরিকা হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। মেরী তাই লিঙ্কনকে জানালেন বিয়ের অনুষ্ঠান হোক এইদিনেই। তিনি আর দেরী করতে রাজি নন একেবারেই। কারণ কে বলতে পারে লিঙ্কন আবারও তার মত বদল করে হাস্যাস্পদ করে তুলবেন না মেরীকে?

লিঙ্কন শুক্রবার বলে ওই দিন বিয়েতে আপত্তি তুলেও ছিলেন তাছাড়া তৈরি হওয়ার মত অবকাশও যে ছিলনা।

মেরী তার সেই জেদই আঁকড়ে রইলেন, শুক্রবার হলেও বিয়ে ওই দিনই হবে। তিনি আর কণামাত্রও দেরী করবেন না। অদ্ভুত সমাপতন, ওই দিনেই মেরী টড চব্বিশ বসন্তে পা রেখেছিলেন তার জন্মদিনে।

লিঙ্কনকে তাই রাজী হতে হল ওইদিন বিয়ে করতে। মেরীর তাগাদায় তাকে যেতে হল মেরীর সঙ্গে স্বর্ণকারের দোকানে বিয়ের আংটি কেনার জন্য। মেরী পছন্দ করে সেই আংটি কিনলেন, লিঙ্কন কোন আপত্তি করলেন না। আংটিতে খোদাই করে নেয়া হল 'প্রেম মৃত্যুহীন' কথাটা।

বিয়ের লগ্ন এবার সত্যিই কাছে এগিয়ে এল। লিঙ্কনের অনুরোধে জেমস মেথিনী হয়েছিলেন প্রধান বরকর্তা। লিঙ্কন মনের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন জেমস মেথিনীর কাছে। তিনি তাকে বলেছিলেন, 'জেমস, শুনলে আশ্চর্য হবে, আমি সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করতে চলেছি—।'

বিকেল হল। আব্রাহাম লিঙ্কন নিজেকে বিয়ের জন্য তৈরি করতে শুরু করলেন। তিনি যাত্রা করবেন বাটলার দম্পতির বাড়ি থেকে। পাত্রের যোগ্য পোশাকে নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন লিঙ্কন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা মনেপ্রাণে যেন সাড়া পাচ্ছিলেন না লিঙ্কন। তার তখনকার মনোভাব ছিল যেন বধ্যভূমিতেই চলেছেন তিনি। সম্পূর্ণ নিরানন্দভঙ্গীতেই বিয়ে করতে চললেন আব্রাহাম লিঙ্কন।

মেরী টডও আগেকার সমস্ত সংস্কার ঝেড়ে ফেলে নিজেকে তৈরি করছিলেন। আগেকার বিয়ে উপলক্ষ্যে তৈরি পোশাক বাতিল করে সাধারণ সিল্কের পোশাক পরলেন তিনি। কোন জাঁকজমক হতে

দিলেন না বিয়েতে।

কিন্তু তবু বিয়ে বিয়েই। কন্যাপক্ষর বাড়িতে উৎসবের আমেজের অভাব ছিলনা। তবে প্রায় হঠাৎ বিয়েটা হতে চলেছিল বলে তাড়াহুড়ো যেন বড় বেশি প্রকট যা খুবই স্বাভাবিক। মেরীর বড় বোন মিসেস এডওয়ার্ডস তাই বলেছিলেন, 'মেরীর বিয়ের খবর পেলাম মাত্র ক'ঘণ্টা আগে। নিজেকে তৈরি করতে খুবই ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলাম। অতিথি আপ্যায়ন করা খুবই সমস্যায় ফেলে দেয় আমাকে ..।'

বিয়ে করার উদ্দেশ্যে লিঙ্কন এবার হাজির হলেন এডওয়ার্ডসের বাড়িতে। অতিথি অভ্যাগতরা এসে পড়েছিলেন ততক্ষণে। এলিজাবেথ ও নিনিয়ান এডওয়ার্ডসের বাড়িতে আব্রাহাম লিঙ্কন আর মেরী টড যারা অভ্যাগত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাদের সামনে সুখে, দুঃখে, ঐশ্বর্যে বা দারিদ্র্যে সুস্থতা বা অসুস্থতায় পরস্পরের হয়েই থাকবেন বলে স্বামী-স্ত্রী হওয়ার শপথ নিলেন। যাত্রা শুরু হল লিঙ্কন দম্পতির জীবনের আনন্দময় আর বন্ধুর পথের দিকে। মেরীর মনে জাগল সেই আশা—তাঁদের এবার পৌঁছতে হবে হোয়াইট হাউসে, যেখানে লিঙ্কন হবেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আর মেরী 'ফাস্ট লেডি।'

১৮৪২ সালের ৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ সেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষও হল এক সময়। মেরী হলেন মেরী টডের পদবী বদল করে মেরী লিঙ্কন।

বিয়ের সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বরপক্ষের প্রধান জেমস মেথিনী বলেছিলেন, 'লিঙ্কন বিয়ে করতে এসেছিল ঠিকই তবে তাকে তখন মনে হচ্ছিল সে বোধ হয় জবাই হলে চলেছে—।'

লিঙ্কন নিজের সম্পর্কে যে সন্দিহান ছিলেন সেকথাও তারই কথায় বোঝা গিয়েছিল। কোন একজন স্যামুয়েল মার্শালকে এক চিঠিতে লিঙ্কন লিখেছিলেন, 'এই বিয়ের ব্যাপারে শেষ অবধি রাজি হওয়া আর বিয়ে করাটাও আমার জীবনের সত্যিই এক বিস্ময়ের ব্যাপার বলেই আমার মনে হয়।'

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

অসুখী লিঙ্কনের বিয়ের পরবর্ত্তী জীবন

বিয়ের পর লিঙ্কন নিউ সালেমের বেশ কিছু দূরে কোন এক বোর্ডিংএ বাস করেছিলেন। সেই বোর্ডিংয়ের মালিকানা ছিল বৃদ্ধ জিমি মাইলস নামে একজন মানুষের হাতে। এর নাম ছিল 'গ্লোব পান্থশালা' সপ্তাহে লাগত চার ডলার।

লিঙ্কন মেরীকে বিয়ে করে আদৌ সুখী হতে পারেন নি বৃদ্ধ মাইলস সে কথাই জানিয়ে ছিলেন। একদিন বিচিত্র আর দুঃখজনক ব্যাপার ঘটে যায়। বৃদ্ধ মাইলস সেদিনের ঘটনা এই ভাবেই বর্ণনা করেন।

'লিঙ্কন সেদিন সকালে অনেকের সঙ্গে নিজেরই ঘরে প্রাতরাশ সমাধা করছিলেন। নানা আলাপ আলোচনা আর কথাবার্তার মাঝ খানে কোন কারণে প্রায় রাগে ক্ষেপে উঠলেন তার স্ত্রী মেরী লিঙ্কন। ভয়ঙ্কর সেই রাগ। লিঙ্কনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েও শান্ত হলেন না মেরী লিঙ্কন, প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে সমাপ্ত খাবারের প্লেট কাপ ছুঁড়ে ফেলেদিলেন। শুধু তাতেই থামলেন না তিনি, গরম কফি ভর্তি কাপ ঢেলে দিলেন লিঙ্কনের দেহে। সমস্ত পোশাক তার নষ্ট হয়ে গেল।'

'এ এক অভাবিত দৃশ্যের অবতারণা করল আমাদের সকলেরই চোখের নামনে। একটা কথাও বললেন না লিঙ্কন। পরম দুঃখে আর অপমানে মাথা নিচু করেই বসে রইলেন। কোন কিছুই বললেন না মেরী লিঙ্কনকে। আমার স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত তোয়ালে দিয়ে মুছে দিলেন কফির দাগ। এই ঘটনা বোধ হয় বুঝিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট যে লিঙ্কনের বিবাহিত জীবন কি রকম আনন্দের হয়ে উঠেছিল। মেরী যে বিয়ের পর তার সেই পুরনো জেদ আর রণরঙ্গিনী রূপই ফিরে পায় এই ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।'

বিয়ের পর আইনজীবি হিসেবে যথারীতি কাজ করে চলেছিলেন লিঙ্কন। এজন্য তাকে থাকতে হত স্প্রিংফিল্ডেই। অত্যন্ত দুঃখের

কথাই বলতে হবে, লিঙ্কন এই কাজে লেগে থাকার জন্য বাড়িতে যেতেন বেশ কমই। আসল কথা এই যে বাড়িতে শান্তির স্পর্শ পেতেন না লিঙ্কন। মেরীর তীব্র গঞ্জনা, চিৎকার আর অসহনীয় মেজাজে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন লিঙ্কন। আশেপাশের বাড়ির লোক-জনেরাও মেরীর কুৎসিত চিৎকার শুনতে পেতেন। একগুঁয়ে জেদী মেরীর চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে বাড়িতে টিঁকতে পারতেন না বেচারি আব্রাহাম লিঙ্কন। এই কারণে বাড়িতে আসতে তার প্রায় অনিচ্ছা জেগে উঠত। মেরীর বিচিত্র চরিত্রে লিঙ্কনের প্রতি যতটুকু ভালবাসা ছিল সবটাই যেন বিয়ের পর ঘৃণায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

রেগে গেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন মেরী লিঙ্কন। সমস্ত রাগ স্বভাবতই গিয়ে পড়ত শান্ত অবিচলিত লিঙ্কনেরই উপর। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে মেরী লিঙ্কনের চেহারা নিয়েও তাকে বাক্যবানে বিদ্ধ করতে চাইতেন। বিশেষ করে লিঙ্কনের দীর্ঘ দুটো হাত, ঠোঁট আর নাক নিয়ে। এ এক বিচিত্র জীবন ছিল লিঙ্কনের। কিন্তু মেরীর ওই কদর্য স্বভাব সত্ত্বেও লিঙ্কন কোন উচ্চবাচ্য আদৌ করতেন না সবকিছুই নীরবে মেনে নিতেন। এতে মেরী যেন আরও রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করতেন।

পারিবারিক জীবনে অশান্তির ছায়া থাকা সত্ত্বেও আইন ব্যবসায়ে অমনোযোগী হননি লিঙ্কন। আইনজীবির ভূমিকায় তিনি তিনজন মানুষের অংশীদার হয়েছিলেন। এদের প্রথম জন হলেন জন. টি. স্টুয়ার্ট, তারপর স্টিফেন টি. লোগান আর সবশেষে উইলিয়াম এইচ. হার্নডন। ১৮৪১ সালে স্টুয়ার্ট-লিঙ্কন আইনব্যবসা ভেঙে যাওয়ার পর লিঙ্কন লোগানের সঙ্গে যোগ দেন। ইলিনয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও লোগানের সঙ্গে লিঙ্কনের অনেক বিষয়ে বেশ মিল ছিল। লোগান ছিলেন রোগা চেহারার মানুষ, মাথার চুল অবিন্যস্ত। তবে তিনি মামলা সংক্রান্ত নথীপথ খুবই যত্নের সঙ্গে তৈরি করতেন। লোগানই লিঙ্কনের অসাবধানে কাজ করা কিভাবে এড়িয়ে চলতে হয় আর আইনের বইপত্র কিভাবে ব্যবহার করা দরকার তাই শিখিয়েছিলেন। এর ফলেই লিঙ্কন আগের চেয়ে অনেক ভাল আইনজীবি হয়ে ওঠেন। অথচ এই লোগানই পরে এক সময় লিঙ্কন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এক সাধারণ আইনজীবি!

আইনের জ্ঞান ওর কোনদিনই ভাল ছিল না।'

১৮৪৪ সালে লোগান সম্পর্ক ছিন্ন করলে লিঙ্কন বিলি হার্নডনকে তার অংশীদার হতে আহ্বান করেছিলেন। বিলি হার্নডন তখন ছাব্বিশ বছরের যুবক। তিনি খুবই অবাক হয়ে গেলেন এতে। তিনি নিজেই বলেন, 'আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, ক্ষমতাও না তাই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।' কিন্তু লিঙ্কন যখন বললেন, 'বিলি, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, আমিও তোমাকে বিশ্বাস করতে পারবো' তখন আশ্বস্ত হলাম আর কৃতজ্ঞ ভাবেই তার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

লিঙ্কন যে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন হার্নডনের নির্বাচনেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। হার্নডন শিক্ষিত, অনেক বিষয়েই তার জ্ঞানের পরিধিও ব্যাপক ছিল। শহরের যুবকদের উপরেও হার্নডনের ভাল প্রভাব ছিল। হার্নডন ও লিঙ্কনকে আজীবন শ্রদ্ধা করে গেছেন। প্রায় বীরপূজাই হয়ে ওঠে এটা। অথচ অন্য-দিকে একসময় লিঙ্কন সম্বন্ধে হার্নডনের মধ্যে কিছুটা চাপা ঈর্ষাও জন্মেছিল।

হার্নডনের সঙ্গে আইন ব্যবসা লিঙ্কনের জীবনে এক নতুন দিগন্তের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। লিঙ্কন পোশাকে, আচারে একেবারেই অতি সাধারণ থাকতে ভালবাসতেন। ইস্ত্রী না করা কোঁচকানো পোশাক পরতে তার দ্বিধা ছিল না, অন্যদিকে হার্নডন বেশ সৌখীন, পোশাক ছিল তার চমৎকার। লিঙ্কন বরাবর তার দরকারী কাগজপত্র মাথায় বেঢপ টুপীর মধ্যে নিয়ে চলাফেরা করতেন।

এই অংশীদারী কারবারে কোন লিখিত দলিল না করেই বিপরীত চাল-চলনে অভ্যস্ত দুজন মানুষ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে সমান-ভাবেই কাজ করে গিয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অথচ বিলি হার্নডনের সঙ্গে মিসেস লিঙ্কনের কোন সদ্ভাব একেবারেই ছিল না। তা সত্ত্বেও লিঙ্কনের সঙ্গে হার্নডনের বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় ছিল। লিঙ্কন হার্নডনকে ডাকতেন 'বিলি' বলে কিন্তু হার্নডন আব্রাহাম লিঙ্কনকে বলতেন 'মিঃ লিঙ্কন।'

ব্যক্তিগত জীবনে তখন লিঙ্কনের চরম অস্বস্তির শুরু। লিঙ্কন

নিজেও যে কিছুটা এর জন্য দায়ী সেকথাও বলা বহুল্য। মেরী বিশেষভাবেই ক্ষিপ্ত হতেন পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে লিঙ্কনের অমনোযোগী মনোভাব লক্ষ্য করে। লিঙ্কন এমনই খেয়ালশূন্য থাকতেন যে কখনও কখনও এক পায়ে মোজা পবেই বেরিয়ে পড়তেন। তার জামার কলার কাটা আর কখনও কোটে ধুলোর পাহাড়। এসব দেখে রেগে আগুন হতেন মেরী লিঙ্কন, এসব তাকে খুবই মনোকষ্ট দিত।

লিঙ্কনের বিরাট দীর্ঘ চেহারা, লম্বা কান আর নাক অনেকেরই কাছে বেমানান বলে মনে হত। একজন আইনবিদ তো লিঙ্কনকে প্রথমবার দেখার পর বলেছিলেন, 'এরকম বেয়াড়া চেহারার কুৎসিত পুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখিনি।'

লিঙ্কন আর এক ব্যাপারেও উদাসীন ছিলেন। মাথার চুল আর দাড়ি তিনি ক্বচিৎ কখনও কাটতেন। নাপিতের কাছে তার পদার্পন ঘটত কদাচিৎ। তার খাড়া খাড়া মাথার চুল একেবারেই দুচোখের বিষ ছিল মেরী লিঙ্কনের। এ নিয়ে মাঝে মাঝে তুলকালাম কাণ্ড বাধাতেন তিনি।

লিঙ্কনের এই রকম বিচিত্র পোশাক, অবিন্যস্ত চুল ইত্যাদি যেন হয়ে উঠেছিল তার সঠিক পবিচয়। লিঙ্কন নিজেও সেটা জানতেন আর বিশ্বাস করতেন। এই জন্যই একবার কোন আলোকচিত্রীর কাছে ছবি তোলানোর সময় আলোকচিত্রী তাকে একটু ভাল পোশাকে কেতাদুরস্ত হাসিতে ছবি তোলার অনুরোধ করলে লিঙ্কন হেসে বলে-ছিলেন, 'আমি ওই ভাবে ছবি তুললে কেউই আমাকে চিনতে পারবে না স্প্রিংফিল্ডে।'

শুধু এসবই নয় লিঙ্কন এতটাই সাদাসিধে মানুষ ছিলেন যে কোন কাজেই কেতাদুরস্ত ভাব তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। খাওয়ার টেবিলেও এর ব্যতিক্রম দেখা যেত না। সাধারণতঃ কাঁটা চামচ বা ছুরি নিয়ে খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না লিঙ্কন। প্রয়োজনে শুধু হাতেও তিনি খেতে চাইতেন। মেরী আগুন হয়ে উঠতেন এসব লক্ষ্য করে। অশান্তির আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠত। লিঙ্কনের সব কাজেই ত্রুটি খুজতে ব্যস্ত থাকতেন যেন মেরী লিঙ্কন। চলাফেরা খাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে লিঙ্কনের চিরকালীন সেই অভ্যাস পা লম্বা করে বই পড়াও অসহ্য

ছিল মিসেস লিঙ্কনের কাছে। লিঙ্কন প্রায়ই পড়াশুনার অবসরে শেকস্‌পীয়ার থেকে আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন অথচ মেরী লিঙ্কন তা আদপেই বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না।

অথচ আশ্চর্য ঘটনাও কম ছিল না দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে। লিঙ্কনের সাংসারিক জীবনে আনন্দ ছিল না এটা ঠিকই, লিঙ্কন তারই মধ্যে সান্ত্বনা পেতেন বিলি হার্নডনের মত অংশীদার পাওয়ায়। কিন্তু এরই মধ্যে মেরী আর তার মধ্যে ভালবাসার স্ফুরণেরও কোন অভাব ঘটেনি সেটাই আশ্চর্য জনক ঘটনা। মেরী আর আব্রাহাম লিঙ্কনের পরস্পরকে লেখা যে সব চিঠি বা টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়েছিল তাতে দেখা গেছে তারা পরস্পরকে অত্যন্ত গভীরভাবেই ভালবাসতেন। দুজনেই দুজনের দুঃখের আর আনন্দের ভাগ নিতেন। সমস্ত রকম রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর দুর্যোগের দিনে তাঁরা একাগ্র চিত্তে এক সঙ্গেই সংগ্রাম করে পরস্পরের সহযোগিতা করেছেন। একজন যেন অন্য-জনেরই উপযুক্ত সঙ্গী।

কিন্তু এসবের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় মেরীর তীব্র মেজাজ আর দখলদারী মনোবৃত্তির জন্য। কোন রকম বাধা তার মেজাজ আরও খারাপ করতে চাইত। এক ধরণের পাগলামি আবার প্রায়ই মেরীকে পেয়ে বসত, লিঙ্কনকে যেমন তিনি গ্রাম্য, অশিক্ষিত মানুষ বলে ব্যঙ্গ করতেন, তার লম্বা কান নিয়ে ঠাট্টা করতেন বিদ্রুপবান নিক্ষেপ করে আনন্দ পেতেন তেমনই আবার ঝড়জলের সময় বজ্র বিদ্যুৎ দেখে তার হৃৎকম্প হত। লিঙ্কন এরকম পরিস্থিতিতে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে সাহস দিতে চাইতেন। মেরী তখন হয়ে যেতেন অন্য মানুষ।

মেরীর আরও একটা অত্যন্ত খারাপ গুণের কথাও বলা দরকার। তিনি লিঙ্কনের বন্ধুদের আদপেই কেন জানা যায়না সহ্য করতে পারতেন না। মেরী এরই মধ্যে বিশেষ করেই দুচোখে সহ্য করতে পারতেন না সেই যশুয়া স্পীডকে। যে স্পীড ছিলেন লিঙ্কনের অকৃত্রিম একজন বন্ধু। স্প্রিংফিল্ডে আসা থেকে যার কোন উপকারই লিঙ্কন বিস্মৃত হননি। স্পীডকে অন্তরঙ্গ চিঠি লেখা লিঙ্কনের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল, অথচ মেরী তা সহ্য করতে পারে নি। মেরী স্পষ্টই স্বামীকে বলে দিলেন ওই ধরণের চিঠি লেখা চলবে না স্পীডকে।

স্পীডের উপর রাগের হয়তো বিশেষ কারণ ছিল মেরী লিঙ্কনের।

তাঁর ধারণা ছিল স্পীড লিঙ্কনের উপর বড় বেশি রকম প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে তাদের প্রথমবার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্য মেরী স্পীডকেই সম্পূর্ণ দায়ী ভাবতেন।

লিঙ্কন চরিত্রের অনেক সহৃ গুণের মধ্যে কিন্তু একটি প্রধান গুণ ছিল কোন উপকারীর উপকার কোন কারণেই কোন দিনও ভুলে না যাওয়া। সারা জীবন তিনি সামান্যতম উপকার যে করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকেছেন। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই লিঙ্কন ভেবেছিলেন তার প্রথম সন্তানের নাম স্পীডের নাম অনুসারেই রাখবেন। সেই মতই মেরী আর লিঙ্কনের প্রথম সন্তান ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাসে জন্ম নিলে লিঙ্কন তার নাম রাখতে চান যশুয়া স্পীড লিঙ্কন।

কিন্তু ব্যাপারটায় রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মেরী লিঙ্কন। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন লিঙ্কনকে। তিনি বললেন, 'আমার ছেলের নাম রাখার কোনই অধিকার তোমার নেই।'

মেরী নাম বদল করে এবার ছেলের নাম রাখলেন ওর বাবার নামানুসারে রবার্ট টড লিঙ্কন। শুধু এই একবারই নয়, মেরীর জেদ চরম নির্লজ্জতা কখনই বাঁধ মানেনি। এরপর সন্তান জন্ম নিলে তাদের প্রত্যেকের বেলাতেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল আর প্রত্যেক-বারই সন্তানদের নামকরণ মেরীই করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে বেচারি লিঙ্কন ছিলেন এক হতভাগ্য মানুষ।

এই ধরণের অন্যায় কাজ সারা জীবনব্যাপী করে যান মেরী। সংসারে কোন কাজেই লিঙ্কনের কোন মতবাদকে তিনি আমলেই আনতে চাননি কখনও। মেরী আর লিঙ্কনের চারটি সন্তান জন্মেছিল। এদের মধ্যে এডওয়ার্ড বেকার, যাঁর ডাক নাম ছিল এডি, জন্মেছিল ১৮৪৬ সালে, উইলিয়াম ওয়ালেশ, ডাক নাম উইলি জন্মেছিল ১৮৫০ সালে আর টমাস যার ডাক নাম 'ট্যাড', যে লিঙ্কন দম্পতির সবশেষ সন্তান, জন্মায় ১৮৫৩ সালে।' এঁদের মধ্যে একমাস টডই বেঁচেছিল শেষ পর্যন্ত। এডি মারা গিয়েছিল ১৮৫০ সালে মাত্র চার বছর বয়সে স্প্রিংফিল্ডেই। উইলি মারা যায় হোয়াইট হাউসে বারো বছর বয়সের সময়। ট্যাড মারা যায় ১৮৭১ সালে শিকাগোতে মাত্র আঠারো বছর বয়সে। বড় ছেলে রবার্ট টড দীর্ঘজীবি হন। তিনি মারা যান ১৯২৬

সালের ২৬শে জুলাই। বেঁচেছিলেন ৮৩ বছর।

সন্তানদের প্রতি অগাধ স্নেহ আর ভালবাসা ছিল লিঙ্কন দম্পতির। তাদের জন্য উৎকণ্ঠা আর অসুখের সময় শিয়রে বসে রাত জাগার ফলে মেরী আর লিঙ্কন অনেকটাই কাছাকাছি এসে একাত্ম হন। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণতার জন্য তাঁরা সন্তানদের ঠিকমত শাসনও করতে পারতেন না। তাছাড়া লিঙ্কন তা করতে ব্যর্থ হতেন মেরীর অতিরিক্ত জেদ আর প্রশ্রয়ের ফলে। ছেলেদের একমাত্র শাসন করতে পারেন মেরী, এমন একটা ধারণাই তার ছিল। ফলে শাসনের বদলে যা তিনি করতেন তা আসলে অপশাসনই।

লিঙ্কনের সহযোগী বিলি হার্নডন লিঙ্কনের সন্তানদের বিচিত্র বেয়াড়া স্বভাবের জন্য তাদের নাম দিয়েছিলেন 'শয়তানের ঘাগু'। আস্কারা আর প্রশ্রয় পেয়ে, অবশ্যই মেরীর তারা প্রায় নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। লিঙ্কনকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না। রবিবার লিঙ্কন ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে অফিসে আসতেন আর তখন তারা বিলি হার্নডনকে পাগল করে তুলত। তারা বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে, কালির দোয়াত উল্টে ফেলে, ড্রয়ার আর বাক্সের তালা খুলে হৈ হৈ বাধিয়ে দিত। হার্নডনের মনে হত খুদে ডাকাতগুলোকে বেশ মারধর করে শায়েস্তা করাই দরকার। লিঙ্কন নিজেও এই হৈ চৈ ভালবাসতেন তাই তাদের শাসন করতে কোন রকম চেষ্টাই করতেন না। ছেলেবেলায় নিজে তিনি অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছেন তাই ছেলেদের কোন কাজেই বাধা দিতে চাইতেন না, তাদের সমস্ত উপদ্রবই সহ্য করতেন।

অফিসেই যে ছেলেরা হৈ চৈ করে তুলকালাম বাধাত তাই নয়, বাড়িতেও তাদের একই রূপ ছিল। বরং সুবিধা সেখানেই বেশি মাত্রায় ছিল যেহেতু মেরীর উপস্থিতি। একদিন এই ভাবেই দুঃখ-জনক একটা ঘটনাও ঘটে যায়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দাবা খেলছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্য থেকে মেরী লিঙ্কনকে রবার্টের মাধ্যমে ডেকে পাঠালেন। লিঙ্কন খেলায় মশগুল থাকায় সেটা খেয়াল করেন নি।

এরপর আবার ডাক এল মেরীর কাছ থেকে। দ্বিতীয়বারেও আবার ভুলে গিয়েছিলেন লিঙ্কন ভিতরে যেতে। তৃতীয় বার তার

ছেলে প্রচণ্ড রাগে দাবার বোর্ডটাই টেনে ফেলে দিল। লিঙ্কন আর বিচারক হতচকিত স্তব্ধ। লিঙ্কন একটাও কথা বলতে পারলেন না এই অপমানকর ঘটনাতেও। কারণ ছেলেকে শাসন করার মত মনের জোর তার ছিল না। বিচারককে শুধু এটুকুই বলতে পেরেছিলেন লিঙ্কন পরে একসময় খেলাটা সুযোগমত শেষ করবেন দু'জনে। এমন বিচিত্র ঘটনা লিঙ্কনের সারা জীবনে বহুবারই ঘটেছিল কিন্তু মেরীর জন্য তিনি সবই সহ্য করেছিলেন।

লিঙ্কন কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের এমনিতে খুবই ভালবাসতেন। শহরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নানা সময়েই লিঙ্কনকে নিয়ে নানা রকম মজা করতে চাইত। ছেলেরা রাস্তার ধারে দুটো গাছে উঁচুতে দড়ি বেঁধে রেখে দিত, রাস্তা দিয়ে যাওয়াব সময় অন্য কারও মাথায় সে দড়ি না আটকালেও লিঙ্কনের টুপি আটকে ছিটকে পড়ত। এতে তার টুপিতে রাখা সব কাগজপত্র রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ত। লিঙ্কন এই দুষ্টুমিতে কিছুই মনে করতেন না বরং ওই স্নেহের অত্যাচার হাসিমুখেই সহ্য কবতেন।

আগেই একবার একথা বলেছি যে লিঙ্কন গির্জায় উপাসনা করতে যাওয়া তেমন পছন্দ করতেন না। গির্জায় কিছুতেই তিনি যেতেও চাইতেন না বা ধর্ম নিয়ে কোন রকম তর্ক বিতর্কও একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি সোজাসুজি বলতে ভালবাসতেন যে ধর্ম নিয়ে বা গির্জা নিয়ে আলোচনায় তার আগ্রহ নেই, তার কাছে কাজই আসল ধর্ম। কাজের ভাল আর মন্দ দিক নিয়েই তার একমাত্র ভাবনা। যতদিন জীবিত ছিলেন লিঙ্কন এই পথ থেকে কোনভাবেই সরে আসেন নি।

সন্তানদের প্রতি লিঙ্কনের ভালবাসা আর স্নেহ যেমন কম ছিলনা তাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা তারই সঙ্গে সমান ভাবেই বর্তমান ছিল। লিঙ্কনের অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিলি হার্নডন সন্তানদের উপর লিঙ্কনের নিয়ন্ত্রণ না থাকা সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, 'মিঃ লিঙ্কনের মত এমন হতভাগ্য পিতা আমি আর কোনদিন দেখিনি। এটা অতীব দুঃখ আর মর্মযন্ত্রণার বিষয় যে সন্তানদের উপর তাঁর আদৌ কোন অধিকারই ছিল না, সেখানে মিসেস লিঙ্কনই ছিলেন সর্বেসর্বা—।'

এটাই ঘটনা যে সন্তানদের ভালভাবে মানুষ করবেন এমন বাসনা গোড়ার দিকে ছিল লিঙ্কনের। কিন্তু মেরী লিঙ্কনের স্বার্থপরতা আর

জেদী মনোভাবই তাকে একাজ করতে দেয়নি। পারিবারিক অশান্তির ভয়েই লিঙ্কন এক নীরব দর্শক হয়েই রয়ে যান এক্ষেত্রে। সন্তানদের পিতা হিসাবে কোন দায়িত্ব বা ভূমিকা নিতে তাই ব্যর্থ হন আব্রাহাম লিঙ্কন। মেরীর হীনমন্যতা আর স্বার্থপর আচরণে ব্যথিত এক পিতা হিসেবেই শুধু রয়ে গেলেন সারা জীবন লিঙ্কন।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

লিঙ্কনের গৃহজীবন ও মনোযন্ত্রণা

সারা জীবনেও সম্ভবতঃ শান্তি পাননি আব্রাহাম লিঙ্কন নামে শান্ত, স্থিতধী মানুষটি। ইতিহাসের এ এক দুঃখময় ব্যক্তিত্ব। লিঙ্কন যে গৃহজীবনে শান্তি কামনা করেছিলেন সারা জীবনেও তা পাননি আর তার একমাত্র কারণ তার জেদী, কোপনস্বভাবা স্ত্রী মেরী লিঙ্কন। বিচিত্র চরিত্র মেরী লিঙ্কনের। প্রয়োজন দেখা দিলে তার কৃপণতা যেমন বাধ মানতো না তেমনই আবার নিজের সুখ চরিতার্থ করতে অমিতব্যয়ী হতেও তার আপত্তি ছিল না। এর পরিণতিতে সব সময় তটস্থ থাকতে হত হতভাগ্য লিঙ্কনকে। মেরী পোশাক আর নানা বিলাস সামগ্রীর পিছনে ইচ্ছামত খরচ করতে থাকায় লিঙ্কনকেও সেই জাঁকজমকের দায় মেটানোর জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হত। মেরী সব সময়েই নিজেকে জাহির করার জন্য খরচে পিছপা হতেন না। এক সময় নিজের সুনাম রাখার জন্য মেরী একখানা গাড়িও কিনতে বাধ্য করেছিলেন লিঙ্কনকে। এই বাড়তি খরচের দায় অনেক কষ্টেই লিঙ্কনকে মেটাতে হয়।

যে পান্থশালায় লিঙ্কন পরিবার বাস করছিলেন মেরী সেখান থেকে অন্য কোথাও নতুন বাড়িতে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করেছিলেন। ১৮৪৪ সালে লিঙ্কন পনেরোশো ডলারের বিনিময়ে রেভারেণ্ড চার্লস্ ড্রেসারের কাছ থেকে একখানা বাড়ি কিনতে বাধ্য হলেন। বাড়িটা এক কথায় বেশ ভালই ছিল, অনেক ঘর, বেশ

খোলামেলাও। নতুন বাড়ি মেরী লিঙ্কনকে আনন্দে অধীর করে তুলল। প্রচুর জায়গা থাকায় লিঙ্কন বাড়িতে গরু ও ভেড়া রেখেছিলেন। কিন্তু কোপনস্বভাবা মেরী লিঙ্কন যথারীতি কিছুদিন পরেই বাড়ি নিয়ে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করলেন লিঙ্কনকে। বাড়ির অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতির কথা দিনরাত বলে চললেন লিঙ্কনকে। শেষ পর্যন্ত তাগাদাও দিতে আরম্ভ করলেন এ বাড়ি বদল করে দোতলা একখানা বাড়ি কিনতে হবে লিঙ্কনকে।

মেরীর বিচিত্র খেয়ালী চরিত্রের খেসারত দিতে হত বেচারি লিঙ্কনকেই। বেহিসাবী খরচের মাত্রা মেরী ক্রমাগতই বাড়িয়ে চলেছিলেন বলে প্রায়ই অর্থাভাবে পড়তে হত লিঙ্কনকে। আইনবিদ হিসাবে তেমন বিরাট অর্থ কোন দিনই আয় করতে পারতেন না লিঙ্কন। এই অবস্থা বুঝলেও মেরী কোনদিনই নিজেকে সংযত করতে চাননি। বরং লিঙ্কনকে বাক্যবানে অস্থির করে তুলেছিলেন।

লিঙ্কন মানুষ হিসাবে ছিলেন অনন্য আর গরীবের জন্য ছিল তার অসীম সমবেদনা। এই দুয়ের সমন্বয়ের ফলে অর্থের ব্যাপারে তার কোন চাহিদা থাকে নি। ১৮৫৩ সালে লিঙ্কনের বয়স যখন চুয়াল্লিশ তিনি সাকিট আদালতে প্রায় চারটি মামলা পরিচালনা করেছিলেন। এজন্য পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন মাত্র ত্রিশ ডলারের মতই, যেখানে অন্য আইনজীবিরা অনেক বেশিই দাবী করতেন। কিন্তু লিঙ্কন এমনই সমবেদনা বোধ করতেন যে গরীব মক্কেলদের কাছে কিছুতেই বেশি অর্থ দাবী করতে পারতেন না। তার উদারতা আর মহানুভবতা প্রায় কিম্বদন্তী হয়ে উঠেছিল। এমন ঘটনারও নজীর আছে মক্কেল যেখানে পঁচিশ ডলার পারিশ্রমিক দিয়েছে লিঙ্কন সেখানে তার থেকে দশ ডলার ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন মক্কেলের দুরবস্থার কথা ভেবে। লিঙ্কনের মত এমন বিবেচক, উদার আইনবিদ আর কেউ ছিলেন কিনা জানা যায় না।

লিঙ্কনের আরও একটা মহৎ গুণ ছিল মামলার বিষয় বস্তু যাচাই করে প্রাণপণ শক্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আইন ব্যবসার আর্থিক দিক থেকে লিঙ্কন তখনও সাফল্যের শিখরে পৌছন নি, অবশ্য কয়েকবছর পর তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি ইলিনয় সেণ্ট্রাল রেলরোড থেকে এককালীন পাঁচ হাজার ডলার পেয়েছিলেন। কিন্তু

ঢের বেশি আনন্দিত হন বিনা পারিশ্রমিকে একজন বিধবা মহিলাকে তার পেনশনের টাকা আদায় করার মামলাতে। বিধবা মহিলাটি কোন একজন সৈনিকের বিধবা স্ত্রী। লিঙ্কন শুধু যে মহিলাটির মামলা বিনা পারিশ্রমিকেই করেছিলেন তাই নয়, তার যাবতীয় খরচ, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদিও তিনি বহন করেন। এই ভাবে আরও একটি মামলায় এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নি লিঙ্কন। এই মামলাটি ছিল লিঙ্কন একদিন নিউ সালেমে কুস্তীর লড়াইতে হারিয়েছিলেন সেই জ্যাক আর্মস্ট্রং আর হানা আর্মস্ট্রংয়ের ছেলে ডাফের বিরুদ্ধে। নিউ সালেমে থাকার সময় থেকেই আর্মস্ট্রং দম্পতি লিঙ্কনের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। ডাফ আর্মস্ট্রং এক খুনের মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিল। লিঙ্কন ডাফের বিধবা মা হানা আর্মস্ট্রংয়ের অনুরোধে এই মামলা গ্রহণ করেছিলেন। মামলার সাক্ষী শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল, ডাফ জেমস মেটসকার নামে একজনকে স্ট্র্যাপে আঁটা বল্টু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে। সাক্ষী আরও বলে সে স্পষ্টই সব ঘটনা দেখেছে যেহেতু আকাশে তখন পরিষ্কার চাঁদের আলো ছিল।

এই মামলা লিঙ্কন এমন চমৎকার ভাবে পরিচালনা করলেন যে তাকে কোন ভাবেই একজন সাধারণ 'আইনজীবি আর কি' কোন ভাবেই বলা চলে না। এই ধরণের মামলায় অসাধারণ ছিলেন লিঙ্কন। সাক্ষীর কথা শুনেই তিনি বুঝে নিতে পারতেন সে মিথ্যা বলছে কিনা।

মামলা চলা কালে লিঙ্কন বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ধর্মাবতার, আমি এখনই প্রমাণ করব যে সাক্ষী অ্যালেন মিথ্যা সাক্ষ্য দান করেছে, সে কখনই আসামী ডাফকে ওই বল্টু দিয়ে আঘাত করতে দেখে থাকতে পারে না। এর কারণ একটাই, ওইদিন পূর্ণিমার চাঁদের আলো ছিল না—কারণ সে রাতে চাঁদের আলো ছিলই না।'

কাগজের তিথি সম্পর্কে লেখা দেখিয়ে লিঙ্কন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সে রাতে চাঁদের আলো থাকার কোন সম্ভাবনা ছিল না আর সাক্ষীর পক্ষে কিছু দেখা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

জুরীদের কাছে তাঁর মক্কেলের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য লিঙ্কন প্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করার পর যে কথাগুলি বললেন তা উপস্থিত

সকলেরই হৃদয় স্পর্শ না করে পারে নি। তিনি বিধবা হানা আর্মস্ট্রংকে দেখিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি শুধু এই ভদ্রমহিলার জন্যই কোন অর্থ না নিয়ে আপনাদের সামনে এই মামলা পরিচালনার জন্য এসেছি। আমি যখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে এসেছিলাম তখন ওই ভদ্রমহিলাই নিঃসংকোচে আমার ময়লা পোশাক কেচে দিতেন, আমাকে তারা খাদ্য দিয়েছেন, দিয়েছেন বাসস্থান। আমি বিশ্বাস করি এমন দয়ার্দ্র পিতা মাতার সন্তান কখনও খুনী হতে পারে না—।'

লিঙ্কন পরিচালিত এই মামলা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সে সময়। জুরীরা শেষ পর্যন্ত ডাফ আর্মস্ট্রংকে নির্দোষ বলে মত দিলেন তখনই লিঙ্কনের দৃঢ় বিশ্বাস সমর্থিত হলো।

হানা আর্মস্ট্রং আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে লিঙ্কনকে চল্লিশ একর জমি দিতে চেয়েছিলেন। লিঙ্কন অবশ্য সে স্নেহের দান নিতে পারেন নি বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ওই দশকের গোড়ায় লিঙ্কন যখন আইন ব্যবসায় জীবিকা অর্জনের জন্য ঝড়, বৃষ্টি, রোদ মাথায় করে বরফের মধ্যদিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন, এই খুনের মামলা তার অনেক পরেরই ঘটনা।

কিন্তু আসল কথা হল লিঙ্কন যতই এইভাবে মামলা থেকে অর্থ আয় করতে অনীহা দেখাতে চাইছিলেন মেরী লিঙ্কন ততই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছিলেন। স্বামীর এধরণের দয়ার্দ্র ব্যবহার তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। মেরী টড বরাবরই ভেবে আসছিলেন নামী উকিল হবেন লিঙ্কন আর শেষ পর্যন্ত সেটাই তাকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে পৌঁছে দেবে একদিন। কিন্তু তা না করে লিঙ্কন হয়ে উঠেছিলেন দরিদ্র সব মক্কেলের উকিল। লিঙ্কনের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন মেরী। মেরী দেখেছিলেন ওকালতি ব্যবসার মধ্য দিয়ে কেমন ভাবে অনেক আইনবিদ কিভাবে প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাদের আয় লিঙ্কনের চেয়ে অনেকটাই বেশি, তারা মক্কেলকে দয়া দেখাতে ব্যস্ত থাকে না।

মেরীর চিন্তায় আরও ঘৃতাহুতি পড়ত একজন আইনবিদ ডেভিসের কথা শুনে। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বিচারক। আর সেই স্টিফেন

ডগলাস? তিনি শিকাগোয় বিশাল সম্পত্তির মালিক। চারদিকে কত নাম ডগলাসের। ডগলাস হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা।

ডগলাসের কথা মনে পড়লে প্রায় ক্ষেপে উঠতেন মেরী লিঙ্কন। তার হাত কামড়াতে ইচ্ছা হত স্টিফেন ডগলাসকে বিয়ে করেন নি বলে। সমাজে আজ তাহলে কতই না প্রতিপত্তি আর প্রতিষ্ঠা হত মেরীর। হয়তো ভবিষ্যতে ডগলাসই হয়ে যাবেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তাই তার স্ত্রী হওয়ার সুযোগ হেলায় হারিয়ে কপর্দকহীন লিঙ্কনকে বিয়ে করে চরম ভুলই করেছেন তিনি।

এই চিন্তা একসময় মেরীকে প্রায় উন্মাদ করে তোলে। ফলে অতি তুচ্ছ কারণেই তিনি বাড়িতে অনর্থ বাধিয়ে তুলতেন। মেরী ভালবাসতেন বড় সভা বা পার্টিতে যেতে কিন্তু সে ধরনের কিছুতে আমন্ত্রণ মিলত না তার। সাধারণ ব্যাপারে কার্পণ্য আর অকারণে বিলাস ব্যসনে অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না মেরী লিঙ্কন। সাধারণ কেনাকাটির ব্যাপারে সামান্য দাম বা ওজনের ত্রুটি নিয়ে তুলকালাম বাধাতে চাইতেন মেরী দোকানদার বা পসারীদের সঙ্গে। অবস্থা এমনও হত যে পড়শীরা সবই টের পেতেন মেরীর ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনে।

পারিবারিক কাজ কর্ম করার জন্য লোক থাকতে চাইত না লিঙ্কন পরিবারে। পরিচারক বা পরিচারিকা আদৌ টিকত না মেরীর ব্যবহারে। অনবরত কাজের ত্রুটি ধরার জন্য মেরীর বদনামও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন ভাবেই মেরী নিজের স্বভাব বদলাতে পারেন নি।

মেরী যেমন নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না সেই সঙ্গে কিন্তু লিঙ্কন কোন অর্থব্যয় করলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন। লিঙ্কনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু—'দি স্প্রিংফিল্ড জার্নাল' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করায় লিঙ্কন সানন্দে বন্ধুর কাগজের গ্রাহক হয়ে যান। কিন্তু মেরীর হাতে পত্রিকাটি আসা মাত্রই তিনি রেগে আগুন হয়ে কদর্য ভাষায় সম্পাদককে এই ধরণের সস্তা বাজে কাগজ বাড়িতে পাঠানোর জন্য তিরস্কার করে চিঠি লিখলেন।

ব্যাপারটার ওইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে নি, সম্পাদক মেরীর অপমানকর চিঠি পেয়ে লিঙ্কনের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠান। শেষ

পর্যন্ত অনেক লাঞ্ছনার পরে লিঙ্কন ওই অপমানকর অবস্থা থেকে রেহাই পেলেন।

মেরীর কদর্য মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় আরও কোন কোন ব্যাপার থেকেও। মেরী কোনদিনই লিঙ্কনের আত্মীয়-স্বজনদের সহ্য করতে পারে নি। এই জন্যই লিঙ্কনের কোন আত্মীয়র পক্ষে তার বাড়িতে এসে থাকার সুযোগও মেলে নি। মেরী কিছুতেই তাদের আসতে দিতে চান নি। লিঙ্কনের বিমাতা সারা লিঙ্কন বরাবরই লিঙ্কনকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করেছেন, তিনি একবার লিঙ্কনের কাছে এসে থাকার বাসনা করলেও মেরী তাতে কিছুতেই রাজি হন নি। লিঙ্কন কিন্তু সৎমাকে ভোলেন নি—তিনি নিয়মিত তাঁর কাছে যাওয়া আসা করেছিলেন।

লিঙ্কনের কাছে তার কোন আত্মীয় স্বজন এসে থাকতে পারে নি বলে খুবই দুঃখ পেতেন তিনি। তার প্রিয় মাসতুতো ভাই ডেনিস হ্যাঙ্কস নিউসালেমে তার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন একসময়। অবশ্য লিঙ্কনের আদরের ভাগ্নী হ্যারিয়েট হ্যাঙ্কস স্প্রিংফিল্ডে লেখাপড়া করতে এসে লিঙ্কনের কাছে কিছুদিন থাকতে পেরেছিল।

পারিবারিক জীবন সত্যিই বিষময় হয়ে উঠেছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের। অশান্তির ধূমায়িত আগুনে প্রায় দগ্ধ হয়ে চলেছিলেন হতভাগ্য লিঙ্কন। সবই মেরী লিঙ্কনের কুৎসিত স্বভাবের জন্য। পড়শীরাও অপছন্দ করত মেরীকে। এই সমস্ত কারণে বাড়িতে আদপেই শান্তি পেতেন না লিঙ্কন। এত সব সত্ত্বেও মেরী নিজের স্বভাব বদলানোর কণামাত্র চেষ্টাও করেন নি। লিঙ্কনের সহ আইন-বিদ বিলি হার্নডন মেরীর কথায় বলেছিলেন, 'এক রাগী বন বিড়াল ছাড়া কিছু নয়।'

লিঙ্কন সবই সহ্য করে যেতে বাধ্য হতেন। এমন অবস্থায় পড়ে তিনি প্রায়ই বাড়িতে আসতে চাইতেন না। বাড়ির কথা কেউ বললে তিনি বলতেন, 'বাড়ি তো নয়, এ আমার কাছে নরক। বাড়িতে ঢুকতে আমার ঘৃণা হয়।'

মেরীর আর একটা কদর্য স্বভাব ছিল যখন তখন লিঙ্কনকে আঘাত করে বসা। মাঝে মাঝে অবস্থা সত্যিই শালীনতার বাঁধ ভেঙে দিত।

লিঙ্কনের মত শান্ত প্রকৃতির মানুষের কাছেও তা হয়ে উঠত অসহনীয়। লিঙ্কন সে সময় বাধ্য হয়ে মেরীকে রান্নাঘরে বন্দী করে রাখতেন। তিনি তাই বলেছিলেন, 'এই রমণী আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছে, বাড়িকে করে তুলেছে নরকের সমান— ।'

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

রাজনীতিতে লিঙ্কন

● আশা নিরাশার দোলা

পারিবারিক অশান্তি সত্ত্বেও লিঙ্কন ভেঙে পড়েন নি। মেরী তার জীবন বিষিয়ে তুলেছিলেন নানা ভাবেই। অ্যান রুটলেজের যদি অকাল প্রয়াণ না ঘটত লিঙ্কন তাকেই স্ত্রী হিসেবে লাভ করতেন একথা অস্বীকার করা যায় না। এতে লিঙ্কনের জীবন হয়তো অন্য ধারাতেই বইতো। পারিবারিক শান্তি লাভ করলেও তিনি হয়তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না।

রাজনীতির প্রতি লিঙ্কন এই সময় থেকেই একটু একটু করে ঝুঁকতেও শুরু করেছিলেন। লিঙ্কনের চরিত্রের এক বিশেষ গুণ ছিল তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। যে কোন কাজেই সময় নিয়ে ভাবতে চাইতেন। এক্ষেত্রে মেরী লিঙ্কনের চরিত্র ছিল একেবারেই তার বিপরীত।

মেরী তখনও ভুলতে পারেন নি তাকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হতে হবে। একাজ করতে গেলে লিঙ্কনকে প্রেসিডেন্ট হতেই হবে। এই জন্যই সময় পেলেই তিনি লিঙ্কনকে বারবার তাগাদা করে রাজনীতিতে ঠিক মত অংশ নিতে প্রেরণা দিতেন। মেরী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন লিঙ্কনের পক্ষে প্রেসিডেন্ট হওয়া কঠিন নয়। বিয়ের পর থেকেই মেরী বারবার তাগাদা করে চলেছিলেন লিঙ্কনকে কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ নেবার জন্য।

লিঙ্কন এই সময় ভাবতে শুরু করেছিলেন নিজের দল হুইগ পার্টির

তরফে কংগ্রেসে মনোনীত হওয়া। ১৮৪৬ সালের আগে দুবার নিরাশ হতে হয় আব্রাহাম লিঙ্কনকে। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৬ সালে তিনি হুইগ পার্টির দ্বারা মনোনীত হয়ে বিপক্ষের ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীকে অনায়াসেই পরাজিত করলেন। কিন্তু এজন্য কোন আনন্দ বা অহঙ্কারবোধ ছিল না তার। ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লিঙ্কন 'হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস-এ' আসন গ্রহণ করার জন্য তৈরি হলেন।

কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেখা দিল এবার ওয়াশিংটন যাওয়ার। শেষ পর্যন্ত একদিন তৈরিও হতে লাগলেন লিঙ্কন ওয়াশিংটন রওয়ানা হওয়ার জন্য। সপরিবারেই যেতে হবে জানতেন তিনি।

ইলিনয়ের নতুন আর একমাত্র হুইগ কংগ্রেস সদস্য একদিন এই উদ্দেশ্যেই তাঁর সুন্দরী মেজাজী স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে স্টীমবোট আর রেলে বিরাট দূর পথ অতিক্রম করে ওয়াশিংটনে গিয়ে পৌঁছলেন। রাজধানী ওয়াশিংটন তখন যদৃচ্ছভাবেই যেন গড়ে উঠছিল। শহরের লোকসংখ্যা তখন প্রায় চল্লিশ হাজার হবে। এর মধ্যে ত্রিশ হাজার শ্বেতকায় আর দশ হাজার নিগ্রো। ওই নিগ্রোদের এক পঞ্চমাংশই ছিল ক্রীতদাস। আরও বিচিত্র ঘটনা ছিল রাজধানীর প্রধান সভা ক্যাপিটলের কাছেই ছিল ক্রীতদাস কেনাবেচার সবচেয়ে বিরাট বাজার। এটা নেহাতই এক ভাগ্যের পরিহাস।

১৮৪৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন যে বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় তার মাথার দিকে এক অস্থায়ী গম্বুজ ছিল। বুধবার আর রবিবার বিকেলে হোয়াইট হাউসের ময়দান এলাকায় নাবিকরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে জনগণের মনোরঞ্জন করে চলত। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের দপ্তরের আর নদীর মাঝখানে ছিল বিরাট এক ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকাময় জলাভূমি। পেনসিলভ্যানিয়া অ্যাভিনিউ ছিল বড় বড় এলোমেলো পাথরে তৈরি, ভালভাবে ঝাঁকুনি না খেয়ে কোন গাড়িই যেতে পারত না। অন্যান্য রাস্তার সঙ্গে স্প্রিংফিল্ডের পথ ঘাটের কোন তফাৎই ছিল না। বর্ষায় সে পথ কাদায় মাখামাখি হয়ে যেত। রাস্তার উপর ঘুরে বেড়াত দলেদলে শুয়োর, রাজহাঁস, পড়ে থাকত অবিরাম আবর্জনার স্তূপ। পরিবেশ ছিল অত্যন্ত খারাপ।

নির্বাচনে জয়লাভ করে লিঙ্কন যতখানি আনন্দ পেয়েছিলেন ওয়াশিংটনে এসে ততটাই মুষড়ে পড়লেন মেরী লিঙ্কন। তার কেনটাকির বনেদিয়ানা এই রাজধানীতে আসার পর কোনই কাজে লাগল না। কেউই তাকে নিমন্ত্রণ করত না বলতে গেলে। আজ যেখানে 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস' তারই এক অংশে ছিল একটা বোর্ডিং হাউস। আব্রাহাম লিঙ্কন সপরিবারে সেই বোর্ডিং হাউসে বাস করতেন। এটা ছিল মিসেস স্প্রিগসের, বোর্ডিং হাউস। এখানকার ঘরগুলো তেমন বড় ছিল না, বেশ অপরিচ্ছন্ন আর কিছুটা স্যাঁত্-সেঁতে। চারদিকের পরিবেশ তেমন ভাল ছিল না।

লিঙ্কন কিন্তু অসুখী ছিলেন এখানে। কিছুদিনের মধ্যে তার বোর্ডিং বন্ধুদের আর বাউলিং খেলার সাথীদের কাছে বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সরল আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার সবাইকে একান্তভাবে মুগ্ধ আর প্রিয় করে তুলল। তাঁর কাছে গল্প শুনতে সবাই ভাল বাসতো।

মেরী ছিলেন চরম অসুখী। কেবল মাত্র খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া তিনি সব সময় ঘরেই বসে কাটাতে চাইতেন। বন্ধুবান্ধবীর সংখ্যা তার খুবই কম ছিল। একঘেয়ে ওই জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল মেরী লিঙ্কনের কাছে।

লিঙ্কন যে সময় কংগ্রেসে ঢুকেছিলেন তখন সারা দেশ জুড়েই চলেছিল এক সমর প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতি চলেছে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ। দীর্ঘ কাল, প্রায় দুবছর ধরে চলে ওই ঘৃণিত যুদ্ধ। এর উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত খারাপ। এর প্ররোচনা দিয়ে চলেছিল আমেরিকায় যারা দাস ব্যবসার উদ্যোক্তা আর দাসদের দিয়ে নানা কাজে উৎসাহী। এই যুদ্ধ ছিল আগ্রাসী নীতির উপর ভিত্তি করে। উদ্দেশ্য মেক্সিকোর জমি দখল করে নেয়া আর আমেরিকার রাজ্যসীমা বিস্তার। ক্রীতদাসদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রয়োজন দেখা দিতে শুরু করেছিল আরও বিস্তৃত জমির। আমেরিকার অধিকার বাড়িয়ে তোলায় যারা আগ্রহী তারা আরও বলতে চাইছিলেন প্রয়োজনে মেক্সিকোর যে জমি দখল করা হবে সেখান থেকে দুজন প্রতিনিধি বা সেনেটর নির্বাচিত করা যেতে পারে।

এই যুদ্ধ আমেরিকার ইতিহাসে এক জঘন্যতম যুদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। যেহেতু এ যুদ্ধ ছিল নিরপরাধ ও দুর্বল মেক্সিকোর উপর চাপিয়ে দেয়া। এই যুদ্ধের পরিণতিতে মেক্সিকোর টেক্সাস এলাকা প্রায় জোর করেই আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, মেক্সিকোকে বাধ্যও করা হয় টেক্সাসের উপর থেকে তার অধিকার তুলে নিয়ে আমেরিকার অধিকার আইনত স্বীকার করতে। এই জবর দখল করার ফলেই আমেরিকায় জন্ম নিল কিছু নতুন রাজ্যও, যেমন অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো, নেভাদা আর ক্যালিফোর্নিয়া।

বিখ্যাত সেনাপতি গ্র্যাণ্টও আমেরিকার মেক্সিকো নীতি মানতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন ইতিহাসে ওই যুদ্ধকে সবচেয়ে নোঙরা যুদ্ধ হিসেবেই উল্লেখ করা চলে। এ যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবেই আগ্রাসী যুদ্ধের উদাহরণ। তাই গ্র্যাণ্ট সারা জীবন এতে অংশ নেবার জন্য অনুশোচনা করেছিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনে আব্রাহাম লিঙ্কন আসন গ্রহণ করেছিলেন একেবারে পিছনেরই সারিতে। এ ছিল কংগ্রেসের ত্রিংশ অধিবেশন। লিঙ্কন সে সময় একেবারে অজ্ঞাত সদস্যদেরই একজন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বা পাদপ্রদীপের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন। এদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার পূর্বতন প্রেসিডেণ্ট জন কুইন্সী এডামস। হুইগ দলের অত্যন্ত প্রবীন সদস্য আর দাস প্রথার ঘোরতর বিরোধী। ছিলেন টেনেসির এন্ড্রু জনসন, যিনি লিঙ্কনের কার্যকালে ভাইস প্রেসিডেণ্ট হন। এরা কেউই সেদিন ধারণাতেও আনতে পারেন নি ইলিনয়ের চাষাড়ে চেহারার হাবাগোবা মানুষটিই একদিন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে বিবেচিত হবেন।

কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে অনেক বিষয় নিয়ে তীব্র তর্কবিতর্ক হয়েছিল। সবচেয়ে জোরাল ব্যাপার হয় মেক্সিকোর যুদ্ধ আর দাস-প্রথার বিষয়ে দুদলের বিরুদ্ধ মনোভাব। লিঙ্কন বক্তৃতা করতে উঠে ঝাঁঝালো ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তদানীন্তন ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেণ্ট পোলককে। ১৮৪৭ সালে তখন মেক্সিকো যুদ্ধ প্রায় শেষ। প্রেসিডেণ্ট হুইগ দলের অত্যন্ত অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। লিঙ্কন তীব্র ভাষায় প্রেসিডেণ্ট পোলককে আক্রমণ করে বললেন যে এ যুদ্ধ

আমেরিকার নগ্ন আক্রমণেরই ফল। আমেরিকার ইতিহাসে এধরনের ঘৃণ্য কাজ আর ঘটেনি। খুনী সৈন্যরা মেক্সিকোয় নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে শিশু নারী সকলকেই হত্যা করেছে। দুর্বলের উপর অত্যাচারে নারকীয় দৃশ্যই গড়ে তোলে আমেরিকার সেনাদল। এ পৈশাচিকতার তুলনা হয় না।

লিঙ্কন এনেছিলেন এক 'স্পট রেজলিউশন।' কাগজে প্রকাশিত হয় উপস্থাপক হিসেবে লিঙ্কনেরই নাম। প্রেসিডেন্ট পোলক স্বীকার করতে বাধ্য হন প্রথম রক্তপাত মেক্সিকোর মাটিতেই হয়। আমেরিকাই তাই ছিল প্রথম আক্রমণকারী। লিঙ্কন একাজ করে-ছিলেন প্রেসিডেন্টকে অপ্রিয় করে তুলতে যাতে পরবর্তী সময় কোন হুইগ দলের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। লিঙ্কনের প্রস্তাব অনেকটাই কার্যকর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এর প্রত্যক্ষ ফল আব্রাহাম লিঙ্কনের পক্ষে তেমন সুখকর হল না। তিনি তার নিজের রাজ্য ইলিনয় আর নিজের নির্বাচনী শহর স্প্রিংফিল্ডে খুবই অপ্রিয় হয়ে উঠলেন তার যুদ্ধবিরোধী মনো-ভাবের জন্য। লিঙ্কনের বহু পরিচিত মানুষ যারা যুদ্ধে মারা গিয়ে-ছিলেন তাদের আত্মীয় স্বজনরাও লিঙ্কনের উপর বিরূপ হয়ে উঠলেন। বিলি হার্নডনও লিঙ্কনকে অনুরোধ করেছিলেন তার আক্রমণের ভাষা সংযত করতে। কিন্তু লিঙ্কন পোলক, ডেমোক্র্যাট দল আর যুদ্ধ ও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সমানভাবেই তার আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ইলিনয়ের অধিকাংশ লোকই লিঙ্কনকে প্রায় ঘৃণা করতেই শুরু করেছিল এসবের জন্য। দশ বারো বছর পরেও লিঙ্কন যখন প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হন তখনও তাকে ওই ঘৃণার আগুনে দগ্ধ হতে হয়েছিল। কাগজেও তার বিরুদ্ধে লেখা হয়।

কংগ্রেস অধিবেশনে আর তার বাইরেও লিঙ্কন তীব্র ভাষায় তার আজন্ম ঘৃণার বিষয় সেই ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন। কংগ্রেসে তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ক্রীতদাস প্রথা যদি অন্যায় না হয়, তাহলে কোন কিছুই অন্যায় নয়।'

লিঙ্কন টেক্সাস থেকে ওরিগন পর্যন্ত এলাকায় দাসপ্রথা তুলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কলম্বিয়া জেলায় এই প্রথা

তুলে দেবার চেষ্টাও তিনি অন্ততঃ চল্লিশবার ভোটদান করার মধ্য দিয়ে করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন।

লিঙ্কন নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন তার কাজে অনেকেই খুশি নয়। তিনি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তাই বলেছিলেন, 'আমি বোধ হয় জেনে শুনেই আমার রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করে ফেললাম।' এসবের পরিণতি আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে সুখকর হল না। দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের নির্বাচনে দাঁড়ালেন তবু লিঙ্কন কিন্তু এবার পরাজিত হলেন। ভগ্ন মনোরথ লিঙ্কন বাধ্য হয়েই আবার ফিরে গেলেন স্প্রিংফিল্ডে সেই আইন ব্যবসার কাজেই। এর আগে ওয়াশিংটনে থেকে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন তিনি। চেষ্টা করেছিলেন কোন চাকরি নিয়ে থেকে যেতে। চেয়েছিলেন ওরিগন রাজ্যের গভর্নর হতেও। সেখানেও পেলেন ব্যর্থতা।

মেরী লিঙ্কন এর আগেই ওয়াশিংটন ছেড়ে ফিরে গিয়েছিলেন স্প্রিংফিল্ডে। লিঙ্কনও ওয়াশিংটন ছেড়ে বাধ্য হয়েই ফিরে এলেন সেখানে। আবার ঢুকলেন তার পুরনো আইন ব্যবসার অফিস ঘরে। অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল অফিস, ধুলো ময়লায় ভরে গিয়েছিল সব কিছুই। লিঙ্কন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন আইনবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে। রাজনীতি যেন তাকে স্বেচ্ছা নির্বাসনেই পাঠিয়ে ছিলো সেদিন। অত্যন্ত বিষণ্ণতার শিকার হয়ে তার সে সময়ের জীবন কাটতে আরম্ভ করেছিল। এই ভাবেই কেটে চলেছিল কয়েকটা ঘটনাহীন বছর। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে লাগলেন লিঙ্কন আইনের কাজে।

এই পরিক্রমায় তিনি কখনও যেতেন মন্থর গতি ঘোড়ার পিঠে কখনও বা ঘোড়ার গাড়িতেও। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত কখনও কখনও রেলগাড়িতেও চড়েছেন লিঙ্কন। এই সময় তিনি জ্যামিতির সম্বন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তার দৃঢ় ধারণা জন্মায় জ্যামিতির জ্ঞান মানুষের মনের নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লিঙ্কন ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় খণ্ড অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়ে ফেলেছিলেন। লিঙ্কনের আইন ব্যবসার সহযোগী বিলি হার্নডন বলেছিলেন, 'মনে পড়ছে, আমরা দুজন নোঙরা অপরিসর বিছানায় শুয়ে থাকতাম। মিঃ লিঙ্কন প্রায়ই

বসে বসে মৃদু আলোয় পড়ে চলতেন জ্যামিতির বইগুলো। কখনও কখনও না ঘুমিয়েই তাঁর সারারাতই কেটে যেত।'

জ্যামিতির সঙ্গে লিঙ্কন বীজগণিত আর জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও পড়াশুনা করতে শুরু করেছিলেন। সময় পেলে তারই সঙ্গে ডুবে যেতেন শেকস্পীয়ারের নাটকে, করে চলতেন পুরনো অভ্যাস মত আবৃত্তি। শেকস্পীয়ার ছিল তাঁর জীবন। এত গভীরভাবে কোন কিছু তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি সারাজীবনে।

।। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।।

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লিঙ্কন ● সাফল্যের আলো

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দক্ষিণের ক্রীতদাসসিদ্ধ রাজ্যগুলো আর উত্তরের দাস রহিত রাজ্যগুলোর মধ্যে গোষ্ঠীগত এক বিরোধের আগুন ধূমায়মান হয়ে চলেছিল। ১৮২০ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল মাত্র বাইশটি অঙ্গরাজ্য—এর মধ্যে এগারোটি ছিল ক্রীতদাসসিদ্ধ অঞ্চল আর এগারোটি ক্রীতদাস-রহিত। মেইন ক্রীতদাসরহিত আর মিসৌরী ক্রীতদাসসিদ্ধ রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এটা হয় বিখ্যাত এক চুক্তির মাধ্যমে, যার নাম 'মিসৌরী চুক্তি'। এই চুক্তিতে ছিল ৩৬° ডিগ্রী অক্ষরেক্ষার উত্তরের 'লুইসিয়ানা পারচেজ অঞ্চল' চিরদিন দাস প্রথামুক্ত থাকবে।

এই সময়েই এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলেই আব্রাহাম লিঙ্কন আবার ফিরে পেলেন তার লুপ্ত সম্মান আর রাজনৈতিক জীবন। ১৮৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে সেনেটর স্টিফেন এ. ডগলাস এমন একটি বিল সেনেটে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করলেন যার ফলে সারা দেশই উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠল, উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধও হয়ে উঠল আকাশ ছোঁয়া। ডগলাস যে বিল আনলেন তার নাম কানসাস-নেব্রাসকা বিল। এই বিলের ফলে সম্ভাবনা রইল দাসপ্রথার আঞ্চলিক সীমানা বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

এই সময় স্প্রিংফিল্ড শহরে বসেছিল বিরাট এক কৃষিমেলার আসর। বহুদূর অঞ্চল থেকে আসতে শুরু করল কৃষকেরা তাদের পশুর পালসহ, আনা হল নানা কৃষিজ সম্ভার। মেলায় ঘোষণা করা হল সিনেটর স্টিফেন ডগলাস ভাষণ দেবেন।

মেলায় অনেকের সঙ্গে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মেরী লিঙ্কনও। সঙ্গে রইলেন স্বয়ং লিঙ্কন। ডগলাস নিজের মতের স্বপক্ষে নানা রকম যুক্তির অবতারণা করে জনসাধারণকে বোঝানোর চেষ্টা চালালেন ক্রীতদাস প্রথা কেন থাকা দরকার, কাদের জন্যই তা থাকা প্রয়োজন। তিনি তার বক্তৃতা এমন কৌশলে করলেন যেন দুপক্ষের কেউ চটে না যান।

স্টিফেন এ. ডগলাসের ক্রীতদাস প্রথার পক্ষে নগ্ন ওকালতিতে মন বিদ্রোহ করে উঠল দরদী লিঙ্কনের। তিনি মনে মনে ঠিক করে নিলেন ডগলাসের এই ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দেবেন। মেলায় তাই ঘোষণা করা হল পরদিন আব্রাহাম লিঙ্কন ডগলাসের বক্তব্যের জবাব দেবেন, খুলে দেবেন বহুরূপী ডগলাসের মুখোস।

এতে সবচেয়ে খুশি হলেন মেরী লিঙ্কন। নির্দিষ্ট দিনটিতে তিনি লিঙ্কনের পোশাক সযত্নে সাফ করে দিলেন।

প্রচণ্ড উষ্ণ ছিল সেদিন। বাইরে প্রখর সূর্যের আলো ঝলমল করে চলেছে। লিঙ্কন সাদাসিধা পোশাক পরিহিত অবস্থায় বক্তৃতা মঞ্চে এসে পৌঁছলেন। লিঙ্কনের পোশাক দেখে সবচেয়ে দুঃখ আর রাগ হল অবশ্যই মেরীর। এই কি সভ্য একজন নেতার পোশাক? দিনটি ছিল ১৮৫৪ সালের ৩রা অক্টোবর।

জীবনের সব সেরা ভাষণটি সম্ভবতঃ সেদিন দিয়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। সকলে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য না করে পারল না লিঙ্কনের আশ্চর্য পরিবর্তন। যেন ওই দিনই লিঙ্কনের রাজনৈতিক প্রতিভার নতুন ভাবেই স্ফুরণ ঘটে গেল। জন্ম হল একজন সৎ নিষ্ঠাবান বক্তা আর ভবিষ্যত নেতৃত্বেরও।

ক্রীতদাস প্রথার অমানবিক কুৎসিত দিক নিয়ে প্রবল ভাবেই বক্তৃতা করলেন লিঙ্কন। ক্রীতদাস প্রথাকে কেন ঘৃণা আর বর্জন করা উচিত তার পক্ষে অসংখ্য জোরালো যুক্তির অবতারণা করলেন তিনি।

তিনি সেদিন আবেগময়ী ভাষণে বললেন, 'আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষের মনোভাব কণামাত্রও নেই। কে জানে আমরা তাদের জায়গায় থাকলে হয়তো ক্রীতদাস প্রথা বজায় থাকার কথাই বলতাম। এটা তুলে দেয়া হোক চাইতাম না। তাই আমি বলতে চাই আমাদের মধ্যে এই ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকলে ঠিক এই মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে সেটা তুলে দিতে পারা যায় না। দক্ষিণের মানুষ প্রায়ই বলে থাকেন যে এই ক্রীতদাস প্রথার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তারাই নয়, উত্তরাঞ্চলের মানুষের দায়িত্ব পরিমাণে অনেকটাই বেশি সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার পক্ষে কোন সমাধান সূত্র বের করার কাজ সত্যিই বড় কঠিন, জানি না কিভাবে কোন্ সূত্রে তা সম্ভবপর।'

গভীর প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন সেদিন আব্রাহাম লিঙ্কন। দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা তিনি শ্রোতাদের স্তব্ধ করে রেখে গেলেন। স্টিফেন এ. ডগলাস তার যুক্তিজাল খণ্ডন করার জন্য নানাভাবে প্রশ্নবান ছুঁড়ে চলেছিলেন কিন্তু অবিচলিত অনড় হয়েই লিঙ্কন তার প্রতিটি বক্তব্য নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন সেদিন। ডগলাসের প্রচেষ্টা বিফল হল।

দুঃখেরই কথা লিঙ্কনের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আবেগময় ভাষণ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ডগলাসের প্রস্তাবটিই কংগ্রেসের উভয় সভাতেই গৃহীত হল। এর ফলে কানসাস ও নেব্রাস্কা অঞ্চল দাসমুক্ত অঞ্চল হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে কিনা তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সেখানকার অধিবাসীদেরই ঠিক করার অধিকার দেওয়া হল। এর ফলে সেই 'মিসৌরী চুক্তি' বাতিলও হয়ে গেল। এর এক বিষময় ফল না দেখা দিয়ে পারলনা। কানসাসে দাসপ্রথার সমর্থক আর বিরোধীদের মধ্যে শুরু হল প্রচণ্ড সংঘর্ষ। লিঙ্কন দুঃখিত ভাবে লক্ষ্য করলেন এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নীরব থাকা যায় না আর হুইগ দলের পক্ষেও এটি সামলানো কঠিন।

এই সময়েই জন্ম নিল রিপাবলিকান দল। আব্রাহাম লিঙ্কনও ছিলেন এই দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। লিঙ্কন লক্ষ্য করেছিলেন রিপাবলিকান দল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জোরাল প্রচার করার ফলে

দলের সদস্যসংখ্যাও বেড়ে চলেছে। তিনি নিজেও শেষ পর্যন্ত দলের সদস্য হয়ে গেলেন।'

এরপর আবার এসে গেল যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের নির্বাচনের দিন। লিঙ্কন এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু ৮ই ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৫৫ তারিখে তিনি ইলিনয় বিধান মণ্ডলের ভোটে পরাজিত হলেন লোমেন ট্রাম্বেলের কাছে।

স্প্রিংফিল্ডের সেই নির্বাচনের আসরে যথারীতি উপস্থিত ছিলেন মেরী লিঙ্কন অনেক আশা বুকে নিয়ে। লিঙ্কনের জন্য তিনি নতুন পোশাকেরও ব্যবস্থা করেছিলেন, তার আত্মীয় পরিজনও উপস্থিত ছিলেন। লিঙ্কন জয়ী হলে সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজনও সেদিন করা হবে বলে আগেই ঠিক করা ছিল।

প্রথম দিকে লিঙ্কন বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মেরীরই বান্ধবী জুলিয়ার স্বামী লোমেন ট্রাম্বেল জয়লাভ করলেন। লিঙ্কন হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন মেরীর মতই। ক্রুদ্ধ মেরী সভা স্থল ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেলেন, জুলিয়ার সঙ্গে আর জীবনে তিনি কথা বলেন নি।

বিপর্যস্ত, হতাশায় ভগ্ন মনোরথ আব্রাহাম লিঙ্কন আবার তাঁর আইন ব্যবসাকেই অবলম্বন করার জন্য সেই নোংরা অফিসেই ফিরে গেলেন। কালি আর ঝুলে ভরা শূন্য দেয়ালেই রইল তার ম্লান দৃষ্টি। ভাবলেন এই অন্ধকার জীবন থেকে হয়তো কোনদিনই মুক্তি আসবে না তার। নানাভাবে মামলার কাজেই নিজেকে ব্যাপ্ত রাখতে চেষ্টা চালালেন বিষাদক্লিষ্ট লিঙ্কন। তাঁর সহযোগী আইন-বিদরা সে সময় ক্লান্ত বিষণ্ণ একজন মানুষকেই দেখে অভ্যস্ত ছিলেন। সারারাত কোনদিন হয়তো তাকে না ঘুমিয়ে বসে থাকতে দেখেছিলেন তারা।

এই সময় লিঙ্কনের চোখের দৃষ্টিও ব্যাহত হয়। তিনি চশমা নিতে বাধ্য হন সেই সময়।

১৮৫৫ সালের সেই বেদনার্ত দিনগুলিতে নিজের কথাই ভাবতেন আব্রাহাম। একজন দরিদ্র, হতযশ, ব্যর্থ মানুষ বলে নিজেকে ভাবতেন তিনি। তাঁর বয়স তখন উনপঞ্চাশ বছর। দীর্ঘ জীবন শেষে কি বিচিত্র অবস্থায় এসেই না পৌঁছেছিলেন তিনি—একজন হতাশাগ্রস্ত

ব্যর্থ মানুষ। সাংসারিক জীবনেও সুখ নেই, সংসার তাঁর কাছে নরকের সামিল। আইন ব্যবসা? সেখানেও শুধু ব্যর্থতারই গ্লানি। আর রাজনীতি? সেখানে নানাভাবেই বিপর্যস্ত, পরাজয়ের তিক্ত-স্বাদই তাকে গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। সামনে তার তাই গাঢ় এক অন্ধকারেরই পর্দা মুখব্যাদান করে গ্রাস করতে উদ্যত। লিঙ্কন তখন সত্যিকার একজন চরম হতাশাগ্রস্ত ব্যর্থ মানুষের প্রতিচ্ছবি। লিঙ্কন নিজেই সে সময় বলেছিলেন, 'আমি একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষ, সাফল্যের দৌড়ে আমি আজ পিছিয়ে পড়ছি—।'

লিঙ্কন এমন হতাশায় ভুগলেও তার প্রথম ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্টিফেন এ. ডগলাসের তখন দারুণ প্রতিপত্তি আর খ্যাতি। চারদিকেই তার সুনাম ছড়িয়েছিল। চারপাশ থেকে আসছিল সম্মান। কানসাস নেব্রাসকা বিল তাকে আরও খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কৌশলী রাজনীতিক ডগলাস, তাই তার নাম সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডগলাসের এই সুনাম আর প্রতিপত্তির জন্য ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যে তিনিই মনোনয়ন পাবেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। রিপাবলিকান দলও তাদের প্রার্থী মনোনীত করতে চললেন। কিন্তু কে হতে পারেন সেই প্রার্থী? সেই প্রার্থী ছিলেন আমেরিকার ইতিহাসে মহান প্রেসিডেন্ট হিসাবে যাঁর খ্যাতি সেই অতি সাধারণ মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কন।

এরপর আরম্ভ হল নির্বাচনী প্রচার। এই নির্বাচনী প্রচারের সময় লিঙ্কন আর ডগলাসের মধ্যে শুরু হয়েছিল তীব্র তর্কবিতর্ক। লিঙ্কনের তীক্ষ্ণ, জোরালো যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা তাঁকে এবার সম্মানের উচ্চতম শিখরেই বসিয়ে দিয়েছিল। আমেরিকার ইতিহাসে এ ধরনের চমৎকার যুক্তি মেশানো জ্বালাময়ী ভাষণ আর কখনই কেউ শোনেননি। ডগলাস ও লিঙ্কনের এই ভাষণ শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হত।

১৮৫৬ সালের ২৯শে মে ব্লুমিংটনে লিঙ্কন যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন কোন শ্রোতারই বা সাংবাদিকদেরও সেই ভাষণের নোট নেওয়ার কথা মনে ছিল না। এই ভাবেই লিঙ্কনের সেই মহৎ ভাষণটি চিরকালের মতই হারিয়ে যায়।

লিঙ্কন ওই বক্তৃতায় মানুষের চিরন্তন অধিকারের বিষয়ে মনোমুগ্ধকর কথাই বলেছিলেন। উৎসাহ আর আবেগ সেদিন তাকে নতুন মানুষ করে তুলেছিল। বিলি হার্নডনও বলেছিলেন, 'মিঃ লিঙ্কনের এরকম ভাষণ আমি কোনদিনই শুনিনি। তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণায় ভাস্বর।'

আব্রাহাম লিঙ্কন সেদিন তার প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী মল্লবীরের মতই চেপে ধরেছিলেন। কঠোর রূঢ় সত্য বাস্তব সেদিন মূর্ত হয়ে ওঠে তার বক্তৃতায়।

হার্নডন বলেছিলেন, 'মিঃ লিঙ্কন ছিলেন ছ'ফিট চার ইঞ্চি দীর্ঘকায় মানুষ, কিন্তু ব্লুমিংটনের সেই সভায় তিনি সেদিন এমনই অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি দৈর্ঘ্যে সাত ফুট।

যেকোন বক্তৃতা করার আগে লিঙ্কন তার অভিজ্ঞতা আর যুক্তির উপর নির্ভর করে তৈরি করে নিতেন তার ভাষণের নোট। বারবার সেটা সংশোধনও করে নিতেন। লিঙ্কনের কৃতিত্ব ছিল এখানেই। এইভাবে নিজের এক বিতর্কিত অথচ ক্ষুরধার যুক্তিপূর্ণ ভাষণ তৈরি করেছিলেন লিঙ্কন। লিঙ্কন নিজের সেই ভাষণ বন্ধুদের কাছে স্টেট হাউস পাঠাগারে পড়ে শুনিয়েছিলেন। বন্ধুদের মতামতের মূল্য দিতেন লিঙ্কন। কিন্তু সেদিনের সেই বক্তৃতার কোন ত্রুটি বন্ধুরা খুঁজে পেলেন না।

চারবছর আগে লিঙ্কনের সেনেটে যাওয়ার প্রচেষ্টার চেয়ে ১৮৫৮ সালের প্রচেষ্টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৫৮ সালের ১১ই জুন স্প্রিংফিল্ডের রিপাবলিকান স্টেট কনভেনশনে মনোনয়ন নেওয়ার সময় দেওয়া এই বক্তৃতার জন্যই শুধু মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কনকে চিরকাল মনে রাখতে পারে। এই বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল 'বিভক্ত গৃহ'। সে বক্তব্য এমনই সরল আর নির্ভীক যে একমাত্র সহযোগী বিলি হার্নডন ছাড়া বাকি সকলেই তাকে ওই ভাষণ দিতে মানা করেছিলেন। হার্নডনই বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, 'মিঃ লিঙ্কন, যা পড়লেন সেই ভাষণই আপনি দিন। এই বক্তৃতাই দেখে নেবেন আপনাকে প্রেসিডেন্ট করবে।' সত্য হয়েছিল একদিন এই ভবিষ্যতবাণী।

লিঙ্কন বলেছিলেন তার ভাষণে, 'আত্মকলহে সংসার টেঁকে না। অর্ধেক রাজ্য দাসসিদ্ধ আর বাকি অর্ধেক মুক্তভূমি, এ ব্যবস্থা কোন

সরকার চিরকাল সহ্য করতে পারেন না। ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন হোক আমার ঈপ্সিত নয়—আমি চাই না ঘরটি ভেঙে যাক, আমার তাই অভিপ্রায় কলহ যেন আর না চলে।'

এখানেই থামেন নি লিঙ্কন। অন্য এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস কোন সরকার কিছুতেই দেশের একটি অংশে ক্রীতদাসদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে পারেন না যতক্ষণ না দেশের বাকি সমস্ত অংশে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।'

এই পরস্পরের বক্তৃতার সারাংশ যাচাই করলে দুই ঘুঘুবান পক্ষের চরিত্রও অনেকটা প্রকট হয় সন্দেহ নেই। এটা নিঃসন্দেহ, দুজনের মধ্যে ব্যবধান আর তফাৎ অনেকটাই ছিল। সত্যি কথা বললে সেটা আকাশ পাতাল। ডগলাস এ. স্টিফেন ছিলেন উচ্চতায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। অন্যদিকে আব্রাহাম লিঙ্কন ছফিট চার ইঞ্চি। কণ্ঠস্বর চমৎকার, মনোরম ছিল স্টিফেন ডগলাসের, ভরাট গম্ভীর। বেশ সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর তাতে কোন দ্বিমত ছিল না কারোই। অপরদিকে লিঙ্কনের কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ, চেরা। মাধুর্য হয়তো তাই কমই।

চেহারার চাকচিক্য ডগলাসের অসামান্য, অনেকটা নায়কোচিত। ফিটফাট ডগলাস অনায়াসে প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকদের বা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন অন্যদিকে লিঙ্কনের দীর্ঘ চেহারায় লালিত্য কণামাত্রও ছিলনা। চোয়াল ভাঙা মুখখানায় নজরে আনতো বিষণ্ণতার ছাপ।

পোশাকের দিক থেকেও দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে প্রচণ্ড অমিল ছিল। ডগলাসের দেহে থাকত নিখুঁত দামী পোশাক, নিখুঁত কাঁটছাঁট। লিঙ্কন কোনদিনই পোশাক নিয়ে মাথা ঘামান নি, ছোট মাপের ইস্ত্রীবিহীন ছিল তার প্যাণ্ট আর কোট। মাথার টুপিও সেই রকম, তার মধ্যে দরকারী কাগজপত্র ঠাসা।

ডগলাসের আর যেকোন গুণই থাকুক তার মধ্যে তাৎক্ষণিক রসিকতাবোধ কণামাত্রও ছিলনা। তিনি শ্রোতাদের জন্য উজাড় করে দিতেন কৌশলী বক্তব্য। কিন্তু লিঙ্কনের রসবোধ ছিল অপরিসীম। তিনি গল্পবলায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাই প্রয়োজনে এই গল্পের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। ডগলাসের উদ্ভাবনী শক্তি প্রায় ছিলই না। তিনি একই বক্তব্য কথার

মারপ্যাঁচ ঘুরিয়ে ফিরিয়েই বলে চলতেন। অন্যদিকে লিঙ্কন এক কথা বা বক্তৃতার বিষয় বারবার বলতে চাইতেন না, নতুন বক্তৃতাই তিনি শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপিত করতে ভালবাসতেন।

ডগলাস নিজেকে জাহির করার কাজ ভালবাসতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিজের দলের পতাকাবাহী বিশেষ রেলগাড়িতে জঁাকজমকের সঙ্গে যাতায়াত করতেন। ডগলাস কোন জায়গায় নির্বাচনী প্রচারে গেলে আগেই বিশেষ পদ্ধতিতে তার আগমনবার্তা ঘোষণা করতে হত। ডগলাস যেন কোথাও উপস্থিত হয়ে শ্রোতাদের ধন্য করে দিচ্ছেন এমন ধারণাই সৃষ্টি করতেন।

লিঙ্কন কোন জঁাকজমক চাইতেন না। সাধারণ ভাবেই তিনি রেলে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতেই হাজির হতেন। তার সঙ্গে থাকত পুরনো দিনের বিবর্ণ ব্যাগ আর ছাতা।

মানুষ হিসেবেও দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কোনও তুলনা ছিল না। ডগলাস নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত স্বার্থপর পুরুষ, অতি সুবিধাভোগী। কোন বিশেষ নীতিই তার ছিল না। আদর্শহীন একজন মানুষ ডগলাস। নিজের অবস্থা ফিরিয়ে নিতে যে কোন নীতি আঁকড়ে ধরতে তার আপত্তি হত না। পরাজয় নয় জয়লাভ, আর তা যেন তেন প্রকারে হলেও আপত্তি নেই, এই ছিল ডগলাসের আদর্শ।

আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী। সমস্ত মানুষই সমান এটাই ছিল তার নীতি। ন্যায়ের জন্য প্রাণপাত করতেও তার আপত্তি ছিল না। এই সঙ্কল্প ছিল তার আজীবন। আইন ব্যবসাতেও একই নীতিতে বিশ্বাস রেখেছিলেন লিঙ্কন। ক্রীতদাসদের জন্য তাই তিনি জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন একদিন। এই উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন মানবতাবিরোধী ওই নীতি সমূলে উৎপাটন করবেন একদিন চরম আঘাত হেনে। এই জন্যই সারা দেশে একই আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন লিঙ্কন।

ডগলাস এ বিষয়ে দ্বৈত নীতিই পছন্দ করতেন। তার মত ছিল ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকা কোন রাজ্যে অধিবাসীদের ইচ্ছা মতই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আইন রাজ্যের এক্তিয়ার হতে হবে।

লিঙ্কন ও স্টিফেন এ ডগলাসের বক্তৃতা নানা খাতে বয়ে চলতে শুরু করার পর বিচিত্র পরিণতিও ঘটল। ডগলাস নানা ধরনের

পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রাখতে শুরু করায় ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যেই নানা সমালোচনার ঝড় উঠল। ডগলাস বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলেন যখন ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট জেমস বুকানন স্বয়ং ঘোষণা করলেন ডগলাসের বিরুদ্ধে তিনি নিজেই দাঁড়াতে চলেছেন। ডগলাস প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন যে বুকাননকে ডগলাসই প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়েছেন তাই নামিয়ে দিতেও বেশি সময় লাগবে না তার।

এই পরিণতিতে ভাঙন শুরু হল ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে। জোর লড়াই আরম্ভও হয়ে গেল সেদিন ডগলাস আর বুকাননের মধ্যে।

ডগলাস যাই বলে থাকুন দলের মধ্যে তার বিরোধিতা চরম পর্যায়েই পৌঁছেছিল সন্দেহ নেই। বাধ্য হয়ে ডগলাস তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু এফ. লিণ্ডারকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন এই বলে, 'আমার পিছনে হাঁ করে তাড়া করে চলেছে হিংস্র নেকড়েরা। যে ভাবেই হোক আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমি একা আর লড়াই করতে পারছি না।

এক বিচিত্র ব্যাপারই এতে ঘটে গেল। ডগলাস সাহায্য চেয়ে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তারই বয়ান জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল রিপাবলিকান দলের কাছে। এর ফলে দারুণ এক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কাগজে ফলাও করেই সে সংবাদ প্রকাশ করা হল।

ক্রমে এগিয়ে এল আবার সেনেট নির্বাচনের নির্দিষ্ট সেই দিনটি। লিঙ্কন গভীর রাত অবধি অপেক্ষা করছিলেন টেলিগ্রাফ অফিসে। শেষ পর্যন্ত সংবাদ এসে পৌঁছল। লিঙ্কন সেনেটর পদে পরাজিত।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

সাফল্যের পথে লিঙ্কন ● আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়ন

সেনেটর পদে নির্বাচনে পরাজয়ে ভেঙে পড়েননি আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি বলেছিলেন, 'এ হল ক্ষণিকের'। লিঙ্কনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের লেখাও প্রকাশিত হয়ে চলল। ইলিনয়ের সংবাদপত্রে লেখা হল : আব্রাহাম লিঙ্কনের মত হতভাগ্য রাজনৈতিক কোন নেতা এর আগে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। পরাজয় তার একমাত্র নিয়তি। এমন একজন ব্যর্থ মানুষের প্রতিচ্ছবি কোন সাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখা যায়নি।

লিঙ্কনকে আবার তার আগেকার জীবিকাই নিতে হল। তিনি আইনজীবির কাজে আবার তার পুরনো অফিসে প্রবেশ করলেন। এই সময় আবার ক্লান্ত বিষণ্ণতাও তাকে পেয়ে বসেছিল। নানা ভাবে ভাষণও দিয়ে চলেছিলেন সুযোগ পেলেই লিঙ্কন। তখনও ডগলাসের সঙ্গে তার নির্বাচনী বক্তৃতা শুনতে জন সমাবেশ ঘটত। ১৮৬০ সাল এগিয়ে এল এবার। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার দিন এগিয়ে এল। নতুন গড়ে ওঠা সেই রিপাবলিকান দল শিকাগো শহরে মিলিত হতে চলেছিলেন ভাবী প্রেসিডেন্ট কাদের জন্য তাদের প্রার্থী মনোনীত করার উদ্দেশ্যে। তারিখটি ছিল ১৮৬০ সালের ১৬ই মে। চারদিকে তিরতির করে কাঁপছিল উত্তেজনা।

খুব কম লোকই অবশ্য আশা রেখেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন পাবেন। লিঙ্কন নিজেও সেটা ভালই জানতেন। ১৮৬০ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে তিনি ওই প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সম্মানের সম্বন্ধে লীম্যান ট্রাম্বলকে লিখেছিলেন, 'এই বিষয়ে আমার একটু লোভ আছে বৈকি। কিন্তু

এই মুহূর্তে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাবতে পারছি না—।'

রিপাবলিকান দলের কর্মকর্তারা অবশ্য প্রায় ঠিক করেই রেখেছিলেন প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দল কাকে মনোনয়ন দেবে। এ বিষয়ে সবচেয়ে সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন নিঃসন্দেহে সুপুরুষ উইলিয়াম এইচ. সিউয়ার্ড। সিউয়ার্ড ছিলেন নিউইয়র্কের বাসিন্দা রাজনীতিবিদ, তার মত মানুষকে মনোনয়ন দেয়া নিয়ে কারোই কোন আপত্তির কারণ ছিল না। লিঙ্কনের পক্ষে তাই ভোট পাওয়া বেশ কঠিনই ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার পরিচিতিও সিউয়ার্ডের তুলনায় দলের মধ্যেও কম ছিল।

প্রতিনিধি সভায় আসার সময় সিউয়ার্ড আর কোন কোন প্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সুন্দর পোশাক পরিহিত ব্যাণ্ড বাজিয়ের দল। আর 'ওয়াইড অ্যাওয়েকস্' যাদের প্রার্থী ছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন তারা হৈ হৈ করতে করতে দেশের সকল প্রান্ত থেকে এসে মিশিগান অ্যাভেনিউর উপর মিছিল করে ঘুরতে শুরু করল। শিকাগোর লোক ফ্রণ্টে যখন গান বাজনা হৈ চৈ চলেছে, ঠিক তখনই আবার সব প্রার্থীরাই কৌশলে অন্যকে হারাতে সম্ভাব্য সব উপায় ঠিক করতে ব্যস্ত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন উঈড, ক্যামেরন, বেটস এই সব প্রার্থী।

উইলিয়াম সিউয়ার্ড ভাবতে শুরু করেছিলেন জয়ী তিনিই হবেন। এটা তার উনষাটতম জন্মদিনের চমৎকার এক উপহারই হবে। একটা কথা এখানে বলা দরকার। যদি ওই দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মনোনয়নের জন্য ভোটপর্ব শেষ হয়ে যেত তাহলে আমেরিকার ইতিহাসের ধারা অন্যথাতেই বয়ে চলত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল অন্যরকম। যে ছাপাখানায় ব্যালটের কাগজ ছাপার ব্যবস্থা হয়েছিল নানা কারণেই ছাপা ব্যালট সেখানকার মালিক ঠিক সময়মত হাজির করতে পারেনি। ফলে ওইদিন সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে ভোট নেওয়াও সম্ভব হল না। অধিবেশন শুরু হল প্রায় নির্ধারিত সময়ের বহু ঘণ্টা পরে। এটা আব্রাহাম লিঙ্কনের সৌভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে ছিল ইতিহাসই এর সাক্ষী। সিউয়ার্ডের সৌভাগ্য একটু একটু করে নামতে শুরু করেছিল এই সময়েই।

কিন্তু বিচিত্র এই ঘটনা ঘটল কেমন করে? এর পিছনে ছিলেন একজন করিৎকর্মা শক্তিমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুরুষ। তার নাম

হরেস গ্রীল। এই মানুষটিই বৈপ্লবিক ওই কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন। বিচিত্র চেহারা ছিল হরেস গ্রীলের। গোলাকার মাথায় হালকা রেশমী চুলের বাহার। চেহারাও কৃশ।

এই হরেস গ্রীলই এক হিসেবে লিঙ্কনের সৌভাগ্যরবিকে দিগন্তরেখার উপরে উঠে আসতে প্রাণপাত সহায়তা করেছিলেন। তিনিই লিঙ্কনের মনোনয়ন লাভের ব্যাপারে দিনরাত ধরেই প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। শুধু এখানেই থেমে থাকেন নি গ্রীল, উইলিয়াম সিউয়ার্ড আর তার পরম স্বার্থান্ধ সুবিধাবাদী ম্যানেজার থার্লো উঈডের বিরুদ্ধেও উজাড করে ঢেলে দিয়েছিলেন পুঞ্জীভূত যত ঘৃণা। এই একটা কাজই লিঙ্কনের মনোনয়ন লাভের পক্ষে অস্বাভাবিক কাজ করেছিল।

হরেস গ্রীল অথচ এর আগে সিউয়ার্ডের পক্ষেই কাজ করেছিলেন। অথচ তিনিই খড়্গ হস্ত হয়ে উঠেছিলেন সিউয়ার্ড আর তার ম্যানেজার থার্লো উঈডের উপর। সে এক বিচিত্র কাহিনী সন্দেহ নেই।

হরেস গ্রীল এর আগে দীর্ঘ অনেক বছর ধরেই সিউয়ার্ডের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। এরই ফলে সিউয়ার্ড নিউইয়র্কের গভর্নর আর সেনেটর নির্বাচিতও হতে পারেন। সিউয়ার্ডের ম্যানে-জার থার্লো উঈড যে ওই ম্যানেজারের পদটি লাভ করেছিলেন তারও পিছনে কাজ করেছিল গ্রীলের প্রভাব আর কৌশল।

কিন্তু তিক্ততা বাড়তে আরম্ভ করেছিল এর পর থেকেই। গ্রীল নিউইয়র্কের বিশেষ একটি পদ লাভ করতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু সিউয়ার্ড উঈডকেই সে পদ লাভে সহায়তা করলে তিনিই গ্রীলের বদলে সেটা পেয়ে গিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, নিউইয়র্কের ডাকঘরের অধিকর্তার পদটি চেয়েছিলেন হরেস গ্রীল। কিন্তু সিউয়ার্ড আর থার্লো উঈডের কৌশলে গ্রীল সে পদও পেলেন না।

গ্রীল অত্যন্ত অপমানিত আর বঞ্চিত হয়ে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এতে। তিনি শপথ করলেন মনে মনে এর উপযুক্ত জবাব সময় হলেই দেবেন। সুযোগ মিলতে দেরি হল না। এসে পড়ল নির্বাচন। গ্রীল জানতেন সিউয়ার্ড কিছু কিছু দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে থার্লো উঈডের প্রায় হাতের পুতুল ছিলেন

সিউয়ার্ড। উঈড অসম্ভব ধূর্ত, কৌশলী আর স্বার্থান্ধ মানুষ। সিউয়ার্ডের ম্যানেজার হিসেবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে তিনি প্রচুর নীতিবহির্গত কাজ সিউয়ার্ডের জ্ঞাতসারে করে চলেছিলেন। বিশেষ করে সিউয়ার্ড নিজেও জড়িয়েছিলেন কিছু ট্রাস্ট আর লাইব্রেরীর তহবিলের অর্থ ব্যয় নিয়ে। এতে কারচুপিও ধরা পড়ে।

হরেস গ্রীল সহজেই এসব বিষয়ে অবহিত হয়ে ওঠেন। তার পক্ষে সহজেই তাই সিউয়ার্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করাও কঠিন কাজ ছিল না। হরেস গ্রীলের এ ধরনের বক্তব্য অন্যদিকে উত্তর আমেরিকার জনসাধারণের পক্ষেও এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করাও সহজতর ছিল। হাতিয়ার হিসাবে হরেস গ্রীলের নিজস্ব পত্রিকাও ছিল। হরেস গ্রীল তাই নিজেকে তৈরি করলেন এক কঠিন লড়াই করার জন্য।

হরেস গ্রীলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিউয়ার্ডের বদলে লিঙ্কনকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দান করানো। এজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কাজে নেমে পড়লেন। প্রত্যেক প্রতিনিধিকে ব্যক্তিগতভাবে আব্রাহাম লিঙ্কনকেই ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরতে আরম্ভ করলেন হরেস গ্রীল। নিজের পত্রিকায় প্রচার আবেদন সমানভাবেও শুরু করলেন গ্রীল। তার কাগজের নাম ছিল নিউইয়র্ক টারবাইন। কাগজটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে সে সময়। হরেস গ্রীল জোরালো ভাষায় তার পত্রিকায় পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন উইলিয়ম সিউয়ার্ডের নানা দুর্নীতিমূলক রাজনৈতিক প্রবন্ধ।

সারা আমেরিকায় হরেস গ্রীল রাজনীতিক সাংবাদিক হিসেবে খুবই সুনামের অধিকারী থাকায় তার প্রবন্ধও যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করে চলেছিল। গ্রীল এরই সঙ্গে আসল কাজটিও করে চলেছিলেন। তার লেখার মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকে বললেন, 'আমি আপনাদের সামনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে এমন একজনকে উপস্থিত করতে চলেছি যিনিই একমাত্র বর্তমান নানা সমস্যা থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।'

আব্রাহাম লিঙ্কনের শুভানুধ্যায়ীরাও চুপ করে বসে থাকেন নি

এই সঙ্গে। তারাও জোরালো প্রচার শুরু করেছিলেন তাঁর হয়ে। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন কেন সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী আর কেন তাকেই মনোনীত করা দরকার।

লিঙ্কনের সৌভাগ্যরবি যে একটু একটু করে উঠতে শুরু করেছিল তাতে সন্দেহ ছিল না। উইলিয়াম সিউয়ার্ড, যিনি প্রকৃতই জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছিলেন ক্রমেই অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে শুরু করেন। তিনি জনসাধারণের কাছে তার কাজকর্ম আর হঠকারী কিছু মন্তব্যের জন্য বেশ বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন। তার সম্পর্কে হতাশা সৃষ্টি হয় সমর্থকদের মধ্যেও। এই ব্যাপারটি লিঙ্কনের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়।

দাসপ্রথা সম্পর্কে লিঙ্কনের যুক্তিপূর্ণ মতবাদও এই সময় তাঁর পক্ষে খুবই জোরালো হয়ে ওঠে। আরও একটি ব্যাপার লিঙ্কনের মনোনয়ন পাওয়ার পক্ষে কাজ করেছিল নিঃসন্দেহে। লিঙ্কনের বন্ধুরাও সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ব্যাপারটি হল ডেমোক্র্যাট দল নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করবে স্টিফেন এ. ডগলাসকেই। আর ডগলাসের মোকাবিলা করার জন্য আব্রাহাম লিঙ্কনের চেয়ে যোগ্যতর প্রার্থী আর কেউই ছিলেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশ আর সভায় একথা নিঃসন্দেহেই প্রমাণ হয়েছে। সেই সব সমাবেশে ডগলাস কোনভাবেই লিঙ্কনের যুক্তি খণ্ডন করতে পারেন নি। খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা হয়েও ডগলাস বারবার পরাস্ত হন যুক্তির বিচারে। রিপাবলিকান দলে তাই লিঙ্কনের চেয়ে যোগ্য প্রার্থী এই হিসেবে একজনও ছিলেন না। কথাটা অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন।

লিঙ্কনই যে এক্ষেত্রে যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী তার কারণ কেনটাকি প্রদেশেরই মানুষ তিনি। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষকে তিনি যেমন চেনেন আর কেউ সেরকম পারেন না। এরই সঙ্গে লিঙ্কন সমর্থকরা ইণ্ডিয়ানা রাজ্য আর পেনসিলভানিয়ার প্রতিনিধিদের মন্ত্রী পরিষদে লিঙ্কন জয়ী হলে স্থান দেওয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিশ্চিত করেছিলেন।

ভোটের সময় ক্রমেই কাছে এগিয়ে এল। লিঙ্কন কিন্তু ঠিক করেছিলেন তিনি ওই সময় থাকবেন স্প্রিংফিল্ডেই। সেখানে কিভাবে তাঁর সময় কাটছিল সেটা জানা খুবই চিত্তাকর্ষক হবে অবশ্যই। সে সময়, অর্থাৎ যখন মনোনয়ন নিয়ে ভোট নেওয়ার কাজ চলছিল লিঙ্কন তখন তার সেই জীর্ণ মলিন ছোট্ট অফিস ঘরেই বসেছিলেন। কোন মক্কেল সেদিন ছিল না। লিঙ্কন স্বভাবতই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন যেন কোন বিষয়ে মন সমর্পন করতে পেরে উঠছিলেন না।

রিপাবলিকান দলের কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছিলেন মনোনয়ন পর্ব সমাধা করার জন্য। সেদিন ছিল শুক্রবারের সকাল। হাজারে হাজারে উৎসুক জনতা শিকাগো শহরে ভোটের ফলাফল জানতে জমায়েত হয়েছিল। চারদিকে তিরতির করে কাঁপছিল উত্তেজনায়। চারদিকে যেন উৎসবের আমেজ। মানুষ প্রায় উত্তেজনায় উন্মত্ত অবস্থাতে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই সকালে। শিকাগো শহরটাই যেন ভেঙে পড়েছিল, চলেছিল নাচ গান আর উন্মাদনা।

লিঙ্কনের অস্থিরতা ক্রমশঃই বেড়ে উঠলে তিনি অফিস কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সোজা এবার হাজির হলেন 'স্প্রিংফিল্ড জার্নালের' অফিসে। খবর জানার এখানেই সুবিধা হবে ভেবেছিলেন লিঙ্কন। কিন্তু কোন খবর এসে না পৌঁছনয় লিঙ্কন হাজির হলেন ওই বাড়ির উপরের তলায় টেলিগ্রাফ অফিসে। সেখানে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বসে নানা কথায় সময় কাটাতে চাইছিলেন লিঙ্কন যতক্ষণ না খবর পৌঁছয়।

এদিকে নির্বাচনের কাজ যথারীতি এগিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল। লিঙ্কন আগেই তার নির্বাচন পরিচালকদের জানিয়ে রেখেছিলেন, 'এমন কোন চুক্তি করবে না যা আমাকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করবে।'

কিন্তু লিঙ্কন জানতেন না তার নির্বাচন পরিচালকদের কি অমানুষিক পরিশ্রমই সেবার করতে হয়েছিল। অনেক চুক্তিই তারা করেছিলেন লিঙ্কনের অজান্তেই, অনেক ফন্দী ফিকিরও কাজে লাগাতে হয় তাদের। এই রাজনৈতিক কারসাজিতে ফল যে ভালই হয় ইতিহাসই তার সাক্ষী। আমেরিকার মহাসঙ্কটময় সেই মুহূর্তে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকেই অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছিল।

সকলের দৃষ্টি সেই 'উইগওয়ামে'। ওখানেই মনোনয়ন সম্পর্কিত ভোটা-ভুটির জন্য কথা কাটাকাটি আর তর্কবিতর্ক চলেছিল। শুরু হল এরপর ভোট দান পর্ব।

প্রথম ব্যালটে দেখা গেল সিউয়ার্ড ১৭৩½, লিঙ্কন ১০২, ক্যামেরন ৫০½, চেজ ৪৯, বেটস ৪৮টি ভোট পেয়েছেন। প্রতিনিধিরা চিৎকার করে উঠলেন, 'নাম ডাকা হোক, নাম ডাকা হোক।'

দ্বিতীয় ব্যালটে দেখা গেল লিঙ্কন পেয়েছেন ১৮১, সিউয়ার্ড তখন তার চেয়ে ২½ ভোটে এগিয়ে। মনোনয়নের জন্য দরকার ২৩৩টি ভোট। তৃতীয়বারে লিঙ্কনের ভোট দাঁড়াল ২৩১½ এ। জয়ী হতে দরকার আরও ১½টি ভোট।

আচমকা ওহায়োর একজন প্রতিনিধি লাফিয়ে উঠে বললেন, 'মাননীয় সভাপতি, আমি জানাতে চাই ওহায়োর চারটি ভোট আমরা মিঃ চেজের বদলে মিঃ লিঙ্কনকে দিচ্ছি।'

সভা উল্লাসে ফেটে পড়ল। সবচেয়ে হাসির দমক দেখা গেল সেই হরেস গ্রীলের মুখে। তার দুই শত্রু সিউয়ার্ড আর তার ম্যানেজার কূটবুদ্ধি থার্লো উঈড তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

হাতহালি, হুল্লোড় আর উন্মাদনায় সভায় কানপাতার উপায় ছিল না। তখন যে দৃশ্যের অবতারনা হয় সেদিন তার তুলনা নেই।

কিন্তু স্প্রিংফিল্ডে লিঙ্কন কখন খবর পেলেন? লিঙ্কন অপেক্ষা করছিলেন অধীর হয়ে। আর ঠিক তখনই টেলিগ্রাফ পৌঁছল বন্ধুদের কাছে থেকে, 'ভগবানের দয়ায় আমরা জিতেছি—।'

টেলিগ্রাফ কর্মীটি সেই টেলিগ্রাম পেয়েই উল্লাসে ফেটে পড়ল, 'মিঃ লিঙ্কন—আপনি জয়ী হয়েছেন—আপনি জয়ী হয়েছেন—।'

রুদ্ধ আবেগে থরথর করে কাঁপছিলেন লিঙ্কন। কয়েকটা মুহূর্ত নৈঃশব্দের মধ্য দিয়েই অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এরকম নাটকীয় মুহূর্ত জীবনে কখনও আসেনি লিঙ্কনের। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বারবার পরাস্ত হয়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। উনিশ বছর পর চরম এক সাফল্যের স্বাদ তিনি আজ পেলেন। কিন্তু সে রকম মধুর আনন্দের স্বাদ যে পাচ্ছেন না। একরাশ কুণ্ঠাই যেন তাকে গ্রাস করতে চাইছিল।

স্প্রিংফিল্ডের রাস্তায় তখন এক আশ্চর্য দৃশ্য। হাজার হাজার মানুষ যেন উৎসবে যোগদান করতে এসেছে। লিঙ্কনের সমর্থকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার বিজয়বার্তা ঘোষণা করে চলেছিল।

স্প্রিংফিল্ড শহরের মেয়র স্বয়ং লিঙ্কনের মনোনয়নের সংবাদ নিয়ে সকলকে জানানোর অনুমতি দিলেন। সারা শহরে শুধু আনন্দের জোয়ার, করা হল তোপধ্বনি আর বন্দুক গর্জন।

লিঙ্কনের জয়ে আত্মহারা তার শুভানুধ্যায়ীরাও ছুটে এলেন তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে। তারা লিঙ্কনকে অভিনন্দন আর শুভেচ্ছার জোয়ারে প্রায় প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিতে চাইছিল। শুরু হয়েছিল অবাধ নাচ আর গান। এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে লিঙ্কন ধীর কণ্ঠে শুধু বললেন, 'বন্ধুগণ, আমার বাড়িতে একজন খর্বকায়া নারী আমার চেয়ে ঢের বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছেন, আপনারা যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে এই খবরটা জানিয়ে আসতে পারি, তিনি তাতে দারুণ খুশি হবেন।'

এতদিনে মেরী লিঙ্কনের আশা বেশ কিছুটা পূর্ণ হল। স্প্রিংফিল্ডে বোধহয় মেরীই ছিলেন সবচেয়ে সুখী কোন রমণী। এবারই হয়তো তার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল সর্বপ্রথম। আনন্দ মগ্ন স্প্রিংফিল্ডের উৎসবমত্ত রাতে সেদিন শুধু লিঙ্কনেরই জয়ধ্বনি আর তাকে নিয়েই গান গেয়ে চলল জনতা।

কিন্তু এ ছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগের ধাপ, প্রস্তুতিপর্ব মাত্র।

।। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।।

প্রেসিডেন্ট পদে আব্রাহাম লিঙ্কন ●

প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পাওয়ার পর লিঙ্কন প্রস্তুত হলেন আসল লড়াইয়ের জন্য। তার বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হলেন সেই স্টিফেন এ ডগলাস। লিঙ্কন এটাই আশা করেছিলেন। তবে ব্যাপারটা লিঙ্কনের পক্ষে বেশ ভাল হয়ে দাঁড়াল ডেমোক্র্যাট দল দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায়। স্টিফেন এ. ডগলাসের অহঙ্কার আর ভুলের জন্যই হয়তো ডেমোক্র্যাট দল লিঙ্কনের বিরুদ্ধে তিনজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল। এটাই লিঙ্কনের জয়ের পথ খুবই সুগম করে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। উত্তরাংশের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ছিলেন ডগলাস আর দক্ষিণাংশের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন জন. সি. ব্রেকিনরিজ। 'কনস্টিটিউশনাল ইউনিয়ন' নামে অন্য একদলের প্রার্থী ছিলেন জন বেল।

এরপর এসে গেল সেই নির্ধারিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিনটি। ১৮৬০ সালের স্মরণীয় ৬ই নভেম্বর। এই নির্বাচনের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছিল ইউনিয়ন থেকে দক্ষিণাঞ্চলের আলাদা হওয়া না হওয়া।

নির্দিষ্ট দিনটিতে নির্বাচকদের একটানা স্রোত চলেছিল ভোটদান কেন্দ্রগুলির দিকে। আবহাওয়া উত্তেজনায় যেন থমথমে। সবাই যেন অনুভব করছিল এ শুধু এক নির্বাচন নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও কিছু। অন্যান্য বারের নির্বাচনের চেয়ে এর পটভূমি আলাদা।

লিঙ্কনের নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন তার বন্ধু আর শুভানুধ্যায়ীরা বিপুল উৎসাহ দিয়ে। স্প্রিংফিল্ডের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে তারা লিঙ্কনকে নির্বাচিত করার আবেদন জানিয়েছিল। শোনা যায় তেইশজন মন্ত্রীর মধ্যে কুড়িজনই লিঙ্কনকে ভোট দেন। তাকে ভোট দেয়নি থিয়োসফিকাল সোসাইটির ছাত্ররা এসব ছাত্ররা ছিল এক রকম গোঁড়া খ্রীষ্টীয় যাজকদের হাতের পুতুলমাত্র।

এ ব্যাপারে লিঙ্কন দুঃখের সঙ্গেই মন্তব্য করেছিলেন, 'এইসব মানুষ

ভান করে চলে তার ঈশ্বরবিশ্বাসী, ঈশ্বরকে ভয় করে। কার্যক্ষেত্রে এরা একেবারেই বিপরীত। ক্রীতদাসদের এরা মানুষ বলেই ভাবে না, তাদের মরা বাঁচায় এদের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ক্রীতদাসের জন্য রয়েছে ঈশ্বরের ভালবাসা। এরা একথা যদি না জানে তাহলে তারা বাইবেল পাঠ করেনি না হয় তার অর্থ বোঝে না—।'

এরপর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পালা।

জয়ী হয়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কনই। ইতিহাসের সে এক সন্ধিক্ষণ।

লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন সমস্ত জাতির ভোটে একথা ঠিকই। তবু তার প্রাপ্ত প্রায় বিশ লক্ষের কাছাকাছি ভোটের মধ্যে দক্ষিণীরা দিয়েছিল মাত্র চব্বিশ হাজারের মত ভোট। বাকি ভোট সবটাই উত্তরাঞ্চলের। এ এক আশ্চর্য ঘটনা যে নর্থ ক্যারোলিনা, আলাবামা, আর্কানসাস, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, লুইসিয়ানা, টেনেসি আর টেক্সাস থেকে প্রায় কোন ভোটই পাননি আব্রাহান লিঙ্কন। আরও আশ্চর্য ঘটনা ছিল। সে কথা জেনে স্বয়ং লিঙ্কনও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিকট আত্মীয় স্বজনরাও তাকে প্রায় ভোটই দেননি। তারা সকলেই ছিলেন ডেমোক্র্যাট দল সমর্থক। উত্তরাঞ্চলের বিপুল ভোটই নির্বাচিত করে সেদিন মহানতম প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে। এ লড়াই ছিল পরিষ্কারভাবে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের।

লিঙ্কন অবশ্য পুরো ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ভোট পান নি, তবে অনেক ভোটই তিনি পেয়েছিলেন।

ভোট গণনার শেষ লগ্নে দেখা গেল লিঙ্কন পেয়েছেন ১৮,৬৬,৪৫২-টি ভোট, ডগলাস ১৩,৭৬,৯৫৭টি ভোট, ব্রেকিনরিজ ৮,৪৯,৭৮১টি ভোট আর জন বেল ৫,৮৮,৮৭৯টি ভোট।

শেষ পর্যন্ত স্টিফেন এ. ডগলাসের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বীকে এইভাবেই সেদিন হারালেন লিঙ্কন।

কুটীরবাসী আব্রাহাম লিঙ্কন, দীন লিঙ্কন একথাই ইতিহাসে প্রমাণ করেছিলেন সেদিন সত্যিকারের উপযুক্ত গুণীজনের অবাধ সুযোগই

রয়েছে আমেরিকায় সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার। তাঁর মত এত দায়িত্বের বোঝাও অমেরিকার খুব কম প্রেসিডেণ্টকেই বহন করতে হয়েছে। লিঙ্কন ছিলেন এই গুরু দায়িত্ব বহন করার সবচেয়ে যোগ্য মানুষ। অথচ এই মানুষটিই একদিন হৃদয়বিদারী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বদেশবাসীর অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ায় তিনি অশেষ যশ আর তারই সঙ্গে বিয়োগান্ত নাটকেরও সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এতদিনে একজন নারীর আশাও পূর্ণ হল। তিনি লিঙ্কনেরই স্ত্রী মেরী টড লিঙ্কন ছাড়া কেউ নন। মেরী লিঙ্কন হলেন হোয়াইট হাউসের গৃহকর্ত্রী আর আমেরিকার প্রথমা রমণী ও নাগরিকা।

প্রেসিডেণ্ট পদে আসীন হলেও মহান মানব আব্রাহাম লিঙ্কনের মনে এক মুহূর্তের জন্যেও সম্ভবতঃ শান্তি ছিল না। ক্রীতদাসদের বেদনাময় জীবনের কথা অহরহ তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে চলেছিল। তার জীবনের এ শপথ পালন করতেই হবে তাকে—ক্রীতদাস প্রথা চিরতরে আমেরিকার বুক থেকে নির্মুল করতেই হবে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই লিঙ্কনের অন্তর অহরহ কেঁদেছিল অসহায় কালো মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্দশার ছবি দেখে। ১৮৩৯ সালে লিঙ্কন প্রচার করেছিলেন নানা পত্রপত্রিকা আর বইয়ের মধ্য দিয়ে সারা দেশে কি অমানুষিক আর নারকীয় অত্যাচার নিগ্রো-দাসদাসীদের উপর চালায় তাদের মালিকেরা। এই সব প্রচার পুস্তিকায় বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশও করা হয়। সেই ভয়ঙ্কর কাহিনীতে শিউরে উঠেছিল সমস্ত সভ্য জগত। আমেরিকার বুকে এ ছিল এক অভিশপ্ত কলঙ্ক।

ক্রীতদাসদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচারের বন্যা সারা দেশে বয়ে চলেছিল তা ছিল যেমন ভয়ঙ্কর আর তেমনই নিষ্ঠুরতায় ভরা। অবাধ্য ক্রীতদাসদের হাত ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে শাস্তিদান ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। উত্তপ্ত লোহাব শিকের সাহায্যে দেহের নানা জায়গা পুড়িয়ে চিহ্নিত করা ছিল আর এক নিষ্ঠুরতা। যখন তখন প্রহার তো সাধারণ ঘটনা। এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ করার ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না কোন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীর। ছুরি দিয়ে কোন অঙ্গহানি করাও তাই। এ ছাড়াও অবাধ্য ক্রীতদাসদের উপর হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেওয়া বা চাবুকের আঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত

করে চরম উল্লাসে ফেটে পড়াতে ছিল মালিকদের আনন্দ। কখনও কখনও জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত ক্রীতদাসদের। ক্রীতদাসদের জীবনের দাম গরু ছাগলের চেয়েও ছিল কম।

অন্যায় আর অত্যাচারে সারা আমেরিকার কালো মানুষরা আতঙ্কে জীবন কাটাত। তাদের এ অত্যাচার থেকে বাঁচার কোন পথ ছিল না। রমরম করত দাস বাজার। মায়ের বুক থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে অনায়াসে বিক্রি করে দিত দাস মালিকরা। দাসদের জীবনের ইতিহাস তাই রক্তক্ষরা পথ ধরেই এগিয়ে চলেছিল।

ক্রীতদাসদের মত অমানুষিক আর নির্মম ব্যবহার করা হত ক্রীতদাসীদের উপরেও। নারী বলে কোন রেহাই ছিল না হতভাগ্যদের। ক্রীতদাসীদের কাজে লাগানো হত কঠিন পরিশ্রম আর সন্তান জন্মদেওয়ার কাজে। এ জন্য তাদের অবাধে ব্যবহার করা হত যৌনসংসর্গে। যত সন্তান মালিকের ততই লাভ। অর্থের বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গ পুরুষরা সন্তান উৎপাদন করে চলত হতভাগ্য কালো ক্রীতদাসীদের। এ ব্যাপারে আপত্তি করলে ভাগ্যে জুটত তাদের অকথ্য, অবর্ণনীয় অত্যাচার। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে তাদের হত্যা করতেও হাত কাঁপত না শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের। এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারে শিউরে উঠত মানবাত্মা।

শ্বেতাঙ্গ শয়তানরা কালো ক্রীতদাসীদের মধ্যে যে সন্তানের জন্ম দিত তারা ছিল বর্ণসংকর। তারা না ছিল সাদা না কালো মানুষ। বাজারে এই তরুণী যুবতীদের চাহিদা ছিল দারুণ। ধনী শ্বেতাঙ্গ মালিকরা এই সব হতভাগ্য নারীদের অবাধে উপভোগ করে আনন্দ লাভ করে চলত সারা জীবন। কেউ এ কাজে বাধা দিতে পারত না। সারা সমাজই যেন প্রশ্রয় দিয়ে চলেছিল এই কুপ্রথাকে।

কলঙ্কের কথা এই ছিল যে দেশে এই ক্রীতদাস প্রথা যেন স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করত দেশের রাষ্ট্র প্রধান আর আইন রক্ষকরাও। কালো ক্রীতদাসরা তাদের মতে ছিল মানুষ নামের অযোগ্য। নাগরিক বলে পরিচিত হওয়ার অধিকার তাদের দেওয়া হয় নি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বুকানন আসীন থাকার সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মেরী ল্যাণ্ডের অধিবাসী রজার বি. ট্যানী 'ড্রেডস্কট' নামে এক মামলার রায়ে

বলেছিলেন, 'শ্বেতকায়দের তুলনায় একজন নিগ্রো এতই হীন যে সে কোন আদালতেই একজন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না।'

ক্রীতদাস প্রথার সবচেয়ে বড় দাবীদার ছিল উত্তর অঞ্চলের চেয়ে আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলই বেশি। অধিকাংশ দাসদের দক্ষিণেই নানা কাজে লাগানো হত। দক্ষিণের মালিকদের দাস ব্যবসার ফলে অর্থের প্রাচুর্য বাঁধ মানে নি। খামারের মালিক শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কাছে দাস ব্যবসা ছিল সৌভাগ্যের প্রতীক। নানা কুকাজ করত এই সব মালিকরা ক্রীতদাসীদের দিয়ে। এই কারণেই দাসপ্রথা বিলোপ করার কথায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। দাসব্যবসায়ীদের কাছে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করার অর্থ সর্বনাশ। যেকোন মূল্যেই তাই দক্ষিণীরা এটা বন্ধ করার বিরোধী হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই।

শ্বেতকায় মানুষ মাত্রেই সকলে দাসপ্রথা অবশ্যই সমর্থন করেন নি। বিখ্যাত বক্তা ওয়েনডেল ফিলিপ্স একবার বলেছিলেন, 'দক্ষিণী মানুষরা সারা দেশময় এক জঘন্য নারকীয় ব্যবসা চালিয়ে চলেছে ক্রীতদাসীদের বারাঙ্গনায় পরিণত করে। পাঁচ লক্ষ অসহায় কালো রমণী তাদের অত্যাচারের শিকার।'

এক ভয়ঙ্কর অবস্থাতেই পৌঁছেছিল তাই আমেরিকা। সভ্যতার এ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতারাও এ বিষয়ে বহু বক্তব্য রেখে চলেছিলেন কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর প্রথা দূর করার মত পারদর্শিতা কেউই দেখাতে পারেন নি। স্টিফেন ফস্টার নামে বিখ্যাত নেতাও বলেছিলেন, 'যাজকরাও এ কলঙ্ক থেকে মুক্ত নন এটাই চরমতম বিস্ময়। শুধু মেথডিস্ট চার্চের অধীন হয়েই দেশে আছে প্রায় অর্ধ লক্ষ হতভাগ্য ক্রীতদাসী। তাদের অধীনে রাখার উদ্দেশ্য যাজকদের একটাই, নিজেদের কাম লালসার প্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এ এক চরম রসিকতাই বলা যায়। এরা নিজেদের লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য হতভাগ্য কালো স্ত্রীলোকদের দীক্ষা দিতে আগ্রহ দেখাতে চায়।'

আব্রাহাম লিঙ্কন তাই চেয়েছিলেন এই জঘন্য অমানবিক প্রথাকে সমূলে আঘাত করতে। এ ছিল তার সারা জীবনের ব্রত। দাস-প্রথা নিয়ে বহুবার বক্তব্য রেখেছিলেন লিঙ্কন। তিনিও জানিয়ে-ছিলেন যারা আমেরিকায় প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি ক্রীতদাস বন্য

পশুর মত জীবন কাটায়। এদের মধ্যে অসংখ্য বর্ণসংকর।

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পর লিঙ্কনের মনে একটা চিন্তাই তাই জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছিল। তা হল ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি। তিনি হোয়াইট হাউসে পৌঁছনর পর তাই এ ব্যাপারে প্রচার শুরু হল। অসংখ্য আবেদন সম্বলিত পোষ্টার আর আবেদন প্রচার শুরু হল, কাগজে কাগজে লেখাও শুরু হল কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে।

এই সময়ে বিচিত্র এক ঘটনায় বহু মানুষের হৃদয়ে ধাক্কা লেগেছিল। ঘটনাটি একখানা বই। বইয়ের বিষয় ছিল ক্রীতদাস-দের জীবন নিয়ে লেখা এক করুণ কাহিনী।

বইখানি রচনা করেছিলেন দরিদ্র একজন অধ্যাপকের অসুস্থা কৃশ চেহারা স্ত্রী। নিজের অভিজ্ঞতা আর দেখে নেওয়া কাহিনী অবলম্বন করেই মহিলাটি রচনা করেছিলেন বইখানি। হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছিলেন লেখিকা।

এ বইখানির নাম 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'। হাজার হাজার আবেদন যা করতে সক্ষম হয় নি, হৃদয়বিদারক বইখানি যেন তার চেয়ে লক্ষগুণ পথে মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেল। জাগিয়ে তুলতে চাইল মানুষের চেতনা আর শুভবুদ্ধি। এমন বই লেখার কথা কেউই বুঝি ভাবতে পারে নি আগে। অদ্ভুত উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল সেদিন 'আঙ্কল টমস কেবিন'। লক্ষ লক্ষ বই বিক্রি হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল সেদিন বইখানি আমেরিকায়। সাহিত্যের দুনিয়ায় যা অভাবিত।

এ বই যিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ক্রীতদাসদের বেদনার কথা লিখেছিলেন তার নাম হ্যারিয়েট বীচার স্টো। আব্রাহাম লিঙ্কনও পড়েছিলেন বইখানি, পড়ে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন। পরে পরিচিত ও হয়েছিলেন লেখিকার সঙ্গে। কৃশ, রুগ্না মহিলাটি তাঁর পরম শ্রদ্ধাই সেদিন আকর্ষণ করেন।

লিঙ্কন লেখিকাকে দেখিয়ে এক সভায় উপস্থিত সকলকে বলেছিলেন, 'এই কৃশ চেহারার মহিলা একাকী এক বিরাট বৈপ্লবিক যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন, আর এটা তিনি করতে পেরেছেন শুধু মাত্র একখানা বই লিখে—।'

ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো এই ধরনের প্রচার সত্বেও কিন্তু ওই কদর্য প্রথার মোটেই বিলোপ ঘটেনি। বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষদের কোন শুভবুদ্ধি এর ফলে জেগে ওঠেনি। বরং তারা আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট পদে বসার ফলে। দক্ষিণীরা বুঝে নিল দাসপ্রথার অবলুপ্তি আসন্ন। এই কারণেই দক্ষিণ অঞ্চলে ক্রোধও ধূমায়িত হতে শুরু করে। তারা এটাই বুঝে নিয়েছিল হয় দাসপ্রথা না হয় তার অবলুপ্তি এর যেকোন একটা পথই নিতে হবে।

দক্ষিণীরা তাই বেছে নিল যেভাবেই হোক ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদ করতে দেয়া হবেনা। প্রয়োজনে ইউনিয়ন ছেড়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত শেষের পথই তারা বেছে নিল। লিঙ্কন নির্বাচিত হওয়ার ছ'মাসের মধ্যেই সাতটি দক্ষিণী রাজ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে বেরিয়ে নিজেরাই এক যুক্তরাজ্য গঠন করল। এর নাম দেওয়া হল 'কনফেডারেট স্টেটস অব আমেরিকা।' তারা একজন প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত করল। তিনি ছিলেন জেফারসন ডেভিস।

এব্যাপারে সবচেয়ে আগে, লিঙ্কনের ১৮৬০ সালের ৬ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের পরের ফেব্রুয়ারী মাসেই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পথ দেখায় সাউথ ক্যারোলিনা রাজ্য। এই রাজ্যকে স্বাধীন রাজ্য বলে অধিবাসীরা ঘোষণা করেছিল। এরপরেই আর ছটি রাজ্য।

এই ঘটনায় দারুণ বেদনা বোধ করেছিলেন লিঙ্কন। তাকে প্রায়ই তাই বিষণ্ণতায় মগ্ন থাকতে দেখা যেত। শরীরও তার খারাপ হয়ে পড়ে।

আমেরিকার ষোড়শ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৮৬১ সালের ৪ঠা মার্চ উদ্বোধনী ভাষণে আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে দেবার অধিকার কারও নেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম। কোন রাজ্যেরই যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই।' এরপরে তিনি আরও বলেছিলেন, 'দেশ আমাকে একটি জাহাজের অধিনায়ক করেছে, আমি চেষ্টা করব সেই জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।'

কিন্তু দুঃখেরই কথা তাঁর ওই বক্তব্য যারা সেদিন শুনেছিল, তাদের অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছিল, 'এই বেঢপ চেহারার কাঠুরে

'লোকটা কি সত্যিই জাহাজটা কূলে ভেড়াতে পারবে ?'

অথচ ইতিহাস সাক্ষী দয়ার্দ্র অথচ কঠিন সঙ্কল্পে অটল, অসাধারণ মনোবল সম্পন্ন মানুষটি অন্যায় অবিচার আর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়েই হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের সর্বজনপ্রিয় একজন মহান প্রেসিডেণ্ট। তিনি সাধারণ মানুষকে ভালবাসতেন আর তারাও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল আর বিশ্বাস করেছিল। প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর তার সহকারীরা বহুবার আব্রাহাম লিঙ্কনকে বলেছিলেন সরকারী কাগজপত্র রাজকীয় ভাষায় রচনার জন্য, কিন্তু লিঙ্কন চাইতেন সহজ সরল ভাষায় তা লিখতে। তিনি বলেছিলেন, 'এই ভাষাই জনসাধারণ বুঝতে পারে।'

এই সময় লিঙ্কন যেন কিছু অশুভ শক্তির প্রভাবও দেখতে পেয়েছিলেন। এসব ব্যাপারে তার বিশ্বাসও ছিল। দেশের মধ্যে যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল সেই ভাবনা তাকে অহরহ বিষণ্ণতায় মগ্ন করে তুলতো। নিজের মনের কথা মেরী লিঙ্কনকেও জানিয়েছিলেন লিঙ্কন। মেরী তাকে বারবার সাহস জোগাতে শুরু করেছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর লিঙ্কন একথাও উপলব্ধি করেছিলেন তার নীতি দেশের অনেকের কাছেই গ্রহণীয় নয়। প্রধানতম কারণটি ছিল ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের প্রস্তাব। এর ফলে বিশেষতঃ দক্ষিণী লোকেরা এমন কি তার যে প্রাণনাশ করতেও চায় সেকথাও জানতেন লিঙ্কন। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন প্রেসিডেণ্ট পদে কাজ করার জন্য ওয়াশিংটনে যাওয়ার পর তার জীবন নাশের চেষ্টা হবে। এর আরও জোরালো কারণ বর্তমান ছিল। নানা ধরনের ভয় দেখানো চিঠিও পেতে আরম্ভ করেছিলেন লিঙ্কন। এর মধ্যে আঁকা থাকত মড়ার মাথার খুলি। তাঁকে কোনদিন হত্যা করা হবে তার হুমকিও থাকত চিঠিতে। নানা ধরনের পোষ্টারেও একথা জানাতো সেই শয়তানেরা।

কিন্তু তাই বলে ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মত মানুষ কখনই ছিলেন না আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন যথাসময়েই। এবার তাই স্প্রিংফিল্ডের ডেরা তোলার কাজ করার কথা ভাবলেন তিনি। প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর এক বন্ধুকে তিনি চিঠি লিখে এখানকার বাড়ি আর

জিনিসপত্র নিয়ে কি করবেন সেকথাই জানিয়ে ছিলেন। এখানকার বাড়িতে যে থাকা আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয় এটা জানা ছিল তাঁর। হোয়াইট হাউসেই থাকতে হবে প্রেসিডেণ্টকে। লিঙ্কন তাই ঠিক করলেন স্প্রিংফিল্ডের বাড়িটি বিক্রি না করে বরং ভাড়া দিয়ে দেবেন। মেরীও তাই ঠিক মনে করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বাড়িটি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। স্প্রিংফিল্ডের জনৈক ভদ্রলোক সানন্দে লিঙ্কনের বাড়ি মাত্র নব্বই ডলারে ভাড়া নিয়ে সেটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন। বাড়ি ভাড়া দেওয়া হলেও লিঙ্কন পরিবারের আরও নানা আসবাবপত্র বাড়িটিতে ছিল। সেগুলোর বন্দোবস্ত করা দরকার লিঙ্কন ভাবলেন। সেগুলো কোনভাবেই যে হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, স্বাভাবিক কারণ তাতে প্রচুর খরচ। তাই লিঙ্কন দম্পতি অনেক ভেবে ঠিক করলেন কিছু আসবাবপত্র ভাড়া আর কিছু বিক্রি করে দেবেন। কিছু বন্ধুবান্ধবদের কাছে রাখার কথা ভাবলেন তাঁরা।

এই কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত স্প্রিংফিল্ড জার্নাল পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিলেন লিঙ্কন। যারা ইচ্ছুক তারা জ্যাকসন স্ট্রিটে লিঙ্কনের বাড়িতে এসে আসবাবপত্র দেখে যেতে পারেন বলে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হল। এ সবের মধ্যে ছিল নানা ধরনের জিনিস—যেমন কাঠেব আসবাব, চেয়ার, সোফা, আরাম কেদারা, চীনামাটির বাসনপত্র, কাচের পাত্র, বাহারি কার্পেট এমনই নানা জিনিস।

বিজ্ঞাপন বেরোনোর পব বহু ইচ্ছুক ক্রেতার আনাগোনা শুরু হল লিঙ্কনের বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত একজন ক্রেতা অধিকাংশ আসবাব কিনে নিলেন। গাড়ি করে ভদ্রলোক সবই নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। তিনি শিকাগো শহর থেকে এসেছিলেন ক্রেতা হয়ে। ভদ্রলোকের নাম ছিল মিঃ টিলটন।

এখানে অত্যন্ত একটা দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ না করে পারা যাবে না। যে ভদ্রলোক লিঙ্কন পরিবারের ব্যবহৃত আসবাবপত্র কিনে নিয়ে গেলেন তার অধিকাংশই ১৮৭১ সালে শিকাগোর সেই ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ এক অপূরনীয়

ক্ষতি। লিঙ্কনের স্মৃতি বিজড়িত ওই অমূল্য ভাণ্ডার এই ভাবেই শেষ হয়ে গেল।

বাকি জিনিসের মধ্যে কিছু কিছু কিনে নিলেন আরও কোন কোন ক্রেতা। এর মধ্যে হাতল ভাঙা একখানা চেয়ার একজন কিনেছিলেন মাত্র এক ডলার দিয়ে। সে চেয়ার আজও আছে, আর তার দাম অর্থের পরিবর্তে হয় না, এমনই অমূল্য সেটি।

আমেরিকার মহানতম প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের ব্যবহার করা যে কোন জিনিসই আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত। এ সবের মধ্যে লিঙ্কনের ব্যবহার করা জিনিসপত্রের মধ্যে রয়ে গেছে তার চিঠিপত্র, নির্দেশাবলীও। এ সবের মধ্যে অন্যতম হল লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে মেজর জেনারেল হুকারকে আমেরিকার প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে যে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন সেটি। সেই নিয়োগপত্র এক নীলামে বিক্রি হয় প্রায় দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে। লিঙ্কনের লিখিত নানা চিঠি আর সরকারী নির্দেশাবলী, টেলিগ্রামের অনেক গুলিই সযত্নে রক্ষিত আছে সংগ্রহশালায়। এ সবের ঐতিহাসিক মূল্য টাকার অংকে হয় না। হয় তো কোটি কোটি ডলারেও তার দাম দেওয়া যাবে না।

এই ভাবেই কেনটাকি অরণ্য প্রদেশের সকলের প্রিয় আব্রাহাম লিঙ্কন স্প্রিংফিল্ডেরও আপনার জন হয়ে উঠেছিলেন। এবার সেখানকার বসবাসকাল তার শেষ হয়ে এল। এবার ওয়াশিংটনে শুরু হতে চলেছে তার নতুন এক কর্মধারা আর জীবনযাত্রা। স্প্রিংফিল্ডের অধিবাসীরা সত্যিকার ভালবেসেছিলেন দীর্ঘকায় ওই দয়ার্দ্র মানুষটিকে। সেখানকার অধিবাসীরা ভাবতেন আমেরিকার এই মহানতম প্রেসিডেণ্টকে তারা কত কাছ থেকেই না দেখেছেন দীর্ঘ পনেরো ষোলো বছর ধরে।

লিঙ্কনের নির্দিষ্ট জীবনধারা স্প্রিংফিল্ড অধিবাসীদের কাছে খুবই পরিচিত এক দৃশ্য হয়ে উঠেছিল দীর্ঘ বছরের দিনগুলোয়। ভোর বেলায় তাকে দেখা যেত সওদা করতে চলেছেন লিঙ্কন। নানা জিনিসপত্র কিনে তাকে লোকে ফিরে আসতেও দেখত। নিজের হাতে কাজ করতে চরম আনন্দ পেতেন লিঙ্কন। কাঠ কেটে, গৃহপালিত পশুদের নিজের হাতে খাবার দিতেন তিনি। ঘরের

কোন কাজেই তার আপত্তি ছিল না। দীর্ঘ পথ হাঁটাও ছিল কাজের অঙ্গ। একাজে তার কণামাত্রও ক্লান্তি আসেনি কোনদিন। এইভাবেই সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে লিঙ্কন তার মা সারা লিঙ্কনকে দেখতে যেতেন ইলিনয়ে।

সৎমা সারা লিঙ্কনকে নিজের মায়ের মতই শ্রদ্ধা করতেন আব্রাহাম লিঙ্কন। সারা লিঙ্কন কিন্তু কোন দিনই চাননি তার সৎ ছেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। এক অদ্ভুত চিন্তাই তাকে পেয়ে বসেছিল। তিনি খালি ভাবতেন প্রেসিডেন্ট হয়ে লিঙ্কন ওয়াশিংটনে চলে গেলে এমন হয়তো কিছু ঘটে যাবে লিঙ্কনের জীবনে যার ফলে ছেলের সঙ্গে তার আর দেখাই হবে না এ পৃথিবীতে।

লিঙ্কন জানতেন আর কিছুদিনের মধ্যে তাকে দীর্ঘকালের জন্য স্প্রিংফিল্ড ছেড়ে চলে যেতে হবে। বারবার তাই তার স্মৃতিতে ভেসে উঠত স্প্রিংফিল্ডে আসা আর তার আগের জীবনের কথা। নিউ সালেমের স্মৃতি তাকে বেদনায় স্তব্ধ করে দিতে চাইতো। তার মনে জাগরূক ছিল তার সেই ভালবাসার পাত্রী অকাল প্রয়াণের ফলে যাকে তিনি হারিয়েছিলেন সেই অ্যান রুটলেজের কথা। সবই আজ হারিয়ে গেছে তবু সে স্মৃতি অম্লান ছিল লিঙ্কনের মনে। অ্যানকে তিনি কোন দিনই ভুলতে পারেন নি।

স্প্রিংফিল্ড ছেড়ে ওয়াশিংটন রওয়ানা হওয়ার আগে জনৈক বন্ধুকে লিঙ্কন বলেছিলেন, 'অ্যানকে আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। সে আছে আমার প্রতিটি রক্ত বিন্দু আর সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। ভালবাসার স্বাদ আমি অ্যানের কাছেই শুধু পেয়েছিলাম। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে আমার অ্যানের কথা মনে পড়ে।'

এবার বিদায় নেওয়ার পালা স্প্রিংফিল্ড থেকে।

নিজের সেই পুরানো অফিস ঘরের কথাও ভোলেননি লিঙ্কন। এই ঘরেই কাটিয়েছিলেন তিনি আইন ব্যবসার দিনগুলো। বিলি হার্নডনকে বললেন তিনি, 'আমাদের যৌথ কারবারের সাইনবোর্ড যেভাবে রয়েছে ওইভাবেই থাকুক। 'লিঙ্কন ও হার্নডন'-এর যৌথ ব্যবসার কোন পরিবর্তন হবে না। যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয়ই একদিন তবে ফিরে আসব, তখন আবার দুজনে একসঙ্গে আইন ব্যবসা চালাব।

ভাবব এর মাঝখানে কোন কিছুই ঘটেনি।

যাওয়ার প্রস্তুতিপর্বে লিঙ্কন নিজের হাতেই সব গোছগাছ করতে আরম্ভ করলেন। বাক্স, প্যাঁটরা নিজেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। প্রতিটি বাক্সে আর ট্রাঙ্কে নিজের হাতেই ঠিকানা লিখলেন, 'এ. লিঙ্কন, দি হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন, ডি. সি.।'

এই হল আব্রাহাম লিঙ্কনের ওয়াশিংটন যাত্রার সাদাসিধে বর্ণনা। কিন্তু যখনই তিনি তাঁর দুর্লভ অবসর মুহূর্তে চিন্তা করার সময় পাচ্ছিলেন তখনই উপলব্ধি করছিলেন যে দেশ এক সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধের উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। তিনি তাই মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন আর সঙ্কল্প নিলেন যদি কোন সম্মানজনক পথে সর্বাত্মক রক্তপাতের বিভীষিকা এড়িয়ে যাওয়া যায় তার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাবেন।

১৮৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী। ওই দিনই আব্রাহাম লিঙ্কনের সপরিবারে ওয়াশিংটন যাত্রা করার দিন। সকাল থেকেই সেদিন শুরু হয়েছিল হিমেল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্য দিয়েই এক ঝরঝরে গাড়িতে লিঙ্কন পরিবার 'গ্রেট ওয়েস্টার্নের' ইটের তৈরি ওয়াবাস ষ্টেশনে রওয়ানা দিলেন। সেখানে একটি মালরাখার, একটি ধূমপান আর একটি যাত্রীবাহী গাড়ি নিয়ে প্রেসিডেন্টের স্পেশাল ট্রেন অপেক্ষা করছিল।

গাড়ির পিছন দিকের দাঁড়াবার জায়গা থেকে লিঙ্কন দেখলেন সেই হিমঝরানো বৃষ্টির মধ্যেও অসংখ্য ছাতার তলায় হাজারে হাজারে উৎসুক মানুষ তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে সেদিন হাজির ছিল প্রায় পনেরো হাজার মানুষ। উপস্থিত বেদনার্ত মানুষেরা সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে একে একে লিঙ্কনের করমর্দন করে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগলেন।

ভালবাসা আর প্রীতির স্পর্শে মূক হয়ে গেছিলেন সেদিন আব্রাহাম লিঙ্কন। সকলের সঙ্গে বিচ্ছেদ বেদনায় তার মুখে প্রথমে কোন ভাষাই ফোটে নি। রুদ্ধ আবেগে সেদিন লিঙ্কনের চোখে নেমে এসেছিল অশ্রুধারা।

বিদায় লগ্নে অবরুদ্ধ কণ্ঠে সেদিন লিঙ্কন শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ', এই বিদায় বেলায় আমার হৃদয় আজ কতখানি ভারাক্রান্ত

তা আমার এই অবস্থায় না পড়লে কারও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জীবনে এত খুশি আর বিষন্নতা আমায় গ্রাস করেনি। এই জায়গা আর এখানকার সহৃদয় অধিবাসীদের কাছেই আমি আমার সব কিছুর জন্য ঋণী। এখানেই আমি আমার জীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বছর কাটিয়ে গেলাম, এখানেই আমি যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছেছি। আমার সন্তানেরাও এখানেই জন্মেছে। এখানেই তাদের একজনকে রেখে গেলাম মাটির বিছানায় শান্তিতে। আমি আপনাদের কাছ থেকে আজ চলে যাচ্ছি, আবার কবে ফিরে আসব তা জানি না। আমার এই জীবনের সব কিছুই সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই কৃপাতে সম্ভব হয়েছে। ওয়াশিংটনের চাইতেও গুরু দায়িত্ব আজ আমার উপর। সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি তাকে সাহায্য করেছেন তাঁরই কৃপা ভিন্ন আমারও কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি সহায়তা করলে আমি সফলকাম হবই। যিনি আমার সঙ্গে যাবেন, আপনাদের সঙ্গে থাকবেন এবং সর্বত্র সর্বকালে বিরাজমান সেই পরম করুণাময়ের উপর নির্ভর করেই আমি আশা করি সব-কিছুতেই তার মঙ্গলস্পর্শ ফুটে উঠবে। আমি আপনাদের তার হাতেই রেখে গেলাম, আপনারাও আমাকে তারই আশ্রয়ে সমর্পন করবেন এই আশা নিয়ে আমি আপনাদের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জানাচ্ছি।'

এরপর এসে গেল আসল বিদায় লগ্ন। ঘন্টা বাজিয়ে ট্রেনের যাত্রাধ্বনি শোনা গেলে ট্রেন এক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাষ্ট্রের রাজধানীর পথে ধীরে ধীরে কুয়াশার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

লিঙ্কন ওয়াশিংটন যাত্রা করার সময় চিন্তায় পড়েছিলেন অনেকে। আমেরিকার গুপ্তচর আর পুলিশ দপ্তর আশঙ্কিত ছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন ওয়াশিংটনে অভিষেক উৎসবে যোগদান করার সময় তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হতে পারে। বিশেষ করে যাত্রা পথে বাল্টিমোর শহরে। এক গোপন সূত্র পেয়েছিল পুলিশ বাহিনী। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনকেও সেই সতর্কবার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লিঙ্কনের শুভানুধ্যায়ীরাও তাই আশঙ্কিত হয়ে লিঙ্কনকে যাত্রার সময় আর পথ বদল করার অনুরোধও জানিয়েছিল যাতে অন্য কোন সময় তিনি রওয়ানা হন।

কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন ভীরুতার বিরুদ্ধেই চিরকাল লড়াই করে এসেছিলেন তাই এ অনুরোধ তিনি মানতে পারলেন না। মেরী লিঙ্কনও তাকে একা ছাড়তে রাজি হননি, তিনি বলেছিলেন একই সঙ্গে তাঁরা যাবেন। এই ভাবেই চলেছিল বিশেষ সতর্ক প্রহরায় সেই ট্রেন। ফিলাডেলফিয়ায় গোয়েন্দা পুলিশ বিশেষ সতর্কতার মধ্য দিয়ে পাহারায় ছিল। দায়িত্বে ছিলেন তখনকার আমেরিকার সব সেরা গোয়েন্দা অ্যালান পিঙ্কারটন।

সেনাবাহিনীও সতর্ক ছিল। কারণ তৎকালীন প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল উইনফিল্ড স্কটও আশঙ্কা করছিলেন লিঙ্কনের উপর কোন অতর্কিত আক্রমণ হতে পারে। এর প্রধান কারণ এই বিষয়ে অসংখ্য ভয় দেখানো চিঠি। স্কট তাই ভেবেছিলেন উদ্বোধনী বক্তৃতার সময়েই লিঙ্কন আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। এই কারণেই বহু মানুষ ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনে উপস্থিত থাকতেও বেশ ভয় পেয়েছিল।

এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তা বলাই বাহুল্য। জেনারেল স্কট কোন ঝুঁকি নেননি এই জন্যই। বিশেষ সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন জেনারেল স্কট। ক্যাপিটলের চারপাশে, বিশেষ করে লিঙ্কন যেখানে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করবেন তার ঠিক চারপাশে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেনাদল। অতি সতর্ক তাদের দৃষ্টি সততই দর্শকদের জরিপ করে চলেছিল অনবরত।

এক সময় আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণও শেষ হয়ে গেল। পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউর নির্দিষ্ট পথ বেয়ে লিঙ্কন ফিরে চললেন হোয়াইট হাউসের দিকে। সৌভাগ্যের বিষয় কোন নিষ্ঠুর আততায়ীর আক্রমণ ঘটেনি সেদিন। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, খুশি হলেন লিঙ্কনও।

আমেরিকার এক যুগসন্ধিক্ষণেই দেশের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। পরিস্থিতি সেসময় নানা দিক থেকেই জটিল হয়ে উঠেছিল। দেশের অর্থনীতির অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। এটা অবশ্য একদিনেই হয়নি। ১৮৬১ সালের আগে থেকেই এই অস্বাভাবিক অবস্থা জন্ম নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ পড়ে গিয়েছিল অবর্ণনীয় দুর্দশার মাঝখানে। অবস্থা এক সময় এমন আতঙ্কজনক

অবস্থায় এসে যায় যে উন্মত্ত জনতাকে সামাল দিতে সেনাবাহিনীর সাহায্য না নিয়ে উপায় ছিল না।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যেই আমেরিকার শাসন ক্ষমতায় বসেছিলেন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন। লিঙ্কন বুঝেও ছিলেন পরিস্থিতি কতখানি জটিল। হাজার হাজার মানুষ তার কাছে আসতে শুরু করেছিল নানা সাহায্যের আশায়। কেউ চাইত চাকরি, কেউ অন্য রকম সাহায্য। যেহেতু রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন লিঙ্কন, স্বাভাবিকভাবেই তাই দলীয় মানুষেরা আশা করছিল ডেমোক্র্যাট পন্থীদের বদলে তাদের পদ রিপাবলিকানরাই পেতে থাকবেন। এই কারণে প্রতিটি দিন অসংখ্য দর্শনার্থী আসতে শুরু করেছিল প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসেবে। বেশির ভাগ প্রার্থীই ছিল চাকরির উমেদার।

শুধু অসংখ্য মানুষ আর মানুষ। হোয়াইট হাউসে সারাটা দিনই ভিড় উপচে পড়ছিল। প্রত্যেকেই চায় তাদের আবেদন জানাবে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনেরই কাছে। বিচিত্র ছিল তাদের আবেদন। চাকরি ছাড়াও অর্থ সাহায্য, পোশাক সব কিছুই চাইত দর্শনপ্রার্থীরা।

হোয়াইট হাউসের কর্মচারি আর রক্ষীরা সত্যিই মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে উঠত। কারণ এই সব প্রার্থীদের ফিরিয়ে দিতে চাইতেন না লিঙ্কন এমনই তার সাধারণের প্রতি ভালবাসা। এদের মধ্যে বাজে লোকও স্বাভাবিকভাবেই ভিড় জমাতো। অনেক মজার ব্যাপারও ঘটে যেত মাঝে মাঝেই। নিরাপত্তা রক্ষীরা সতর্ক থাকত এজন্য।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

শত্রু মিত্রের মাঝখানে লিঙ্কন ● গৃহযুদ্ধের সূচনাপর্ব

হোয়াইট হাউসে থাকলেও লিঙ্কন চিন্তাভাবনার হাত থেকে রেহাই পাননি ক্ষণিকের জন্যও। দেশ যে ক্রমেই এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বুঝতে দেরী হয়নি প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের।

লিঙ্কনের সবচেয়ে বড় বিরোধী আর শত্রু হয়ে উঠেছিল নিঃসন্দেহে দক্ষিণী রাজ্যগুলোই। লিঙ্কন জানতেন ক্রীতদাসদের দাসত্ব থেকে চিরতরে মুক্তি তাঁকে দিতেই হবে, আর এর অনিবার্য পরিণতিতে দেশ হয়তো গৃহযুদ্ধের রক্তঝরা আগুনে পুড়ে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। যেকোন আমেরিকাবাসী তাই জানত আমেরিকায় ওই ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের কারণ একটাই—ক্রীতদাসদের মুক্তি। দক্ষিণীরা এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী যা তাই ঘটলো আমেরিকায় সেদিন। সত্যিই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ, বেজে উঠল দামামা। সারা আমেরিকার এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল অভূতপূর্ব উন্মাদনা। দেশের সমস্ত স্তরের মানুষই এই উন্মাদনার শিকার হয়ে পড়ল। শহর আর গ্রামে কোন তফাৎ ছিলনা।

নতুন করে ঘোষণা করা হল সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হবে। এর ফলে সেনানিয়োগ কেন্দ্রগুলোয় নেওয়া আরম্ভ হল নতুন সৈন্য। সেনাবাহিনী শুরু করল তাদের নিয়মিত কুচকাওয়াজ। প্রায় এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সৈন্যদলের লোকসংখ্যা প্রায় দুলক্ষের কাছে পৌঁছে গেল। সমস্যা সেনাবাহিনীর লোক সংখ্যা নিয়ে ছিলনা আদৌ, আসল সমস্যা দেখা দিল এক সুযোগ্য নেতৃত্বের। প্রধান সেনাধ্যক্ষ কে হবেন সরকারের কাছে সেটাই দাঁড়াল আসল সমস্যা।

প্রধান সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত একজন মানুষ অবশ্যই ছিলেন, তিনি রবার্ট ই. লী। লী সেই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মুহূর্তে উত্তরাঞ্চল, অর্থাৎ সরকারের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে বসেছিলেন। সেই মুহূর্তে সারা আমেরিকায় লীর চেয়ে দক্ষ, রণনিপুন যোগ্য সেনাধ্যক্ষ আর কেউই ছিলেন না। লী দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আব্রাহাম লিঙ্কন তাকেই প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ সময় চিন্তা ভাবনা করে লী শেষ অবধি দক্ষিণ অঞ্চলের বিপক্ষে নেতৃত্বদান করতে অস্বীকৃত হলেন। ইতিহাসের এ এক সন্ধিক্ষণই ছিল কারণ লী সঁরকারী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমেরিকার ইতিহাসই হয়তো অন্য রকম হতে পারত। ধর্মভীরু লী কিছুতেই নিজেকে দক্ষিণের শত্রু ভাবতে পারেন নি সেদিন।

লী নিজেও ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধেই ছিলেন, দাসপ্রথাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন আর সেই কারণে নিজে কোন দাস রাখতে চাননি। লিঙ্কনের সঙ্গে বহু বিষয়েই তার সম মনোভাব প্রকট ছিল। দেশকে ভালবাসতেন লী তাতে কোন সন্দেহই ছিলনা, দেশ ভেঙে পড়ুক কোন দিনই তা চাননি তিনি।

লীর জন্মস্থান ছিল দক্ষিণাঞ্চলের ভার্জিনিয়া প্রদেশ। এই রাজ্যটির অধিবাসীরা তাদের রাজ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করত। আর সেনাধ্যক্ষ লীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। জ্ঞানে, গরিমায় ভার্জিনিয়া অন্য সব রাজ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন ধারণাই তাদের ছিল। লী নিজে ছিলেন ভার্জিনিয়ার গভর্নরেরই ছেলে, ফলে এক ধরনের আত্মগর্ব আর উন্নাসিকতাও তার ছিল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত লী কোন অবস্থাতেই নিজের রাজ্য আর দক্ষিণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কিছুতেই রাজি হতে পারলেন না। গৃহযুদ্ধের ওই লগ্নে তাই সরকারের বিরুদ্ধবাদী দক্ষিণী অঞ্চলের ভাগ্য হয়ে গেল সুপ্রসন্ন কারণ তারা লাভ করলেন একজন অতি রণনিপুন সেনাপতি। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতেই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছিল প্রায় চার বছর ধরে।

লীর অভাব অনুভব করলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। কিন্তু করণীয় কিছুই এ অবস্থায় ছিলনা। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত সেনাধ্যক্ষর

দায়িত্ব দান করলেন লিঙ্কন ম্যাকডোয়েলকে। জনসাধারণের মধ্য থেকে ৭৫০০০ হাজার ভলান্টিয়ার নিয়োগ করলেন এবার লিঙ্কন। লিঙ্কন ঘোষণা করলেন যুদ্ধ হতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যই, ক্রীতদাস প্রথার জন্য কখনই নয়।

সারা দেশে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন আলোচনা ছিলনা। এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিরই জন্ম হয়েছিল সে সময়। দক্ষিণকে পরাজিত করে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখাই ছিল প্রধান কাজ।

জুলাইয়ের এক সকালে সেনাধ্যক্ষ ম্যাকডোয়েলের নেতৃত্বাধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী এগিয়ে চলল দক্ষিণের ভার্জিনিয়া রাজ্য আক্রমণ করার জন্য।

কিন্তু ভাগ্য একেবারেই সুপ্রসন্ন ছিলনা সরকারী বাহিনীর। লীর গোলন্দাজ বাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সেদিন ম্যাকডোয়েলের সৈন্যদল।

আব্রাহাম লিঙ্কন তার সহৃদয়তা, নিষ্ঠুরতা আর অবিচারের প্রতি এবং যুদ্ধের প্রতি ঘৃণার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তা সত্ত্বেও যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।

ছুটি যুযুধান দলের মধ্যে আদর্শ ও সাহসের অভাব কমই ছিল। অথচ আক্রোশের বশবর্তী হয়েই তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আশ্চর্য মনোভাব দেখা দিয়েছিল জনসাধারণের মধ্যেও। তারা যেন চড়ুইভাতি করতে চলেছেন এমন মনোভাব নিয়ে বুল রাণের যুদ্ধ দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল।

জুলাই মাসের এই বুল রাণের যুদ্ধে দারুণভাবে পরাজিত হল উত্তর অঞ্চলের সেনাবাহিনী। উত্তরের বাহিনী যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে যুদ্ধের ফলে।

লিঙ্কন ম্যাকডোয়েলকে সরিয়ে বাধ্য হলেন জর্জ বি. ম্যাকক্লেল্যানকে প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে। মাসের পর মাস ধরে ম্যাকক্লেল্যান বিশাল এক সেনাবাহিনীকে কুচকাওয়াজে নিয়োগ করলেন। কিন্তু যুদ্ধের তৎপরতা অপদার্থ ম্যাকক্লেল্যানের মধ্যে একেবারেই দেখা গেলনা। নিজেকে বিরাট কিছুই ভাবতেন ম্যাকক্লেল্যান।

বিশাল ওই সেনাবাহিনী প্রায় অলসতায় সময় কাটিয়ে চলেছিল,

সুযোগ পেয়েও তাদের শত্রু পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দান করেন নি সেনাধ্যক্ষ ম্যাকক্লেল্যান। এটা করা হলে লীর পক্ষে পরিস্থিতি সামলে নেওয়া অবশ্যই কঠিন হয়ে পড়ত।

ম্যাকক্লেল্যানের এই ধরনের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন লিঙ্কন। তিনি সেনাধ্যক্ষর কাছে যখন জানতে চাইলেন কেন সেনাবাহিনী আক্রমণ করছে না, ম্যাকক্লেল্যান জানালেন তার সেনাবাহিনী পরিশ্রান্ত। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সন্দেহ ছিল না। আসলে ম্যাকক্লেল্যান ছিলেন ভীরু, কাপুরুষ।

লীর চেয়ে বেশি সংখ্যায় সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি আক্রমণ করতে ভয় পেলেন। সমর দপ্তরের সেক্রেটারি স্ট্যানটন এই সময় ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'ম্যাকক্লেল্যানের দশলক্ষ সৈন্য থাকলেও সে বলতে পারে বিশ লক্ষ না হলে যুদ্ধ করবে না।'

ম্যাকক্লেল্যান মনে মনে ঘৃণাও করতেন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনকে। তার ধারণা ছিল তার যোগ্যতা ঢের বেশি। অত্যন্ত উদ্ধত আর অহঙ্কারী ছিলেন ম্যাকক্লেল্যান। লিঙ্কনকে বহুক্ষেত্রেই তিনি সরাসরি অপমান করতেও পিছপা হননি। একবার লিঙ্কন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠালেও সে আদেশ গ্রাহ্য করেনি ম্যাকক্লেল্যান। এমনই উদ্ধত ছিলেন তিনি।

যুদ্ধ অপ্রতিহত গতিতেই এগিয়ে চলেছিল মাসের পর মাস ধরে। দুপক্ষেই হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াল প্রচুর। লিঙ্কন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন এ সময়। তিনি জানতেন এই যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে দুপক্ষের হতাহতের সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাবে। লিঙ্কন মনে প্রাণে তাই চাইছিলেন একজন সুদক্ষ রণনিপুন সেনাপতি। ম্যাকক্লেল্যানের পক্ষে যে দক্ষতা চালানো কোন ভাবেই সম্ভব ছিলনা।

দক্ষিণী বাহিনীই যুদ্ধ জয় করে চলেছিল। ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত লড়াইয়ের মধ্যে ফ্লোরিডা, সেনানডোয়া উপত্যকা ফ্রেডারিকসবার্গ ও বুল রানের যুদ্ধে দক্ষিণী বাহিনীই সুবিধা লাভ করল। হতাহত হল অগণিত মানুষ।

কোনভাবেই যুদ্ধ সম্ভব হচ্ছিল না উত্তরাঞ্চলের পক্ষে। দুশ্চিন্তার কালোছায়া গ্রাস করে বসেছিল লিঙ্কনকে। নিদ্রাহীন অবস্থায় তিনি প্রায়ই পদচারণা করতেন আর গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতে চাইতেন।

সেনাবাহিনীর পরাজয় তাকে অস্থির করে তুলেছিল।

এরই সঙ্গে এক পারিবারিক শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন লিঙ্কন। তার এক সন্তান, ছেলে উইলী সংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। মেরী আর লিঙ্কন্ সারারাত জেগে অসুস্থ ছেলের সেবা করে চলেছিলেন দিনের পর দিন। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার বিষয় তাদের সেবাযত্নেও উইলী বেঁচে থাকেনি। সকলকে বেদনায় স্তব্ধ করেই উইলী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকে চলে গেল।

উইলীর মৃত্যু কঠিন আঘাত দিয়েছিল লিঙ্কন দম্পতিকে। মেরী দুঃখ আর শোকে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। লিঙ্কন দুঃখ ভুলে থাকার জন্য এই সময় শুধু আবৃত্তি করে চলতেন শেক্সপীয়ারের রচনা। সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনে শেক্সপীয়ারই তাকে সান্ত্বনা জোগাতে পেরেছিলেন।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট জীবন ও দাসপ্রথা বিরোধী আইন পাশ

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের জীবন কেটে চলেছিল এক বিচিত্র পথ ধরেই। লিঙ্কন কোনদিনই ধরা বাঁধা কোন আইনকানুনের অনুরাগী ছিলেন না। প্রেসিডেণ্ট হিসেবে তাঁর প্রেসিডেণ্ট প্রাসাদ হোয়াইট হাউসে কিভাবে দিন কেটেছিল তার কিছুটা চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় লিঙ্কনের একজন সেক্রেটারী জন হে'র লেখা ধারাবাহিক বিবরণ থেকে। লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের এই রোজনামচার মধ্য দিয়ে মানুষ লিঙ্কনের এক সুন্দর ছবি পাওয়া যাবে। এমন অন্তরঙ্গ রোজনামচা খুবই কম মেলে।

জন হে'র লেখায় দেখা যায় লিঙ্কন ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল জীবন-যাত্রার পূজারী। সরকারী আইন কানুনের বেড়াজাল তাকে আটকে রাখতে পারতো না। জন হে'র নিজের ভাষায় দেখা যায় তিনি লিখেছেন, 'প্রেসিডেণ্ট মিঃ লিঙ্কন ছিলেন আশ্চর্য একজন ব্যক্তিত্ব

সম্পন্ন মানুষ। আইন কানুনের ফাঁস সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। বহুক্ষেত্রে তাঁকে অনেক চেষ্টার মধ্য দিয়েই আইন মানার ব্যাপারে রাজী করাতে পেরেছিলাম। বাঁধা ধরা যে কোন আইন তার একেবারেই পছন্দ হত না। তারই রচিত আইন তিনিই ভাঙতে ভালবাসতেন সবার আগে।'

'এরই মধ্যে সবচেয়ে অসুবিধা ঘটত প্রেসিডেণ্টকে সাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। প্রেসিডেণ্ট কিছুতেই সাধারণ মানুষকে সরিয়ে রাখতে চাইতেন না। তিনি মানতে চাইতেন না এটাই সরকারী নিয়ম, নিরাপত্তার জন্যও এটা দরকার। জনসাধারণের প্রায় অবারিত দ্বার ছিল তাঁর কাছে। নানা আবদার আর অনুবোধ নিয়ে আসতো মানুষ। এর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ঝামেলাও হত, কিন্তু মিঃ লিঙ্কন সেসব গ্রাহ্য করতেন না। অসংখ্য চিঠিও আসতো তাঁর কাছে। সে সবের উত্তর লিখে দিলে তিনি তা সই করে দিতেন।'

'মানুষ হিসেবে মিঃ লিঙ্কন ছিলেন একজন হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব। অধস্তন কর্মচারিদের তিনি অকুণ্ঠচিত্তেই বিশ্বাস কবতেন কোন বকম সন্দেহ পোষণ করতেন না তাদের সম্পর্কে। বহুক্ষেত্রে যেসব ব্যাপাবে স্বয়ং প্রেসিডেণ্টের হস্তক্ষেপ প্রযোজন হত, মিঃ লিঙ্কন সেসব ক্ষেত্রেও কাছে নিয়োগ করতেন আমাদেরই। এক্ষেত্রে আমাদেব প্রচুর স্বাধীনতা ছিল।'

জন হে সেক্রেটারি হিসেবে আব্রাহাম লিঙ্কনকে খুবই কাছ থেকে দেখেছিলেন, তাই তাব লেখায় অন্তবঙ্গতাও লক্ষ্য করা যায়।

লিঙ্কনেব সারাদিনের কাজ কর্মের বিষয়ে আর ব্যক্তি চরিত্র সম্পর্কে হে আরও লিখেছেন, 'প্রেসিডেণ্ট মিঃ লিঙ্কন ঘুম থেকে উঠতেন অতি সকালে। এ তাঁর নিয়মিত অভ্যাসেই পরিণত হয়। গ্রামাঞ্চলে সৈনিকদের ব্যারাকেও কখনও কখনও তাদের উৎসাহ দেবার জন্য কাটাতেন তিনি। সে সময় তিনি খুব ভোরে শয্যাত্যাগ কবে প্রাতরাশ শেষ করে ওয়াশিংটনেব উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে বেবোতে ভুলতেন না।'

'খাদ্য গ্রহণ কবতেন অতি সামান্য প্রেসিডেণ্ট। সামান্য একটা ডিম, পাউরুটির টুকরো আর এক কাপ কফিই ছিল তার রোজকার প্রাতরাশের উপকরণ। শীতের ঠাণ্ডা দিনগুলোয় মিঃ লিঙ্কন হোয়াইট

হাউসেও একই নিয়ম মেনে চলতে চাইলেও সবদিন পেরে উঠতেন না। রাতে ভাল ঘুম হত না তার।'

'মিঃ লিঙ্কনের মধ্যাহ্নের আহার ছিল অতি সামান্য। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় সামান্য দু'একখানা বিস্কুটই ছিল তাঁর দ্বিপ্রাহরিক আহার। রাতের জন্যও নির্দিষ্ট থাকত সামান্য কিছুই। কিছু ফল আর এক গ্লাস গরম দুধ মাত্র। এমন স্বল্পাহারী কোন মানুষ আমাদের নজরে আসেনি।'

'প্রেসিডেন্ট মিঃ লিঙ্কনের সুরা বা মদে কোন রকম আসক্তি ছিল না। তিনি পান করতেন শুধু জল।'

'প্রেসিডেন্টের চিরকালীন ভালবাসা আর টান ছিল নানা ধরণের সভা সমিতি আর বক্তৃতা মঞ্চের অনুষ্ঠানে। আর ভাল লাগত তার থিয়েটার দেখতে। সুযোগ বা অবসর পেলেই প্রেসিডেন্ট চলে যেতেন সভা সমিতিতে, বক্তৃতা শুনতে আর কখনও নাটক দেখতে। এখানেই তিনি পেতেন একমাত্র অবসর আর বিশ্রাম।'

'শোনা যায় প্রথম জীবনে মিঃ লিঙ্কন ভালবাসতেন বই বা পত্রিকা পাঠ করতে। অথচ প্রেসিডেন্ট জীবনে তিনি কোন সংবাদপত্র পাঠ করতে চাইতেন না। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মিঃ লিঙ্কন বলতে চাইতেন, 'এ ব্যাপারে পড়ার কিছু নেই, আমি এ সম্পর্কে অনেকটাই বেশি জানি।'

'মিঃ লিঙ্কন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কোন সন্দেহ নেই। সাজ-পোশাক আর চালচলনে বিশিষ্টতা তাঁর হয়তো কোন কালেই ছিল না। মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী যাঁরা তাদের হয়তো তাইই হয়ে থাকে। আমেরিকার ইতিহাসে এমন সাধারণ অথচ অসাধারণ প্রেসিডেন্ট আর কেউই হয়তো দেখেন নি। নিজের চারপাশের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন মহান মিঃ লিঙ্কন।'

জন হে'র অন্তরঙ্গ বিবরণী এই রকমই ছিল।

এবার আমরা তাকাতে পারি লিঙ্কন ক্রীতদাস প্রথা চিরতরে বিলোপের জন্য কি করতে চলেছিলেন। হাজারো কাজের মধ্যেও ক্ষণিকের জন্য লিঙ্কন ভুলতে পারেন নি হতভাগ্য কালো ক্রীতদাস-দের কথা।

গৃহযুদ্ধ চলাকালীন লিঙ্কন বুঝতে পেরেছিলেন সারা পৃথিবী

বিশেষ করে ইউরোপ তাকিয়ে রয়েছে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের উপর। লিঙ্কন চাইলেন সকলের নজর অন্য দিকে প্রসারিত করতে।

সেই অধ্যাপকের ছোটখাট চেহারার স্ত্রী হ্যারিয়েট বীচার স্টো'র লেখা 'আঙ্কল টমস কেবিন' নামের বইটি ইতিমধ্যে ইউরোপের নানা ভাষায় পাঠকরা পড়ে ফেলেছিলেন। তারা আমেরিকায় ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক বর্বর অত্যাচারের কাহিনী পড়ে সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। সভ্য দুনিয়ায় এ ধরনের কাণ্ড চলতে পারে কেউ কল্পনাও করেনি। লিঙ্কন বুঝলেন সমস্ত মানুষের শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার এটাই সুযোগ। ক্রীতদাস প্রথা চিরতরে উচ্ছেদ করার কাজে তাই আর দেরী করা উচিত হবে না।

সমগ্র দেশকে রক্ষা করাই ছিল অবশ্য লিঙ্কনের প্রথম পবিত্র কর্তব্য। ১৮৬২ সালের যুদ্ধ পীড়িত অবস্থায় এ সত্ত্বেও তিনি জানতেন তাঁর দ্বিতীয় পবিত্র কর্তব্য হল ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদ করে কালো মানুষদের মুক্তি দান। ১৮৬২ সালের জুলাই মাস নাগাদ হাজারে হাজারে ক্রীতদাস দক্ষিণী অঞ্চল ত্যাগ করে উত্তরে পালিয়ে আসায় ক্যাবিনেটে আইন রচিত হল এই সব দাসদের উত্তরের সেনা-বাহিনীতে যোগদান করার অধিকার দিয়ে। এই সময় মহান লিঙ্কন প্রথমে ভেবেছিলেন দাসদের মুক্তি দান করার জন্য তাদের মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু—দক্ষিণীরা এটা কিছুতেই মেনে নেয়নি।

এই সময় লিঙ্কন তার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে, এমনকি তার ক্যাবিনেটের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই রচনা করলেন বিখ্যাত সেই 'এমানসিপেশান প্রোক্লামেশন' বা 'মুক্তি-সনদ'।

ক্যাবিনেটের সদস্যদের ঘোষণা পত্রের কথা জানাতে তারা একবাক্যে লিঙ্কনকে অনুরোধ জানালেন যে উত্তরের বাহিনী কোন যুদ্ধে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত ঘোষণাপত্র জারি করা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হবে না। কথাটা মেনে নিলেন লিঙ্কন। কারণ ইতিমধ্যে উত্তরের সেনাবাহিনী লীর কাছে পরাজিত হয়েছিল সেডার পাহাড় আর বুল রানের যুদ্ধে। লী ইতিমধ্যে পোটেম্যাক নদী অতিক্রম করে মেরী ল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন।

লিঙ্কন তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যদের বললেন যে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ

যে ঈশ্বর যদি আগামী যুদ্ধে তাকে জয়ী করেন তাহলে তিনি ধরে নেবেন ঈশ্বর ক্রীতদাসদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর উত্তরের বাহিনী দক্ষিণীদের বিরুদ্ধে অ্যান্টিয়েটামের যুদ্ধে জয়ী হল।

১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী লিঙ্কন তাই শুভদিন হিসেবে বেছে নিলেন। ওইদিন তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করলেন, করলেন আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময়।

এবার ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করলেন আব্রাহাম লিঙ্কন যুগান্ত-কারী ক্রীতদাসদের মুক্তি-সনদে তার সাক্ষর করতে। একাকী কিছুক্ষণ চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলেন লিঙ্কন। তারপর সমস্ত দ্বিধা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঐতিহাসিক সেই দলিলে তার অমূল্য সাক্ষর করলেন। মুক্তি পেল প্রায় চল্লিশ লক্ষ হতভাগ্য শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস। ১লা জানুয়ারী ১৮৬৩ সালে রচিত হল মানব ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। এই অমূল্য দলিল সমান ভাবেই যেন স্থান করে নিল প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রেরই মত।

নববর্ষের শুভদিনটিতে ঐতিহাসিক ওই দলিলে সই করার পর বললেন; 'কোন কারণে যদি আমার নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়, তাহলে সেটা হবে এই কাজেরই জন্য, আমার সমস্ত আত্মাই' এর জন্য উৎসর্গীকৃত।'

কিন্তু মানব সমাজের জন্য এই পরম কল্যাণময় কাজকেও সকলে আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে পারল না সেদিন। দেশবাসীদের অনেকেই লিঙ্কনকে নিন্দা করে চলেছিল। অত্যন্ত দুঃখেরও কথা রিপাবলিকান দলেও এ নিয়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়ে ছিল।

আব্রাহাম লিঙ্কন নিজেও স্বীকার করেছিলেন এই একটি কাজের জন্যই তিনি নিদারুণ দুশ্চিন্তা আর দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন অসংখ্য মানুষের বিরাগভাজন হয়েছেন। দুঃখের কথা আরো এই যে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য যার কাছ থেকে লিঙ্কন পেয়েছিলেন সেই হরেস গ্রীলও তার বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। গ্রীল প্রচার করতে শুরু করেন যে লিঙ্কনকে প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়ে তিনি এক মারাত্মক ভুল করেছেন।

শুধু এসব অপপ্রচার চালিয়ে সেদিন গ্রীলের মত অর্বাচীনরা থেমে

যাননি, তারা চেষ্টাও শুরু করেছিলেন লিঙ্কন যাতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। রিপাবলিকান দলও লিঙ্কনকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত করার পথ গ্রহণ করেছিল, তারা প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি কবতে চাইছিল প্রেসিডেন্টকে কাজ করতে দিতে।

সত্যিকার এক দুঃসময়েরই মুখোমুখি হয়েছিলেন ওই সময় লিঙ্কন। এ ছিল তার জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। হতাশার কালো ছায়া আবার তাকে গ্রাস করতে চাইছিল। চারদিকে তার শুধু বিরোধিতা আর বিরোধিতা। দুঃখে ভেঙে পড়ে লিঙ্কন সেদিন বলেছিলেন, 'ঈশ্বরই জানেন কিভাবে এই অন্ধকার দিন ছেড়ে আলোর মুখোমুখি হব— ।'

লিঙ্কনের দুঃখ আর দুশ্চিন্তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল রক্তক্ষয়ী সেই যুদ্ধের জন্যই। নানা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে চলেছিল উত্তরের সেনাবাহিনী। একে একে পবাজয়ের সামনে পড়ল উত্তরাঞ্চল সেনাদল ফ্রেডাবিকসবার্গ, চ্যান্সেলরভিলের যুদ্ধে। নিজের ঘরে বিশাল একখানা মানচিত্র রাখতেন লিঙ্কন। যুদ্ধের প্রতিটি অগ্রগমণ আব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখতে চাইতেন তিনি। সাবাদিন নানা সামরিক কৌশল সম্পর্কিত বই পডতেন লিঙ্কন, সুযোগ পেলেই যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় বসতেন সেনাপতিদের সঙ্গে।

কিন্তু এ সব সত্বেও তাব মন হাহাকাব করে উঠত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত আর আহত সেনাদের পরিবাবেব জন্য। দুশ্চিন্তায় শরীর ভেঙে পড়েছিল লিঙ্কনেব, চোখ বসে গিয়ে ওজনও কমে এসেছিল। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমি হয়তো আব কোনদিনই খুশি হব না।'

একদিন কুড়িজন সৈনিক পালিয়ে যাওয়ায় তাদেব প্রাণদণ্ডের আদেশে সই করার অনুবোধ জানালেন জনৈক জেনারেল। লিঙ্কন দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'আমেরিকার বুকে অসংখ্য ক্রন্দনরত বিধবা রয়ে গেছে, ঈশ্বরের দোহাই, আর তাদের সংখ্যা বাড়াতে বলবেন না আব বললেও তা আমি করব না।'

সময় পেলেই লিঙ্কন যুদ্ধে আহত সৈন্যদের দেখার জন্য, আর তাদের উৎসাহ দেবার জন্য হাসপাতালে যেতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, সামরিক শিবিরেও হাজির হতেন। সর্বক্ষণই তার টেবিলে থাকত একখানা বাইবেল, বারবার তিনি সেই বাইবেল পড়ে চলতেন।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ ॥

যুদ্ধজয়ী লিঙ্কন ও ক্রীতদাসদের মুক্তি

লিঙ্কনের চরম দুর্ভাগ্য আমেরিকার ইতিহাসের এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তেই তিনি বসেছিলেন প্রেসিডেন্টের পদে। সমগ্র দেশের উপর তখনই নেমে আসে গৃহযুদ্ধের করাল ছায়া।

ক্রীতদাসদের যন্ত্রণাময় পরাধীন পশুর মত জীবন কাহিনী লিঙ্কনকে বাধ্য করেছিল তাদের মুক্তি দানের শপথ নিতে। অত্যাচার আর নির্যাতনে ক্রীতদাসদের জীবনের কোন মূল্যই সেসময় ছিলনা। অথচ দেশের সম্পদের অনেকটাই গড়ে উঠেছিল এই সব কালো মানুষদেব পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে। দাস ব্যবসা তাই সেখানে হয়ে উঠেছিল এক লাভজনক কাজ। শত শত মাইল জুড়ে তুলোর খামার আর চাষের জমি ক্রীতদাসদের রক্ত ঝরানো পরিশ্রমে উর্বর হয়ে উঠত। তাই ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করার প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নেয়নি দক্ষিণীরা। এরই ফলে তারা গড়ে তোলে সেই প্রতিরোধ আর যার পরিণতিতে দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ।

ক্রীতদাসদের শ্রম ছাড়া দক্ষিণের কোন আবাদ বা খামারের কাজ চালানো ছিল নেহাত অসম্ভব। এক একটি খামার থেকে অন্য খামারের দূরত্বও ছিল কয়েক মাইল। এরই মাঝখানে গড়ে উঠেছিল তুলোর বাগিচা। এই তুলো ছিল সেরা এক ফসল। এই তুলোর ফসলের সাহায্যেই কোটি কোটি টাকার পাহাড় বানিয়ে চলেছিল দক্ষিণী খামার আর ক্ষেতের মালিক শ্বেতকায় প্রভুর দল। ক্রীতদাস-দের কান্না, ঘাম আর রক্তে মেশানো এই সম্পদে হতভাগ্যদের কোন অধিকার ছিল না।

প্রচণ্ড অর্থশালী ধনকুবের খামার মালিকদের একটা চিন্তাই শুধু কাজ করে চলেছিল, আরো ক্রীতদাস চাই। আরও ক্রীতদাসের অর্থও একটাই—আরো অর্থ আর সম্পদ। বিশাল প্রাসাদ গড়ে

উঠেছিল এক একটা খামারে। চরম বিলাস ব্যসনে সেখানে রাজার হালে বাস করতে অভ্যস্ত খামার আর ক্রীতদাসদের মালিকেরা। এক একজন মালিকের অধীনে ছিল দুশো থেকে তিনশ জন হতভাগ্য ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসী। এরই সঙ্গে খামারে থাকত হাজার হাজার গবাদি পশু, ঘোড়া। ক্রীতদাসদের এই সব গৃহপালিত পশুর চেয়েও কুৎসিত জীবন কাটাতে বাধ্য করা হত। মালিকরা অন্যদিকে জীবন কাটাত একজন রাজা মহারাজাব মত। নাচগান আর সুরাপানে তারা মত্ত হয়ে থাকত।

ক্রীতদাস প্রথা তাই আশীর্বাদই হয়ে উঠেছিল দক্ষিণী অঞ্চলের মানুষের কাছে। এই প্রথা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব তাই দক্ষিণীদের প্রায় ক্রোধে অন্ধ করে তুলেছিল। তারা তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ না করে পাবেনি। তাই ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হওয়ার অর্থ ছিল খামার মালিকদের প্রায় ধ্বংস হওযার সামিল।

কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন অন্য ধাতুতে তৈরি মানুষ। কোন হুমকির কাছে মাথা নত করতে চাননি তিনি। তিনি দক্ষিণীদের মনোভাবের উত্তরে বলেছিলেন, 'ধনী হতে ইচ্ছুক হলে নিজে পরিশ্রম করেই তা হওয়া উচিত। কোন মানুষকে পশুব মত পরিশ্রম করানোর অধিকার কারও নেই।'

লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরমুহূর্তেই তাই দক্ষিণীদের মধ্যে আতঙ্ক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারা ইউনিয়ন ছেড়ে আলাদা রাষ্ট্র গড়ে তোলে আর শেষ অবধি শুরু হয়ে যায় এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। লিঙ্কনকে সমর্থন করেছিল উত্তরের রাজ্যগুলো। এই যুদ্ধে লিঙ্কন বিরাট সমর্থন আর সহায়তা পেয়েছিলেন হ্যারিয়েট বীচার স্টো'র লেখা 'আঙ্কল টমস কেবিন' বইটি থেকে। এ বই যেন মানুষের চোখ খুলে দিয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে সাহায্য করে মানুষকে। এই একটি বই যেন বিরাট এক যুদ্ধ জয় করার কাজই করেছিল সেদিনের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আমেরিকায়।

এই ভাবেই একদিন দক্ষিণীবাহিনী জেনারেল লীর নেতৃত্বে প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল সামটার দুর্গ আক্রমণ করে। দক্ষিণীবাহিনী সামটার দুর্গ দখলও করে নিয়েছিল সেদিন।

যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশেই। হাজারে হাজারে

তরুণ আর যুবক সৈন্যদলে যোগদান করল সেদিন। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু সেদিন দুঃখে ব্যথিত করে তোলে লিঙ্কনকে।

লিঙ্কন মনে প্রাণে চাইছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি। একে একে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করলেন ম্যাকডোয়েল, ম্যাকক্লেল্যান, বার্নসাইড, হুকার আর মীডকে। কিন্তু রণনিপুন দক্ষিণী সেনাপতি লীর কাছে কেউই সুবিধা করতে পারেনি।

উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণের অনেক বিষয়েই সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে তফাৎ খুবই প্রকট হয়েও উঠছিল সুবিধা ঢের বেশিই ছিল উত্তরাঞ্চলের। উত্তরাঞ্চল ইচ্ছে মত বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করতে পারছিল, তাদের যথেষ্ট সংখ্যায় বাণিজ্য জাহাজ আর যুদ্ধ জাহাজও থাকায় একাজে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় সুবিধা দাঁড়িয়েছিল দক্ষিণীদের সমস্ত বন্দর অবরোধ।

এই অবরোধ দক্ষিণী অঞ্চলের কাছে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। যে কোন বন্দর অবরুদ্ধ থাকায় বিদেশী পণ্য আনা অসম্ভব হয়ে ওঠে দক্ষিণেব কাছে। এর ফলে দক্ষিণ অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল দারুণ অভাব আর তারই পরিণতিতে মুদ্রাস্ফীতি। আরও গভীর সঙ্কটে পড়েছিল দক্ষিণাঞ্চল—এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ অর্থকরী ফসল তুলো ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানী করাও অবরোধের ফলে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর পরিণতিতে দেখা দিতে শুরু করেছিল গভীর অর্থ নৈতিক এক সঙ্কট। খাদ্যাভাবও দেখা দিয়েছিল নানা অঞ্চলে।

ক্রমে অবস্থা একটু একটু করে এমনই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল যে দক্ষিণী বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হতেও শুরু করল। দলে দলে কালো মানুষদের যুদ্ধে লাগানো হওয়ায় খামারে আর কারখানায় দেখা দিলো লোকাভাব। এই চরম শ্রমিকের বা লোকাভাবের আরও একটা কারণ বর্তমান ছিল। কারণ দক্ষিণীরা অতিরিক্ত মাত্রায় ক্রীতদাসদের উপরেই শ্রমসাধ্য কাজেব ব্যাপারে নির্ভরশীল থাকায় নিজেরা কোন কাজে সমর্থ ছিল না। এর বিষময় ফল দেখা দিয়েছিল যুদ্ধের সময়।

দক্ষিণের ধনী বিলাসী সম্প্রদায়ের কাছে ক্রীতদাসদের অভাব অত্যন্ত জটিল সমস্যাই হয়ে ওঠে। দক্ষিণের যুবশক্তিকে ইতিমধ্যেই লাগানো হয়েছিল যুদ্ধে। সঙ্গে ক্রীতদাসদেরও সেনাবাহিনীতে

নিয়োগ করায় প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দেয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও।

এরই মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যাপার জড়িয়ে ছিল। ক্রীতদাসরা যুদ্ধে পরাজিত হলেও তারা দীর্ঘদিন যাবৎ বুঝতে পারেনি যে এই যুদ্ধ তাদেরই মুক্তি সংগ্রাম। খামার আর ক্রীতদাসদের মালিকেরা সযত্নে এ তথ্য ক্রীতদাসদের কাছে গোপন রেখেছিল। তবু একটা ব্যাপার ঘটে যায়, দলে দলে ক্রীতদাস যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সুযোগ পেলেই উত্তরাঞ্চলে পালাতে শুরু করে। আরও বেদনাব কথা ক্রীতদাসরা মনে করত প্রভুর সেবাই তাদের জীবন তাই মুক্তির কথা তারা বিশ্বাসই করত না হয়তো।

যুদ্ধ এগিয়ে চলেছিল ইতিমধ্যে। এই সময়েই সৌভাগ্য দেখা দিল উত্তরাঞ্চলের পক্ষে। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ রণনিপুন সেনাপতিকেই। এরই জন্য যেন অপেক্ষায় ছিলেন লিঙ্কন। সেই সেনাধ্যক্ষ হলেন ইউলিসিস এস. গ্রাণ্ট। গ্র্যাণ্টের বীবত্বের আব দক্ষতাব ফলশ্রুতিতেই যুদ্ধের চাকা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

জেনারেল গ্র্যাণ্ট একে একে বিজয়ী হলেন ফোর্ট হেনরী আর ফোর্ট ডনেলসনেব যুদ্ধে। যুদ্ধেব গতি বদলেও যেতে শুরু করল।

ইউলিসিস এস গ্র্যাণ্ট ছিলেন অত্যন্ত কঠোর নিযমানুবর্ত্তী, নিষ্ঠুর দুধর্ষ একজন যোদ্ধা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেশি বকম ধূমপায়ী আর মদ্যপও। অথচ বিচিত্র জীবন কাটিয়েছিলেন প্রথমে গ্র্যাণ্ট। দেনায প্রায় তলিয়ে গিযেছিলেন এক সময়। মানুষ তাকে এড়িয়ে চলতে চাইত। সমব দপ্তর থেকে এক সময় ছাঁটাইও হতে হয় গ্র্যাণ্টকে। জীবনধারণের জন্য ডিম বিক্রি থেকে শুরু করে হাঁস মুরগী বিক্রিও তাকে এক সময় করতে হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় বক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াব পর গ্র্যাণ্ট আবার সমর দপ্তরে চাকরির আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদন মঞ্জুর হলে উচ্চপদেই নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এটা সেদিন ঘটেছিল কাবণ ইউলিসিস এস গ্র্যাণ্টই শেষ পর্যন্ত দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বক্ষা কবেন। তিনি প্রায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। লী শেষ পর্যন্ত তারই কাছে আত্মসমর্পন কবতে বাধ্য হন।

১৮৬৩ সালের শরৎকালে গ্র্যাণ্টের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চল বাহিনী চাটামুগায় জয়ী হল। পরের বসন্তকালে গ্র্যাণ্ট তীব্র আক্রমণ চালালেন রিচমণ্ড, ওয়াইলডারনেস, স্পট সিলভানিয়া আর কোল্ড হারবারে। লিঙ্কন আবেদন জানালেন নাগরিকদের কাছে আরও বেশি সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে।

ইতিমধ্যে দেশের মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কনকে ভাল বাসতে আর বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল, তারা তাই পাশে এসে দাঁড়াল লিঙ্কনের। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হল : 'আমরা আসছি, আমারা লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমারই সঙ্গে, ফাদার আব্রাহাম ·।'

১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের সভায় আব্রাহাম লিঙ্কনের সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হযে রূপ নিল। ওই সভায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে একটি ধারা সংযোজিত হল যাতে বলা হল চিরদিনের জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতটি অংশে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হল।

১৮৬৫ সালের ৪ঠা মাচ লিঙ্কন বক্তৃতায় বললেন . 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ অচিরেই শেষ হোক·· কারও প্রতি বিদ্বেষ না রেখে, সকলের প্রতি দয়াদ্র হয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গেই আমি বলছি ঈশ্বব আমাদের সঠিক পথই নির্দেশ করেছেন। জাতির ক্ষত নিরাময় কবাই আমাদের কর্তব্য—যুদ্ধে যারা নিহত আর আহত তাদের পরিবারকে আমাদেরই লালন করতে হবে। এই ভাবেই সকল জাতির সঙ্গে বহু আকাঙ্খিত ন্যায় ও শান্তি আসতে পারে।'

যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছিল তাতে সন্দেহের কারণ ছিলনা। সৈন্য আর রসদ, ওষুধ পত্রের অভাবে দক্ষিণীরা তখন বিপর্যস্ত। উত্তরাঞ্চলের রণনিপুন সেনাধ্যক্ষ গ্র্যাণ্টের রণকৌশলেও তারা স্তম্ভিত। তবুও যুদ্ধ তখনও তো শেষ হয় নি। সেনাপতি শেরম্যান এবার জর্জিয়ায় অভিযান চালালেন, এরপরেই দক্ষিণী সেনাধ্যক্ষ লী পশ্চাদাপসরণ করতে থাকেন। ১৮৬৫ সালের ৩রা এপ্রিল গ্র্যাণ্টের সেনাবাহিনা বিজয়গর্বে প্রবেশ করল রিচমণ্ডে।

এখানেই দক্ষিণী বাহিনীর সমস্ত প্রতিশোধ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। লী বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করলেন ৯ই এপ্রিল তারিখে। লীর সেনাবাহিনী গেটিসবার্গে পালিয়ে গেল।

ওইদিন পরাজিত সেনাপতি জেনারেল লী উত্তরের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ইউলিসিস গ্র্যান্টের কাছে অ্যাপোটোম্যাক্স কোর্ট হাউসে আত্মসমর্পন করার জন্য হাজিব হলেন। বিচিত্র এক দৃশ্যই সেদিন ফুটে উঠেছিল। গ্র্যান্ট তার পুরনো বন্ধুব সঙ্গে পুবানো দিনের কথায় মেতে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত পরাজিত সেনাধ্যক্ষ লীই তাঁকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে আত্মসমর্পন চুক্তি সাক্ষবিত হল।

সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এক আনন্দ শিহরণই যেন বয়ে গেল। ভযঙ্কর সেই রক্তক্ষযী লড়াই আজ শেষ নীলাভ আব ধূসব পোশাক পরিহিত সেনাদল আর পরস্পরকে আক্রমণ কববে না। ইউনিয়ন বক্ষা পেয়েছে। মুক্তি পেয়েছে ক্রীতদাসেরা। আব্রাহাম লিঙ্কনকে মানুষ মানুষেব বন্ধু আর অত্যাচারিত মানবাত্মার রক্ষাকর্তা বলেই ঘোষণা করল।

লিঙ্কন দক্ষিণের তথাকথিত রাজধানী বিচমণ্ডে গিয়েছিলেন এরপব। তার নজবে পড়ল একদল নিগ্রো মাটি খুঁড়ে চলেছে। তাদেবই একজন লিঙ্কনকে দেখেই ছুটে এসে চিৎকাব করে উঠল 'ভগবানকে ধন্যবাদ, আমাদের মুক্তিদাতা আজ এসেছেন! ভগবানের সন্তানদের মুক্ত কবতেই তিনি এসেছেন। জযতু ভগবান।' বৃদ্ধ নিগ্রো এবপব ঝাঁপিয়ে পড়েই জড়িযে ধবল লিঙ্কনেব পা দুটি। তাব পাশে আবও অসংখ্য কালো মানুষই তাই কবল। লিঙ্কন বলে উঠলেন, 'আমাকে নয়, ঈশ্ববের কাছেই প্রার্থনা জানাও, তিনিই তোমাদের মুক্তিদাতা তাকেই ধন্যবাদ জানাও মুক্তিব জন্য!'

এরপর সেই সন্ধি সাক্ষরেব কাহিনী। লিঙ্কন দক্ষিণেব প্রতি কোন রকম ঘৃণা পোষণ কবেন নি। তিনি খোলাখুলি ভাবেই দক্ষিণের সেনাবাহিনীব সাহস আর বীর্যেব জন্য প্রশংসা কবেছিলেন বারবাব। সেনাধ্যক্ষদেরও দারুণ প্রশংসা করেন তিনি। স্টোন ওযাল জ্যাকসন সম্পর্কে লিঙ্কন বলেছিলেন, 'একজন সাহসী আর সৎ সৈনিক।' একবার ববার্ট ই লীর কোন ছবি লক্ষ্য করে লিঙ্কন বলেন, 'ইনি একজন সাহসী আর মহান ব্যক্তি।'

লিঙ্কনেব হুকুমে লীর সঙ্গে সন্ধি পত্রে সাক্ষর করেন গ্র্যান্ট। এক্ষেত্রে বিস্ময়কর উদারতা দেখিযেছিলেন মহান আব্রাহাম লিঙ্কন। চিরাচবিত প্রথা ভঙ্গ করেই তিনি পরাজিত সেনাধ্যক্ষ জেনারেল লীকে

সশস্ত্র হয়ে সসৈন্যে রাজধানীতে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন কোন সৈনিকের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেয়ে বড অসম্মান হয় না। চিরস্থায়ী শান্তির আশাতেই লিঙ্কন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন আর দক্ষিণীরাও তার এই উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ছিল মহান লিঙ্কনের এক আশ্চর্য দূরদর্শিতা কোন সন্দেহ নেই।

আমেরিকার আকাশে বাতাসে আবার দেখা দিয়েছিল শান্তির মেঘমালা। এতদিন পরে সত্যিকার শান্তি পেয়েছিলেন লিঙ্কনও। ওই আত্মসমর্পণ চুক্তি সাক্ষর করার দিনটিতেই তিনি 'রিভার কুইন' নামে একটি জাহাজে ওয়াশিংটন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

জাহাজের এক নির্জন অংশে লিঙ্কন ডুবে গিয়েছিলেন সেই মুহূর্তে তাঁর প্রিয় গ্রন্থকার শেকস্‌পীয়ারের রচনার মধ্যে।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

লিঙ্কনের ক্যাবিনেটের সঙ্গীরা

প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পর বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল লিঙ্কনের প্রায় সব সময়েই। লিঙ্কন নিজে ছিলেন একান্ত সৎ আর মহৎ এক ব্যক্তিত্ব। কারও কোন উপকার তিনি কখনই বিস্মৃত হন নি। এরই সঙ্গে তিনি যাপন করতেন অতি সরল আর বিলাস বর্জিত জীবন। প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি।

অহঙ্কার বর্জিত, সহজ সরল এই মানুষটি তবুও অনেকেরই ঈর্ষা আর ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তার ক্যাবিনেটের সদস্যরা তাকে প্রতি মুহূর্ত নানা অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করতে কোন ত্রুটি রাখেন নি। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের নিরহঙ্কার সরল জীবনকে তারা ঘৃণার চোখেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তারা আড়ালে একথাও বলতে ছাড়েন নি যে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন ভদ্রভাবে আহার করার পদ্ধতি ও জানেন না।

লিঙ্কনের কাছে তার পরিচিত জনের অবারিত দ্বার ছিল।

লিঙ্কনের বহু পুরনো পরিচিত মানুষ হোয়াইট হাউসে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এই ভাবেই একদিন হোয়াইট হাউসে হাজির হলেন একজন জীর্ণ পোশাক পরিহিত, অবিন্যস্ত চুল একজন বৃদ্ধ মানুষ লিঙ্কনের সঙ্গে দেখা কবার উদ্দেশ্য। লোকটিকে নিরাপত্তা রক্ষীরা কিছুতেই হোয়াইট হাউসে ঢুকতে দিতে রাজি হল না। সেই বৃদ্ধও ছাড়লেন না বাববার বলতে লাগলেন, 'আমি আবের বন্ধু। তাকে খবব দাও, জানাও চার্লি দেখা করতে এসেছে।'

শেষ পর্যন্ত লিঙ্কনকে খবব পাঠানো হতেই তিনি নিজে ছুটে এসে পুবনো বন্ধুকে প্রায় টেনে নিয়ে গেলেন নিজেব কামরায়। বন্ধুব সঙ্গে এরপব পরিচয়ও করিয়ে দিলেন ক্যাবিনেটের সহকর্মীদের সঙ্গে। নিজেব অতীতেব সেই আনন্দময় দিনগুলোব কাহিনী সবিস্তারে সকলকে শুনিয়েও দিলেন, কিভাবে এই বন্ধু চার্লি তাকে সাহায্য করেছিলেন।

অন্যান্য সমস্ত মানুষেব সঙ্গে আব্রাহাম লিঙ্কনেব তফাতটুকু তাই নজবে না এসে পাবে না। প্রায় সব মানুষই দুঃখময অতীতকে ভুলে যেতেই অভ্যস্ত, কিন্তু লিঙ্কন কখনই অতীতকে বিস্মৃত হন নি। যাব কাছে কোন দিন সামান্যতম উপকার পেযেছেন তার কথা সবিস্তাবে বারবার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ছোটবেলা আব কৈশোরেব দাবিদ্র্যের স্মৃতি তিনি কোনভাবেই ভুলতে পারেন নি। তিনি ভুলতে পারেন নি একদিন অঙ্কের একখানা বইকেনার সামর্থ্যও তার ছিল না। কৈশোরের সেই সব স্মৃতি চিরদিনেব মতই লিঙ্কনের মনে জেগে ছিল। সুযোগ পেলেই সেদিনের উপকারী বন্ধুদেব স্মৃতি রোমন্থন কবে আনন্দ পেতেন।

লিঙ্কনেব ক্যাবিনেট সহযোগীবা, প্রায অধিকাংশ সদস্যই নানা সময়ে তাকে বিদ্রুপ কবতে চাইতেন। বিশাল আকাশেব মত নিরহঙ্কাব, সহজ সরল এই মানুষটিকে তাবা ঈর্ষা করতেন তাতে সন্দেহ ছিল না। তাদের ধাবণা ছিল লিঙ্কনের চেয়ে তারাই শ্রেষ্ঠ, লিঙ্কন তাদেব ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা দিচ্ছেন। আশ্চর্য ব্যাপাব হল, এই সব সদস্যরা শুধু লিঙ্কনকেই নয় তাবা ঈর্ষাপবাযন ছিলেন পরস্পরেব প্রতিও। প্রত্যেকেই তারা অপবের তুলনায় নিজেকে যোগ্য বলে ভাবতে চাইতেন।

এই সব ঈর্ষাপরায়ন ক্যাবিনেট সদস্যরা সব সময়েই একে অপরের ত্রুটি ধরায় ব্যস্ত থাকতেন আর সুযোগ পেলেই অন্যের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পরস্পর ঝগড়া আর নিন্দাবাদ ছিল এদের দৈনন্দিন কাজ। তবে একটি ব্যাপারে তারা সবাই ছিলেন একমত—লিঙ্কন সম্পূর্ণ অযোগ্য একজন প্রেসিডেন্ট, গ্রাম্য ভাবধারায় মানুষ, সম্পূর্ণ রুচিহীন। ক্যাবিনেট সদস্যরা প্রত্যেকেই ভাবতে চাইতেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তি তিনিই।

বিচিত্র এক পরিস্থিতিতে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ঈর্ষাপরায়ণ আর অলস মানুষ পরিবৃত হয়েই ছিলেন লিঙ্কন। সহজ সরল নিরহঙ্কার লিঙ্কন এ বিষয়ে অবহিতও ছিলেন।

ক্যাবিনেটে যে সব সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সেই সিউয়ার্ড। সিউয়ার্ড ছিলেন সেক্রেটারী অব স্টেট। সিউয়ার্ডের ঈর্ষাপরায়ণতা সম্ভবতঃ আর সকলের চেয়েও ঢের বেশি ছিল। কারণ সিউয়ার্ড কোনভাবেই বিস্মৃত হন নি একদিন লিঙ্কনের কাছে পরাজিত হওয়াতেই তার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়া সম্ভব হয় নি। হরেস গ্রীলের শেষ লগ্নের বিরোধিতা তাকে একদিন চরম পরাজয়ের তিক্ততা সহ্য করতেই বাধ্য করেছিল। সিউয়ার্ড সময় ও সুযোগ পেলেই লিঙ্কনের বিরুদ্ধে অবিরাম বিষোদগার করে তার চরিত্র হনন করতে চাইতেন। তিনি প্রচার করতেন আমেরিকার শাসনের কাজ চালান আসলে তিনিই, লিঙ্কন শুধু নামেই প্রেসিডেন্ট, একজন ক্লীব, কাপুরুষ, গ্রাম্য মানুষ লিঙ্কন।

সিউয়ার্ড আরও প্রচার করতেন দেশের সর্বেসর্বা আসলে তিনিই কাগজেও এ ধরণের প্রচার চলেছিল। এ সব সহ্য করতে পারতেন না মেরী লিঙ্কন। লিঙ্কনের এ অপমানে তিনি জ্বলে উঠতেন। কিন্তু লিঙ্কন হাসিমুখেই সিউয়ার্ডের সমস্ত ঔদ্ধত্য সহ্য করতেন, তার কাজে বাধা দিতেন না। একবার তিনি শুধু বলেছিলেন, 'সিউয়ার্ড অবশ্যই জানেন তিনি আসলে কি। আমি আমাকে জানি। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আমার কর্তব্য সমাধা করার কাজে আমি যোগ্য লোক কিনা'।

অহঙ্কারী ঈর্ষাকাতর সিউয়ার্ডকে অবশ্য ইতিহাস মনে রাখেনি, মহান লিঙ্কনের পাশে সে এক ক্ষুদ্র কীট মাত্র। লিঙ্কনকে যেখানে

একজন মহান মানুষ হিসেবে মানুষ মনে রেখেছে সিউয়ার্ড সেখানে অতি নগণ্য এক ব্যক্তিত্বই মাত্র। লিঙ্কনকে ছোট করতে চেয়ে সে নিজেই ছোট হয়ে গেছে।

সিউয়ার্ডের মতই আর একজন ছিলেন, তিনি লিঙ্কনের ক্যাবিনেটের অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী চেজ। অহঙ্কার আর আত্মগর্ব এই মানুষটিরও কম ছিল না। লিঙ্কনকে সহ্য করতে পারতেন না চেজও। শুধু লিঙ্কনকে নয় চেজ এবং সিউয়ার্ডও ছিলেন পরস্পরের শত্রু। দুজনের প্রত্যেকেই নিজেকে যোগ্যতম মনে করতেন। সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষদের প্রতিও বিরূপ ছিলেন চেজ, বিশেষতঃ গোড়ার দিকে ম্যাকক্লেল্যানের প্রতি।

এরই সঙ্গে ক্যাবিনেটে লিঙ্কনের আর একজন শত্রুই ছিলেন বলা যায় সমরবিভাগের সেক্রেটারী স্ট্যানটন। স্ট্যানটনও সুযোগ পেলেই বিদ্রুপ করতে চাইতেন লিঙ্কনকে। সময়ে অসময়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতেও চাইতেন। স্ট্যানটন ভাবতেন ক্যাবিনেটে তিনিই সবচেয়ে যোগ্য মানুষ। অত্যন্ত কঠোর আর গোঁয়ার ছিলেন স্ট্যানটন।

স্ট্যানটনের ঔদ্ধত্য মাঝে মাঝে ব্যথিত করেছিল প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনকেও। বহুবার স্ট্যানটন লিঙ্কনের আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতেও তার আটকায়নি। কিন্তু মহান লিঙ্কন স্ট্যানটনের যোগ্যতাকে চিরদিনই মর্যাদা দান করেছিলেন।

ঐ সময় মানুষ চারপাশে ঘিরে রেখেছিল লিঙ্কনকে। তাঁর প্রতি-দিনের কাজ এই সব মানুষকে দিয়েই করাতে হত। এরা ছাড়া পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল ব্লেয়ার আর সিউয়ার্ডের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড শত্রুতা। ভাইস প্রেসিডেণ্ট হ্যানিবল হ্যামলিনের সঙ্গেও অনেকের বনিবনা ছিল না। অ্যাটর্নী জেনারেল বেটসও ভাবতেন যোগ্যতার দিক থেকে তিনি লিঙ্কনের চেয়ে অনেকটাই উঁচুতে। তিনি এও প্রচার করতে দ্বিধা করতেন না রিপাবলিকান দল লিঙ্কনকে মনোনয়ন দিয়ে নিদারুণ ভুল করেছে।

এই সব বিচিত্র ঈর্ষাকাতর মানুষই ছিলেন সহজ মানুষ লিঙ্কনের সহযোগী। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল চেজেরই। দীর্ঘকায় সুপুরুষ চেজ নিশ্চিন্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন ১৮৬৪ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে তিনিই হবেন আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট।

ইতিহাস হয়েছিল অন্য রকম। দ্বিতীয়বারের জন্য আবার আব্রাহাম লিঙ্কনকেই জাতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছিল।

লিঙ্কনের নামে নানা কুৎসা রটনা করতেন চেজ। অথচ নিজেকে ধর্মভীরু মানুষ বলেই তিনি প্রচার করতেন।

লিঙ্কন একবার চেজ সম্পর্কে মন্তব্য না করে পারেনি, 'বেচারি চেজ। ওর প্রেসিডেন্ট হওয়ার আকাঙ্খা দেখে সত্যিই দুঃখ বোধ না করে পারা যায় না। ও একটা নোঙরা নীলবর্ণ মাছি মাত্র। নীল মাছিরা যেমন নোঙরা পদার্থে ডিম পাড়তে অভ্যস্ত চেজও তাই। ও করুণার পাত্র।'

লিঙ্কনকে সহ্য করতে পারতেন না চেজ। মতবিরোধ হওয়ায় তিনি বেশ কয়েকবার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছিলেন লিঙ্কনকে। চেজ ভাবতেন তার মত যোগ্য লোক ছাড়া লিঙ্কনের চলতে পারে না। শেষ বার লিঙ্কন চেজের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে নিতে ফাটা বেলুনের মতই চুপসে গিয়েছিলেন চেজ।

মানুষ হিসেবে লিঙ্কন ছিলেন এই সব নগন্য ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক অনেক বড। তাঁর মহত্ব ছিল অসামান্য, উদারতাও তাই। তিনি জানতেন চেজ বহুভাষায় সুপণ্ডিত আর ধার্মিক। তার সততাও ছিল প্রশ্নের অতীত। চেজ পদত্যাগ করার পর তিনি তাকে নিয়োগ করেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি পদে। চেজ সেইদিন উপলব্ধি করেছিলেন লিঙ্কনের মহান উদারতা। লিঙ্কন নিহত হলে তাই চেজ তার মৃতদেহের পাশে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

স্ট্যানটনও ছিলেন লিঙ্কনের চরম একজন বিরোধী মানুষ। সারাক্ষণ তিনি ঈর্ষার জ্বালায় ভুগে থাকতেন। নানা জটিল রোগের ফলেও স্ট্যানটন কাহিল হয়ে পড়তেন। কিন্তু লিঙ্কন স্ট্যানটনের সমস্ত ঔদ্ধত্যকেই মেনে নিয়েছিলেন একটি মাত্র কারণে—তা হল লিঙ্কন জানতেন স্ট্যানটন সৎ আর শৃঙ্খলাপরায়ণ কঠোর এক ব্যক্তিত্ব। এই জন্যই তিনি আড়ালে স্ট্যানটনের প্রশংসা করতেও দ্বিধা করেন নি।

স্ট্যানটন লিঙ্কনের প্রতি নানাভাবে তার ঈর্ষাকাতরতার প্রমাণ দিয়ে আর তাঁর আদেশ অমান্য করা সত্ত্বেও লিঙ্কনের গুলিবিদ্ধ দেহের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন তিনি অবরুদ্ধ কান্নাতেই ভেঙে পড়ে বলেছিলেন, 'বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠতম প্রজাপালক শাসনকর্তা ওই শায়িত রয়েছেন…।'

আর সিউয়ার্ড? এই জঘন্য মানুষটি লিঙ্কনের প্রতি এমনই বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন যে বারবার লিঙ্কনকে অপমান করতেও ছাড়েন নি। অনেকবার তিনি বলেছিলেন, 'লিঙ্কন এক অপদার্থ মুদীওয়ালা—সে নিজের দোকানটাও ভাল ভাবে চালাতে পারেনি। সেখানে আমার অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা অনেক বেশি। আমাব মত যোগ্য লোক আর নেই। প্রশাসন চালানোর কোন অভিজ্ঞতাই এই লোকটার নেই।'

সিউয়ার্ড এমনই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলেন যে লিঙ্কনকে চিঠি লিখতে গিয়ে তিনি তাকে সেই মুদীখানার দোকানদার বলে ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু মহান লিঙ্কন এসব গ্রাহ্য করেন নি। পৃথিবীতে কোন আজ্ঞাবহ কর্মচারী তার প্রেসিডেণ্টকে এ ধরণের চিঠি লিখেছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ইতিহাস এই নোংরা কীটেব মত মানুষদের আস্তাকুঁড়েই নিক্ষেপ করেছে যুগে যুগে। সিউয়ার্ডকেও তাই কেউ মনে রাখেনি অথচ মহান লিঙ্কন আজও অমর।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

লিঙ্কন হত্যা ষড়যন্ত্র ● একটি মহান মৃত্যু

আমেরিকার দীর্ঘ চারবছব ব্যাপী গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগেই এক নৃশংস হত্যা পরিকল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল কিছু মানুষের মনে। এ হত্যা পরিকল্পনা করেছিল দক্ষিণী অঞ্চলের বিশেষ করে ভার্জিনিয়া নামক রাজ্যের একদল জিঘাংসা পবায়ন ক্রীতদাস মালিক। তাদের পরিকল্পনা ছিল মহান প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করা। এই শয়তান শ্বেত প্রভুরা ভেবেছিল দাসপ্রথা বিলোপের মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হতে চলেছে তাই এক উন্মত্ত জিঘাংসায় তারা ক্ষিপ্ত হয়েই উঠেছিল। যে কোন ভাবেই হোক লিঙ্কনকে শেষ করতেই হবে এটাই হয়ে ওঠে তাদের মনোভাব।

এই উদ্দেশ্যে গভীর এক ষড়যন্ত্র একটু একটু করে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল সেদিন। ১৮৬৩ সাল থেকেই এই পরিকল্পনা করা

হয়। লিঙ্কনকে অতর্কিতে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক গুপ্তঘাতক সমিতিও গড়ে তোলে ধনী খামার আর দাস প্রভুরা। এ কাজে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আলবামার কোন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারও করা হল। জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করার জন্য। শুধু এই নয়, দক্ষিণের পত্র পত্রিকায় নগ্নভাবে পুরস্কারও ঘোষিত হল লিঙ্কনকে হত্যা করার জন্য উৎসাহ দিতে চেয়ে।

কিন্তু ইতিহাসে অন্য কাহিনীই শেষ অবধি লেখা হয়। এই সমস্ত ঘৃণ্য মানুষ হত্যা করতে পারল না সেদিন মহান মানুষ লিঙ্কনকে। তাকে যে হত্যা করেছিল সে কোন দলেরই কেউ ছিল না। দক্ষিণের প্রতি তার কোন টানও ছিল না। অতীতে কোন খুনও সে করে নি। এক বিচিত্র মানসিক রোগেই হয়তো সেদিনের সেই হত্যাকারী ভুগে চলেছিল। সে চেয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সে হবে বিখ্যাত কোন মানুষ। এই আশ্চর্য মানসিক ভাবই তাকে সেদিন আব্রাহাম লিঙ্কনকে খুন করার প্রেরণা দিয়েছিল।

এই হত্যাকারীর নাম জন উইলকিস বথ। বথ ছিল একজন নাট্যরসিক আর অভিনেতা। অত্যন্ত সুপুরুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বুথ আসলে ছিল একজন রমণীরঞ্জক যুবক। সুন্দরী তরুণীদের সাহায্যই তার একান্ত অনুরাগের ব্যাপার ছিল। ইতিহাসের এ এক আশ্চর্য খুনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুথ কখনও আগে কল্পনাতেও আনেনি ইতিহাসের এক জঘন্যতম হত্যাকারী হিসাবেই সে কুখ্যাতি অর্জন করবে। বুথের বয়স ছিল মাত্র তেইশ। নাটকে অভিনয়ে সে খ্যাতিও অর্জন করেছিল ওই সময়।

বিচিত্র সমস্ত ঘটনাও বথকে জড়িয়ে ঘটেছিল বেশ কয়েকবারই। এক অভিনেত্রী তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার চেষ্টা করেছিল। বুথ সেদিন নিহত হলে হয়তো আমেরিকার ইতিহাসই অন্যভাবে লেখা হতো।

বথের প্রেমিকা ছিল অসংখ্য। সে ছিল অনেক তরুণীর হৃদয় তারকা। লিঙ্কনকে উন্মাদ বুথ যেদিন হত্যা করে সেদিনই বুথের একজন প্রেমিকা, যার নাম ইভা টার্নার, সে ক্লোরোফর্ম দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তার প্রেমিক যে খুনী এ সত্য প্রকাশ হওয়াতেই টার্নার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল।

অথচ বিচিত্র এক তাডনার বশীভূত হয়ে সুদর্শন বুথ শুধু চাইছিল যে কোন ভাবে আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যার মধ্য দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করতে। এ এক ধরনের মানসিক বিকৃতি কোন সন্দেহ নেই।

পারিবারিক এক সাংস্কৃতিক ভাবধারাতেই জন্ম উইলকিস বুথের। বুথের বাবা জুলিয়াস ব্রুটাস বুথ একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। সেকালের মঞ্চে তার শেক্সপীয়াবের নাটকে অভিনয় দক্ষতা ছিল অসামান্য। সারা আমেরিকায় জুলিয়াসেব খ্যাতি ছিল। ছেলের উপর অনেকটাই আশা রাখতেন জুলিয়াস বুথ, সে হযতো অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন অভিনেতাই হয়ে উঠবে।

কিন্তু আশা থাকলেই সাফল্য আসে না। উইলকিস বুথ অভিনয় করতে জানলেও সহজাত প্রতিভার স্ফুরণ তার মধ্যে দেখা যাযনি। লেখাপডাতেও বিশেষ সুবিধা করতে পাবেনি সে।

বুথ পবিবার আরও অনেক বিষয়ে কিছুটা অন্যরকম ছিলেন সেকালেব সাধারণ আমেরিকান পারবাব থেকে। আমিষ জাতীয় পদার্থ তাদের খাদ্য তালিকায় থাকত না। অথচ ভাগ্যের পরিহাস উইলকিস বুথের আনন্দ ছিল অকারণ প্রাণী হত্যায। সে খেয়াল খুশি মত অকারণে গুলি কবে কুকুব, বিডালেব প্রাণ হরণ করে অসীম আনন্দ উপভোগ কবত।

পরিবারের অন্যান্যবা ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। এদের মধ্যে জুলিযাস বুথেব বড ছেলে এডুইন বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এইসব ব্যাপাব উইলকিস বুথের বুকে আরও বেশি ঈর্ষাব আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল। তাব একটাই চিন্তা দাঁডিযেছিল যেভাবেই হোক বাতা-রাতি বিখ্যাত হতে হবে আর এ কাজে লিঙ্কনকে হত্যা করাই শ্রেষ্ঠ পথ। অভিনয় করে অর্থ উপার্জন কবলেও এই সর্বনাশা পথ থেকে সে নিজেকে ঠেকিয়ে বাখতে পারল না। শয়নে স্বপনে ওই একটা চিন্তাই বুথকে তাডা করে বেডাতে চাইছিল।

বুথ একটা পরিকল্পনাও কবে নিয়েছিল। তবে একা যে কাজটা সমাধা করা সম্ভব নয় এ ধাবণাও তার ছিল। সেই কাবণেই কিছু অত্যন্ত বদসঙ্গীও সে বেছে নিয়েছিল সাহায্য করাব জন্য।

এই সব সঙ্গীব মধ্যে ছিল লীর সেনাবাহিনী থেকে পালিযে যাওয়া এক সৈনিক আর্নল্ড, থিয়েটারের কর্মচারি স্প্যাঙ্গলাব নামের একজন

মগুপ। এরই সঙ্গে আরও ছিল এক মজুর আর আস্তাবলের সহিস। এদের সঙ্গে আরও ছিল সুর‍্যাট নামে এক করণিক আর এক মারকুটে গুণ্ডা পাওয়েল আর হ্যারল্ড। এই সব কদর্য চরিত্রের মানুষকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে লিঙ্কন হত্যায় মেতে উঠেছিল উইলকিস বুথ।

লিঙ্কনকে হত্যার উদ্দেশ্যে বুথ অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো নিজের সঙ্গীদের নিয়ে। প্রতি মুহূর্তে সে খবর রাখতে চেষ্টা করত লিঙ্কনের গতিবিধির।

১৮৬৫ সালের জানুয়ারীর একদিন বুথ খবর জানতে পারল আব্রাহাম লিঙ্কন মাসের আঠারো তাবিখে ফোর্ড থিয়েটারে নাটক দেখার জন্য উপস্থিত হবেন।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল বুথ, এই সুযোগ লিঙ্কনকে হত্যা করার। কিন্তু বুথ তৈরি হলেও তার আশা পূর্ণ হলো না কারণ অনিবার্য কারণেই সেই সন্ধ্যায় লিঙ্কন নাটক দেখার জন্য হাজির হতে পারলেন না।

এইভাবেই লিঙ্কনকে হত্যা করতে পারল না সেদিন। এরপর কয়েক মাস অতিক্রান্ত হল। বুথ হঠাৎ সংবাদ পেল লিঙ্কন ওয়াশিংটন ছেড়ে বাইরে এক জায়গায় সেনাব্যারাকে হাজির হবেন।

রিভলবার আর অন্যান্য অস্ত্র সহ বুথ লিঙ্কনকে হত্যা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য পথের পাশে নির্জনে এক ঝোপেব মধ্যে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষায় বসেছিল। কিন্তু লিঙ্কন সেদিনও নির্দিষ্ট জায়গায় গেলেন না। বুথও ব্যর্থ হল।

এরপর আমেরিকার ইতিহাসের সেই কুখ্যাত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে গেল। দক্ষিণী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি লী আত্মসমর্পন করলেন উত্তরাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ ইউলিসিস গ্র্যান্টের কাছে।

গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ায় একটা শিথিলতা দেখা দিয়েছিল প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। বুথ এ খবরে উৎসাহিত হয়ে উঠল। এবারেই আসবে লিঙ্কনকে হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ।

গোপনে বুথ খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ করেছিল লিঙ্কন কোথাও যেতে পারেন কি না। শুক্রবার দিন সে হাজির হল ফোর্ড থিয়েটার হলে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই।

গোপনে ফোর্ড থিয়েটারে কথাবার্তার ফাঁকে বুথ যে খবর জানতে পারল তারই জন্য সে অপেক্ষায় ছিল এতদিন।

বুথ জানতে পারল ওই সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের জন্য এক বিশেষ 'বক্স' আসন সংরক্ষিত করা আছে। প্রেসিডেন্ট ওই সন্ধ্যায় নাটক দেখার জন্য আসছেন।

খবর পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল বুথ। আজ রাতেই ও কাজ শেষ করবে, হত্যা করবে লিঙ্কনকে। কাজ সমাধা করতে হবে লিঙ্কন নাটক দেখতে উপস্থিত হওয়ার পর।

বুথ তার ভয়ঙ্কর ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে থিয়েটারের জনৈক কর্মীকে বেশ কৌশলে কাজে লাগালো। প্রেসিডেন্টের যে চেয়ারে বসার কথা বুথ সেই চেয়ারটি বেশ কৌশলে এমনভাবে কর্মীটির সাহায্যে বসালো যাতে সহজেই আড়াল থেকে গুলি চালানো যায়। আড়ালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই কাজটা সমাধা করার বন্দোবস্ত করে রাখলো বুথ।

এরপর থিয়েটার ছেড়ে নিজের আস্তানায় পরবর্তী কাজের দিকে নজর দিলো বুথ। বুথ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল শুধু লিঙ্কনই নয়, এর সঙ্গে হত্যা করা হবে সিউয়ার্ড'কেও। এজন্য সহকারীদেরও কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করল বুথ, তাদেরও দেওয়া হল অস্ত্র। বুথের নিজের কাছেও রইল পিস্তল।

ওইদিন ছিল ১৪ই এপ্রিল, গুডফ্রাইডে। ওইদিনেই লিঙ্কন একজন দলত্যাগী সৈনিকের প্রাণদণ্ড মকুব করে মার্জনাপত্রে সই করেছিলেন। সৈনিকটিকে দল ছেড়ে পালানোর অপরাধে গুলি করার কথা। লিঙ্কন সেই আদেশপত্র দেখে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় ছেলেটা মাটির নিচে না থেকে উপরে থাকলেই কিছু ভাল কাজ করতে পারবে।'

লিঙ্কনের জীবনের শেষ সরকারী কাজ ছিলো ওই মার্জনাপত্রে সই করা।

গুডফ্রাইডের দিনটি এবার হতে চলেছিল বিশ্বের ইতিহাসের কোন স্মরণীয় দিন হয়েও এক কালো অন্ধকারময় দিন।

সারা শহরে সেদিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার আনন্দ। শহরের নানা প্রান্তে রঙীন পতাকার বাহার। চারদিকেই খুশির আমেজ। প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরি হয়েছিল সুদৃশ্য তোরন। প্রধান সেনা-পতি বিজয়ী ইউলিসিস গ্র্যাণ্টকে দেখার জন্যও মানুষ ভিড় করেছিল।

ক্রমে নির্দিষ্ট মুহূর্তে এসে পৌঁছলেন লিঙ্কন। প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনার জন্য ফোর্ড থিয়েটার সংলগ্ন এলাকায় শুধু জনতার উদ্বেল স্রোত।

আব্রাহাম লিঙ্কন মেরী লিঙ্কনকে নিয়ে ফোর্ড থিয়েটারে প্রবেশ করতেই জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল বারবার। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আরও ছিলেন তার সহকর্মীরাও। তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর রথবোন আর তার প্রেমিকা ক্লারা হ্যারিস।

লিঙ্কন হাসিমুখে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করে থিয়েটারের মধ্যে প্রবেশ করলেন। রাত তখন আটটা চল্লিশ। থিয়েটারের অর্কেষ্ট্রায় বেজে চলেছিল সঙ্গীতের সুর।

অতিথিদের সঙ্গে নির্দিষ্ট আসনটিতে এসে বসলেন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন। একটু পরেই শুরু হওয়ার কথা 'আওয়ার আমেরিকান কাজিন' হাস্যমুখর নাটকটি। এর পরিচালক ছিলেন লরা কীন।

থিয়েটার হলটিও চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছিল সেদিন প্রেসিডেন্টের আগমন উপলক্ষ্যে। রঙীন পতাকায় মুড়ে দেওয়া হয়েছিল বক্সটি। চেয়ারের হাতলেও ছিল লাল রঙ। যুদ্ধ জয় আর শান্তির আনন্দেই সবাই মশগুল।

মেরী লিঙ্কনকেও সেদিন খুবই খুশি আর হাস্যোচ্ছল মনে হচ্ছিল। মেরী লক্ষ্য করেছিলেন দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে আসতে হলেও লিঙ্কনকে বেশ খুশি লাগছে। মেরী ভাবলেন এতদিনের যুদ্ধ শেষের শান্তিই লিঙ্কনকে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে দিতে পেরেছে।

ওইদিন ভোরবেলায় বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখার কথা বলেছিলেন লিঙ্কন মেরী আর ক্যাবিনেটের সহকর্মীদের। তিনি বলেছিলেন স্বপ্নে দেখলেন তিনি এক নির্জন জাহাজে চড়ে একাকী কোথাও যেন ভেসে চলেছেন। লিঙ্কন বলেছিলেন অসাধারণ কোন ঘটনা ঘটতে চাইলে এ রকম স্বপ্ন তিনি আগেও দেখেছেন। বিরাট কোন সাফল্যের মুখোমুখি হওয়ার সময়ই আসতে চলেছে এমন কথাই ভেবেছিলেন সেদিন লিঙ্কন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী তার সেই স্বপ্ন ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছিল এক অপরিণামদর্শী যুবকের নৃশংসতার মধ্য দিয়ে।

নাটক শুরু হল এরপর যথারীতি। অন্যান্য দর্শকদের মত স্বয়ং লিঙ্কনও একাগ্রচিত্তে উপভোগ করছিলেন অভিনয়।

রাত দশটা বেজে দশ মিনিট। অন্ধকার প্রেক্ষাপটে বুথ ঢুকলো

ফোর্ড থিয়েটারে। তার দেহে কালো রঙের পোশাক, পায়ে উঁচু হিল জুতো।

নৃশংস এক উন্মাদনায় চারপাশ জরিপ করে নিতে চাইল উইলকিস বুথ। সামনে কিছু দূরেই বিশেষ আসনে তন্ময় হয়ে নাটক উপভোগ করে চলেছিলেন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন। মৃত্যুদূতের পদধ্বনি সে সময় তার কানে পৌঁছল না।

হাতে একটা বেঢপ আকারের টুপি নিয়ে ঢুকলো বুথ। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মাঝখানের আসনগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল।

একটু পরেই বুথকে আটকালো প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষীদের একজন। সে ওর পরিচয় পত্র দেখাতে হুকুম করতেই বুথ তার অভিনেতার পরিচয় পত্র বের করে দেখাল। দেহরক্ষী আর বাধা দিল না। হালকা মেজাজেই এবার ভিতরে এগোল বুথ। এক সময় সে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিল।

দরজার গায়ে আগেই করে রাখা একটা ফুটোয় চোখ রাখল বুথ। সামনে দেখা যাচ্ছিল লিঙ্কনকে।

একটু পরেই নিঃশব্দে দরজার পাল্লা খুললো সেই শয়তান বুথ। নিজেকে তৈরি করে নিতে চাইল সে। অতি সতর্কভঙ্গীতে শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করে নিল বুথ। অতি সাবধানে সে লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। পরক্ষণেই শিকারি চিতার ক্ষিপ্রতায় স্টেজে লাফিয়ে পড়ল বুথ।

সামনে চেয়ারে ঝুঁকে পড়ে গেলেন মহান লিঙ্কন। কোন আর্তনাদ তার মুখ থেকে নির্গত হয়নি।

দর্শকরাও ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারল না। আচমকা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন মেরী লিঙ্কন, 'ও—ও প্রেসিডেন্টকে খুন করেছে—।'

মেজর রথবোনও লাফিয়ে উঠেছিলেন। লিঙ্কনের কাঁধ বেয়ে নেমে আসছিল রক্তের ধারা। রথবোন চিৎকার করে বলে উঠলেন 'ওই লোকটাকে ধরুন এখনই!—ও প্রেসিডেন্টকে গুলি করেছে—।'

সারা থিয়েটার হলে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিই জেগে উঠেছিল ওই মুহূর্তে। আচমকা পরিস্থিতি উপলব্ধি করে জনতার মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। প্রতিহিংসায় যেন উন্মাদ হয়ে উঠল জনতা।

'খুনীকে ফাঁসি দাও। শয়তানকে ছিঁড়ে ফেলো…। থিয়েটার জ্বালিয়ে দাও, আগুন লাগাও—।'

এমন কথাও শোনা গেল কোথাও বোমা লুকোন রয়েছে থিয়েটার হল উড়ে গেল বলে। মানুষ এই কথায় উন্মত্তের মত ভয়ে পালাতে আরম্ভ করল। চারদিকে জেগে উঠল বিশৃঙ্খলা আর নিদারুণ এক আতঙ্ক।

লিঙ্কন সম্পূর্ণ নিস্তেজ জ্ঞানহীন। কাতর ভাবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন শুধু মেরী লিঙ্কন। দর্শকদের মধ্যে একজন চিকিৎসক ততক্ষণে ছুটে এসে পরীক্ষা করলেন লিঙ্কনকে। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর মনে করে তিনি জানালেন থিয়েটার হল থেকে এখনই চিকিৎসার জন্য বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার।

সেই মতই সেনাবাহিনীর কয়েকজন আহত লিঙ্কনকে ধরাধরি করে থিয়েটারের সামনের এক সরাইখানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাওয়ার কোনই উপায় ছিল না। কোন রকমে ছোট এক শয্যায় শায়িত রইলেন মহান সেই মানুষটি, জীবনদীপ হয়তো ধীরে ধীরেই তার নির্বাপিত হতে চলেছিল।

ইতিমধ্যে বিদ্যুতের মতই চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল প্রেসিডেন্ট গুলিতে নিহত। শুধু তাই নয়, আসল খবর ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল নানা গুজব। গুজব রটলো শুধু প্রেসিডেন্টই নন, ভাইস প্রেসিডেন্ট জনসন আর সেক্রেটারী স্ট্যানটনও নিহত। যুদ্ধজয়ী বীর সেনাপতি গ্র্যান্টও গুলির আঘাতে মৃত্যুপথের যাত্রী।

ইতিহাসে সে এক সত্যিকার কালো অন্ধকারময় দিন তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। সারা আমেরিকাই হয়ে উঠল উত্তাল।

সরকারী যন্ত্র ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছিল হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার জন্য। সেক্রেটারী স্ট্যানটন আদেশ দিয়েছিলেন কানাডা আর আমেরিকার সীমান্ত বন্ধ করে দিতে। পুলিশ আর গোয়েন্দা বাহিনীর লোকজন প্রায় ছেঁকে ফেলতে শুরু করল সারা এলাকা। ডেকে পাঠানো হলো বীর সেনাপতি সেই ইউলিসিস এস গ্র্যান্টকে ফিলাডেলফিয়া থেকে অবিলম্বে রাজধানী ওয়াশিংটনে চলে আসতে।

বুথের নিক্ষিপ্ত গুলি লিঙ্কনকে সাংঘাতিক ভাবেই আহত করেছিল। গুলি লেগেছিল তার বাঁদিকের কানের নিচে। গুলি ঢুকে গিয়েছিল মস্তিষ্কের মধ্যে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন মাত্র ন'ঘণ্টার মতই।

কিন্তু ইতিহাসের সেই জঘন্যতম খুনী বুথ কি করল লিঙ্কনকে হত্যা করার জন্য গুলি করে? শয়তান বুথ স্টেজে লাফিয়ে পড়ে পালানোর সময় তাকে জাপটে ধরেছিলেন মেজর রথবোন। কিন্তু শয়তান বুথ সঙ্গে সঙ্গেই ছুরির আঘাত করলো মেজর রথবোনকে। আহত রথবোনের হাত ছাড়িয়ে পালাল এরপর বুথ। থিয়েটারের অন্য দুই কর্মচারিও তার ছুরিতে আহত হল।

আগেই লুকিয়ে রাখা একটা ঘোড়ায় চড়ে পালাল এবার বুথ, কারও কাছে ধরা পড়ল না সে।

বুথ লিঙ্কনকে গুলি করেছে ফোর্ড থিয়েটারে একথা শেষ পর্যন্ত কানে পৌছল বুথের বাবার কাছেও। হতভাগ্য মানুষটি ধারণাও করতে পারেননি তার ছেলে দেশের প্রেসিডেণ্টকে গুলি করে বসতে পারে, যে প্রেসিডেণ্ট দেবতারই মত মহান মানুষ। বেদনায় একথাই তিনি শুধু বলতে পেরেছিলেন।

শয়তান খুনী উইলকিস বুথ লুকিয়ে থাকার জন্য নানা আশ্রয় নিয়ে চলেছিল। গোয়েন্দা বাহিনী তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছিল।

এইভাবেই এক সপ্তাহের উপর কেটে গেল। সেনাবাহিনীর একজন রক্ষীর গুলিতে আহত হয়েছিল ইতিমধ্যে বুথ। ২৫শে এপ্রিল সেনাবাহিনীর জনৈক কর্নেল কনজারের হাতে আহত হল বুথ। পালানোর চেষ্টা করতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ল বুথ, তাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরা গেল না। বুথের বাকি সঙ্গীরা সকলেই ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছিল পুলিশের হাতে।

বুথ গুলি খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য মারা যায় নি. সে কোন রকমে তার আহত দেহটা টেনে নিয়ে যায় একটা বাড়িতে। সেখানে তাকে শুশ্রূষা করেছিল মিস হলওয়ে নামে একজন। সে প্রাণপণে বুথের সেবা করেছিল।

কিন্তু সাংঘাতিক আহত বুথের প্রাণরক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত তিনদিন পরে সে মারা গেল। বিশ্বের এক নৃশংস খুনীর জীবন

এইভাবেই শেষ হয়ে গেল সেদিন। মৃত্যুর আগে সেই হঠকারী হত্যাকারী বুথ বাসনা জানিয়েছিল যে তার মাকে শেষবারের মত দেখতে চায়। সে ইচ্ছা অবশ্য তার পূর্ণ হয়নি বলাই বাহুল্য।

মহান প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের জীবন এইভাবেই সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল এক অপরিণামদর্শী যুবকের হাতে। অথচ সেই খুনী জন উইলকিস বুথের মৃতদেহ নিয়ে এরপর ঘনিয়ে উঠেছিল এক রহস্য। বিচিত্র এক রহস্যই ঢাকা ছিল বাতাবরণের আড়ালে। বুথের মৃতদেহ নিয়ে তাই বিতর্কের সূচনা হয় এরপর। অন্ততঃপক্ষে কুড়িটি মৃতদেহ নানা সময়ে বুথের বলে অনেকে দাবী জানিয়ে রহস্যটা জোরালো করে তোলে।

ঘনীভূত ওই রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলার জন্য ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট অ্যাণ্ড্রু জনসন আদেশ দেন বুথের সমাধি খুঁড়ে দেহটি সনাক্তকরণের। এজন্য আহ্বান জানানো হয় বুথের সব আত্মীয়স্বজনদের।

সমস্যার কোন সমাধান এতে তবু হল না। উইলকিস বুথের আত্মীয় স্বজন, বাবা, মা, কেউই বুথের দেহ তারই বলে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হলেন। রহস্য তাই রহস্যই থেকে গেল বুথের দেহ' সম্পর্কে। কর্ণেল কনজারের গুলিতে আহত বুথ পালিয়ে যাওয়ার পর তার আসল লাসটি কোথায় গেল এ রহস্যের জট কোনদিনই আর খুলল না। রহস্য চিরকালের জন্য রহস্য হয়েই তাই রয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কুড়িটি মৃতদেহ থেকে বেছে নেওয়া হয় পাঁচটিকে। এই পাঁচটির মধ্যে যে কোনটাই হয়তো বুথের হওয়া সম্ভব। দর্শনার্থীরা ইচ্ছে হলে পাঁচটি করোটি দেখতেও পায় তার যেকোনটাই হয়তো সেই খুনী বুথের কিন্তু কোন্‌টি কেউ জানে না।

লিঙ্কনের অন্তিম যাত্রায় সেদিন অনুগামী হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বেদনার্ত মানুষ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সেদিন যেন শোকাবেগে স্তব্ধ হয়ে যায়। সারা আমেরিকার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় শোকযাত্রা আর কখনও কেউ দেখেনি। সকলে চোখের জলে শেষ বিদায় জানিয়েছিল তার মহান আর প্রিয়তম প্রেসিডেণ্টকে।

মে মাসের ৪ তারিখে স্প্রিংফিল্ড শহরের এক অপরূপ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হল আমেরিকার সেই মহান মানুষটিকে। চিরশান্তিতে

বুথের নিক্ষিপ্ত গুলি লিঙ্কনকে সাংঘাতিক ভাবেই আহত করেছিল। গুলি লেগেছিল তার বাঁদিকের কানের নিচে। গুলি ঢুকে গিয়েছিল মস্তিষ্কের মধ্যে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন মাত্র ন'ঘণ্টার মতই।

কিন্তু ইতিহাসের সেই জঘন্যতম খুনী বুথ কি করল লিঙ্কনকে হত্যা করার জন্য গুলি করে? শয়তান বুথ স্টেজে লাফিয়ে পড়ে পালানোব সময় তাকে জাপটে ধরেছিলেন মেজর রথবোন। কিন্তু শয়তান বুথ সঙ্গে সঙ্গেই ছুরির আঘাত করলো মেজর রথবোনকে। আহত রথবোনের হাত ছাড়িয়ে পালাল এরপর বুথ। থিয়েটারের অন্য দুই কর্মচারিও তার ছুরিতে আহত হল।

আগেই লুকিয়ে রাখা একটা ঘোড়ায় চড়ে পালাল এবার বুথ, কারও কাছে ধরা পড়ল না সে।

বুথ লিঙ্কনকে গুলি করেছে ফোর্ড থিয়েটারে একথা শেষ পর্যন্ত কানে পৌছল বুথের বাবার কাছেও। হতভাগ্য মানুষটি ধারণাও করতে পারেননি তার ছেলে দেশের প্রেসিডেণ্টকে গুলি করে বসতে পারে, যে প্রেসিডেণ্ট দেবতারই মত মহান মানুষ। বেদনায় একথাই তিনি শুধ্ বলতে পেরেছিলেন।

শয়তান খুনী উইলকিস বুথ লুকিয়ে থাকার জন্য নানা আশ্রয় নিয়ে চলেছিল। গোয়েন্দা বাহিনী তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছিল।

এইভাবেই এক সপ্তাহের উপর কেটে গেল। সেনাবাহিনীর একজন রক্ষীর গুলিতে আহত হয়েছিল ইতিমধ্যে বুথ। ২৫শে এপ্রিল সেনাবাহিনীর জনৈক কর্নেল কনজারের হাতে আহত হল বুথ। পালানোর চেষ্টা করতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ল বুথ, তাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরা গেল না। বুথের বাকি সঙ্গীরা সকলেই ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছিল পুলিশের হাতে।

বুথ গুলি খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য মারা যায় নি. সে কোন রকমে তার আহত দেহটা টেনে নিয়ে যায় একটা বাড়িতে। সেখানে তাকে শুশ্রূষা করেছিল মিস হলওয়ে নামে একজন। সে প্রাণপণে বুথের সেবা করেছিল।

কিন্তু সাংঘাতিক আহত বুথের প্রাণরক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত তিনদিন পরে সে মারা গেল। বিশ্বের এক নৃশংস খুনীর জীবন

এইভাবেই শেষ হয়ে গেল সেদিন। মৃত্যুর আগে সেই হঠকারী হত্যাকারী বুথ বাসনা জানিয়েছিল যে তার মাকে শেষবারের মত দেখতে চায়। সে ইচ্ছা অবশ্য তার পূর্ণ হয়নি বলাই বাহুল্য।

মহান প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের জীবন এইভাবেই সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল এক অপরিণামদর্শী যুবকের হাতে। অথচ সেই খুনী জন উইলকিস বুথের মৃতদেহ নিয়ে এরপর ঘনিয়ে উঠেছিল এক রহস্য। বিচিত্র এক রহস্যই ঢাকা ছিল বাতাবরণের আড়ালে। বুথের মৃতদেহ নিয়ে তাই বিতর্কের সূচনা হয় এরপর। অন্ততঃপক্ষে কুড়িটি মৃতদেহ নানা সময়ে বুথের বলে অনেকে দাবী জানিয়ে রহস্যটা জোরালো করে তোলে।

ঘনীভূত ওই রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলার জন্য ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট অ্যাণ্ড্রু জনসন আদেশ দেন বুথের সমাধি খুঁড়ে দেহটি সনাক্তকরণের। এজন্য আহ্বান জানানো হয় বুথের সব আত্মীয়স্বজনদের।

সমস্যার কোন সমাধান এতে তবু হল না। উইলকিস বুথের আত্মীয় স্বজন, বাবা, মা, কেউই বুথের দেহ তারই বলে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হলেন। রহস্য তাই রহস্যই থেকে গেল বুথের দেহ' সম্পর্কে। কর্ণেল কনজারের গুলিতে আহত বুথ পালিয়ে যাওয়ার পর তার আসল লাসটি কোথায় গেল এ রহস্যের জট কোনদিনই আর খুলল না। রহস্য চিরকালের জন্য রহস্য হয়েই তাই রয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কুড়িটি মৃতদেহ থেকে বেছে নেওয়া হয় পাঁচটিকে। এই পাঁচটির মধ্যে যে কোনটাই হয়তো বুথের হওয়া সম্ভব। দর্শনার্থীরা ইচ্ছে হলে পাঁচটি করোটি দেখতেও পায় তার যেকোনটাই হয়তো সেই খুনী বুথের কিন্তু কোন্‌টি কেউ জানে না।

লিঙ্কনের অন্তিম যাত্রায় সেদিন অনুগামী হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বেদনার্ত মানুষ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সেদিন যেন শোকাবেগে স্তব্ধ হয়ে যায়। সারা আমেরিকার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় শোকযাত্রা আর কখনও কেউ দেখেনি। সকলে চোখের জলে শেষ বিদায় জানিয়েছিল তার মহান আর প্রিয়তম প্রেসিডেন্টকে।

মে মাসের ৪ তারিখে স্প্রিংফিল্ড শহরের এক অপরূপ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হল আমেরিকার সেই মহান মানুষটিকে। চিরশান্তিতে

শয়ান হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন।

স্প্রিংফিল্ড ছেড়ে আসার সময় লিঙ্কন বলেছিলেন তিনি কবে আসবেন আবার তা বলতে পারেন না। বিশেষ ট্রেনে করে তার শবদেহ যখন ইলিনয়ে সজ্জিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় মনে হচ্ছিল তিনি সুখ নিদ্রায় আছন্ন, এখনই হয়তো জেগে উঠবেন।

চিরসমাহিত আব্রাহাম লিঙ্কনের শবদেহ রাখা কফিনটি বহুবার চুরির চেষ্টা হয় এ এক বিচিত্র ঘটনা। ১৮৭৬ সালে একদল বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষই প্রথম চুরির চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এই কারণে মহান সেই মানুষটির দেহ বেশ কয়েকবারই স্থানান্তরিত না করে পারা যায়নি।

শেষ পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের অমূল্য সমাধি রক্ষা করার জন্য। ১৯০১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বিশেষভাবে তৈরী ইস্পাতের কফিনে রক্ষিত হল মহান লিঙ্কনের দেহাবশেষ। তৈরি করা হল সুন্দর এক বেদী। সেখানেই চিরশান্তির আশ্রয় নিলেন আমেরিকার জনদরদী মহান প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন চিরদিনের জন্য।

আজও যারা আমেরিকায় যান তারা লিঙ্কন নিহত হওয়ার দিনে দেখতে পারেন তাঁর সমাধি। দর্শনার্থীদের সেদিন উন্মোচিত হয় সেই সমাধি।

বহু বছর অতিক্রান্ত মহান লিঙ্কন নিহত হওয়ার পর। কিন্তু আজও অত্যাচারিত আর সমস্ত জনগণের হৃদয়ে চির জাগরূক রয়েছে তাঁর স্মৃতি। মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকালের মতই আসন লাভ করেছেন এক অসাধারণ মানব দরদী মহান মানুষ হিসাবে আব্রাহাম লিঙ্কন। এ এক কালজয়ী মানুষেরই স্মৃতি, এ কোনদিনই তাই ইতিহাসের পাতা থেকে, মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়।

মৃত্যু মহান করে তুলেছে তাই আব্রাহাম লিঙ্কনকে।

লিঙ্কনের চরম বিরোধী সেই স্ট্যানটন সেদিন মহান আব্রাহাম লিঙ্কনের শায়িত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : 'আজ তিনি কালোত্তীর্ণ, যুগন্ধর একজন মানুষ—।'

—০—